ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনা

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনা

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

পাণ্ডুলিপি: খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট।

কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

Internet Edition
ইন্টারনেট সংস্করণ

পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ:
১৬ জুন, ২০১৯ ঈসায়ী
২ আষাঢ়, ১৪২৬ বাংলা
১৩ শাওয়াল, ১৪৪০ হিজরি

হাদিয়ায়ে সওয়াব

আমার পিতা মরহুম হাজী আলী আসগর
আমার মাতা মরহুমা হাজিয়্যাহ মমরাজ বিবি
ও
আমার আদুরে সন্তানাদি:
সামিনা রুখসানা বারী বি.এ. অনার্স
ভাষা সিলভিয়া বারী বি.এ. অনার্স
আলী হুসাইন মুহাম্মাদ সুলতান বারী জুবায়ের বি.এ.
মুহাম্মাদ কাওসার রাসূল বারী এমরাজ ম.এস.সি. [পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত] ইউ.সি.এল
মেহরাজ ইবনে বারী শাহরাজ বি.এ. অসার্স
হাফিজা খানম বুশরা বারী [মাদরাসা শিক্ষার্থী]
এবং মুসলিমা খানম জাকিরা বারী’র [হিফজ ও মাদরাসা শিক্ষার্থী] প্রতি।

আল্লাহ তা’আলা সবাইকে দুনিয়া-আখিরাতে শান্তি দান করুন।

বিষয়সূচি

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পক্ষ থেকে আরজ

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীন উদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী তারিখে অত্র গ্রন্থের লেখকের পিতা হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির প্রতিষ্ঠিত সিলেটস্থ আলী সেন্টারের উপরে স্থাপিত মডার্ণ জেনারেল হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। সমগ্র আলমজুড়ে দ্বীনের খিদমাত আঞ্জাম দেওয়ার মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত বুজুর্গদ্বয়ের ইশারায় একই ভবনে গ্রন্থকার নিজস্ব খরচে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, “খানক্বায়ে আমিনীয়া-আসগরিয়া”।

আমরা উক্ত খানক্বার খাদিম হিসাবে আপনাদের সকলের দু'আ কামনা করছি, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত সঠিক দ্বীন প্রচারে আমাদেরকে তাওফিক দেন।

মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী
পরিচালক, খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান
প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক সাহেবের

অভিমত

মুহতারাম ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী সাহেবের লিখিত "ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনা" বইটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বইটি মূলত বিজ্ঞানের বই। তবে লেখক এতে ঈমানের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনেরও প্রয়াস পেয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে ঈমানকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যাচাই করা হয়। কিন্তু ঈমানের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে যাচাই তেমন একটা দেখা যায় না। ফলে এই গ্রন্থটি পাঠকের কাছে কৌতুহলোদ্দীপক হবে।

ঈমানই মূলত বিশ্বের গভীরতম সত্য। তাই ঈমানের দৃষ্টিতে জগতকে বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজটিই করেছেন ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী সাহেব।

আমি বইটির বহুল পঠন কামনা করি। মহান আল্লাহ তা'আলা এই পরিশ্রমকে লেখকের ও পাঠকের জন্য নাজাতের উপায় করেন, এই দু'আ করি।

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
২৫/০১/১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনা

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তা’আলার জন্য যিনি এই বিরাট বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। সমগ্র বস্তুজগৎ ও প্রাণীজগৎ সৃষ্টি ও পরিচলনের কিছু বিশেষ আইন-কানুন তিনিই সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যার ফলে সবকিছু সুশৃঙ্খলভাবে অস্তিত্বশীল ও চলন্ত আছে। এসব মৌলিক ‘ফিজিক্যাল আইন’ [laws of physics][1] সবকিছু মেনে চলে। এটা মূলত মহান আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক জগতসৃষ্টি ও একে সুশৃঙ্খলভাবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অস্তিত্বশীল রাখার কৌশলের অন্তর্ভূক্ত।[2] মানবিক আক্বল তথা বুদ্ধিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে যেসব নিয়ম-নীতি দ্বারা বস্তুজগৎ পরিচালিত হচ্ছে তা যদ্দুর সম্ভব জানার নামই হলো বিজ্ঞান। মূলত বিজ্ঞান হলো বস্তুজগৎ ও এর অস্তিত্ব সম্পর্কে ‘প্রণালীবদ্ধ’ উপায়ে সঠিক তথ্যানুসন্ধান।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে আরো ব্যাপকভাবে ব্যক্ত করতে যেয়ে আমরা বলতে পারি, আমাদের চতুর্পাশ্বস্থ বস্তু ও পুরো মহাবিশ্ব সম্পর্কে অনেক অজানা ব্যাপার জানার চেষ্টা। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া সচরাচর সংঘটিত অনেক স্বাভাবিক

---

[1] ‘laws of physics’ মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত: (১) ক্ল্যাসিক্যাল ফিজিক্স (classical physics)- এর দ্বারা দৃশ্যমান জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। একে আমরা ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিক্সও (classical mechanics) বলতে পারি। (২) দ্বিতীয়টি হলো এটোমিক ফিজিক্স (atomic physics)- এর দ্বারা ইলেমেন্টারি (elementary) ও সাব-এটোমিক (sub-atomic) কণাগুলোর মধ্যে যেসব মিথস্ক্রিয়া ঘটছে তার ওপর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়। একে আমরা কুয়ান্টাম মেকানিক্সও (quantum mechanics) বলতে পারি।

[2] এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, ‘‘laws of physics’ কোনো কৃত্রিম আইন-কানুন নয়- বরং এগুলো (বিজ্ঞানের ভাষায়) প্রাকৃতিক। বিজ্ঞান যদিও এগুলোর সৃষ্টিকর্তা কে, তা জানে না- কিন্তু একজন ঈমানদার জানেন এসব আইন-কানুন হচ্ছে আল্লাহ-সৃষ্ট জগতসৃষ্টি ও পালনকারিতার কৌশলাদি মাত্র।

ঘটনাবলীর পেছনের কারণ জানা ও বস্তুর মধ্যস্থ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং এদের অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচন হয় বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে।

এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের ক'টি মৌলিক শাখা তথা জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং সংখ্যা থিওরি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। ভাবনার বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই, বিজ্ঞানের তথ্যাদি ও সংখ্যা থিওরি নিয়ে অঙ্কহীন আলোচনার মাধ্যমে এখানে চিন্তার খোরাক যোগানো উদ্দেশ্য- আর কিছু নয়। বাস্তবে আধুনিক বিজ্ঞানের দিকনির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠিত থিওরিবলীর ওপর বিস্তারিত আলোচনা থেকে ঈমানদার হিসাবে আমাদের উপকার সাধন হবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। ঈমানের আলোকে বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ঘাটিত এই মহাবিশ্বের অনেক বিষয়াদি অবলোকন নিশ্চয়ই আত্মার খোরাক হবে, যার ফলে দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে তা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। বিজ্ঞানের তথ্যাদি কোনো 'ঈমানদার', 'নাস্তিক' কিংবা 'মুশরিক' গবেষক কর্তৃক আবিষ্কৃত ও উৎকর্ষিত হয়েছে কি না, সেটা আদৌ মূখ্য নয়।[3] বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে গবেষকের 'দ্বীনি আক্বীদা' বা ধর্মবিশ্বাস মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়- তবে হ্যাঁ, যদি এই গবেষক 'ঈমানদার' হয়ে থাকেন তাহলে সেটা হবে তার নিজের জন্য সৌভাগ্যের কারণ। আসলে সত্যিকার একনিষ্ঠ কোনো বিজ্ঞানী কখনো বিজ্ঞান-গবেষণাকে দ্বীন-ধর্ম 'প্রমাণিত' বা 'অপ্রমাণিত' সাব্যস্তকরণের লক্ষ্য বানিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।[4] তবে পরমাণু-পরমাণু থেকে এই বিরাট মহাবিশ্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনকে কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত তথা পরিচিতিলাভের সহায়ক-শক্তি হিসাবে লক্ষ্য বানিয়ে অগ্রসর হোন তাহলে তা-ই হবে সর্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-গবেষণা। সুতরাং আল্লাহর যে কোনো বান্দাই বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটন করতে পারেন, আর এ সত্য মেনে নেওয়া এবং ঈমানী আলোকে এর উপর চিন্তা-ফিকির করা মোটেই কোনো দিক থেকে অযৌক্তিক হবে না।

---

[3] কারণ পৃথিবীর সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা।

[4] দুর্ভাগ্যবশত কট্টর কিছু অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী ওহির্জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংঘাত খুঁজে বেড়ান। বাস্তবে সত্যিকার ওহির্জ্ঞান ও সত্যসিদ্ধ বিজ্ঞানে কোনো সংঘাত তো নেই-ই, বরং সর্বত্র সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। সত্যের সাথে সত্যের সংঘাত কখনো হতে পারে না। এ ব্যাপারে আরো পাঠ করুন, লেখক প্রণীত তিন খণ্ডে সমাপ্ত **'ইসলাম ও বিজ্ঞান'** গ্রন্থটি।

সুতরাং গ্রন্থে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির আবিষ্কারকদের ব্যক্তিগত ঈমান-আক্বীদা সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য জরুরী নয়। তাদের আবিষ্কৃত তথ্যাদি কতটুকু বিজ্ঞান-গবেষণার আইন-কানুন দ্বারা সমর্থিত, সেটাই মূখ্য ব্যাপার। তবে এটা নিঃসন্দেহে যথার্থ বলে মেনে নিতে হবে যে, আমরা নিজেদের ঈমান-আক্বীদা বিরোধী কোনো তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক থিওরি' আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়:

"***বিজ্ঞানের কোনো থিওরি যদি ইসলামী ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে ঐ থিওরি 'অসত্য' ও 'ভ্রান্ত'। আমরা মনে করি ভুলটি ঈমান-আক্বীদার ক্ষেত্রে নয়- কারণ এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসীম জ্ঞানের অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। অর্থাৎ এটা ওহির জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যা সম্পূর্ণ নির্ভুল। ভুলটি অবশ্যই ঐ সাংঘর্ষিক বৈজ্ঞানিক থিওরির মধ্যেই বিদ্যমান।***"[5]

এই নীতিটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও যথার্থ- কারণ, বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, বিজ্ঞান হলো একটি পরিবর্তনশীল জ্ঞানান্বেষার নাম। আজ যে থিওরি বা বিষয় সবার নিকট সত্য বলে গ্রহণযোগ্য, তা কাল হয়তো ভুল প্রমাণিত হবে। অতীতে এরূপ হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। অপর আরেক কারণে এই মূলনীতি যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য, সেটা হলো- কোনো সত্য ধর্মবিশ্বাসে তথা ইসলামী আক্বাঈদে এমন কোনো ধ্রুব সত্য বিষয় সাংঘর্ষিক হওয়া অসম্ভব। হোক সে সত্য বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোনো কিছু। সুতরাং উল্লেখিত মূলনীতির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকে আমরা যদি আধুনিক বিজ্ঞানের জগতকে জানার চেষ্টা চালাই,

[5] এ মূলনীতির সমর্থনে এটুকু তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপনই যথেষ্ট যে, বিজ্ঞানের ইতিহাস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, এ পর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক থিওরি বা মতবাদ বার বার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সময় সময় পরিত্যক্তও হয়েছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক অনেক থিওরিই পরিপূর্ণ ও সত্যসিদ্ধ হয়নি। তাহলে এর ওপর বিশ্বাস-ভরসা রেখে কোন্ যুক্তিতে বলা যায় যে, সত্যসিদ্ধ ওহির্জ্ঞান ও বিজ্ঞানে এই-এই সংঘাত আছে? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবাইকে অবগত করা জরুরী মনে করছি: যখন সত্যসিদ্ধ, পূর্ণাঙ্গ নিষ্কলুষ 'ওহির্জ্ঞান' বলা হয়- তখন মনে করতে হবে একমাত্র 'কুরআন' ও বিশুদ্ধ 'হাদিস' শরীফ উদ্দেশ্য। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ এ পৃথিবীতে নেই- যাকে সত্যসিদ্ধ, মানব কর্তৃক অপরিবর্তিত আসমানী ওহির্জ্ঞান হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। এ কথাগুলো আজ ওসব ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী চিন্তাশীলরাও অকপটে স্বীকার করছেন।

তাহলে আমাদের জন্য অনেক উপকার সাধিত হতে পারে। এটুকু বলার পর আমি এখন গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তুর উপর কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

মোট ৭টি অধ্যায়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনবোধে অনেক ছবি ও চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে বিষয়ের সঠিক স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছি। এভাবে উপস্থাপন বিজ্ঞান-গবেষণারই একটি নিয়ম। এতে বিষয় অনুধাবন অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হলো সময় ও এ-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ব্যাপার-স্যাপার। এতে আছে সময়ের ব্যাখ্যা, পঞ্জিকা, সময়ের স্ট্যান্ডার্ড, ভূতাত্ত্বিক ও প্রাণীদের মধ্যে ক্রিয়াশীল সময় নিয়ে আলোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আধুনিক কজমোলজি [modern cosmology] তথা সৃষ্টিতত্ত্বের উপর বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন থিওরি অনুযায়ী জগতসৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে সমগ্র মহাবিশ্বের বস্তুতে বিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে এসব কথা এই অধ্যায়ে সরল ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে গণিত শাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ‘**সংখ্যা**’ নিয়ে আলোচনা। সংখ্যার সংজ্ঞা, যুক্তিসিদ্ধ সংখ্যা, প্লেস-ভেল্যু সিস্টেম, পুরাতন বিভিন্ন সভ্যতায় সংখ্যার উদ্ভাবন, সংখ্যা রেখা ইত্যাদির উপর অনেক তথ্য নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আছে মহাকাশ বিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত গবেষণা। অত্যাধুনিক থিওরিবলী এবং বিভিন্ন উপায়ে কিভাবে আমরা তারাজগৎ থেকে গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সি ক্লাস্টার ইত্যাদি বস্তুর উপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাতে পারি এবং কিসব তথ্যাদি খুঁজে পাই তার উপর অনেক কথা ও ছবি-চিত্র এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সৌরজগৎ, আন্তঃতারা মহাবিশ্ব, তারাজগৎ, ব্ল্যাক হোল, নিউট্রন তারা ইত্যাদি অনেক চিত্তাকর্ষক বস্তুর গঠনপ্রণালী ও কার্যকারিতার উপর বেশ গভীরে যেয়ে তথ্যানুসন্ধান চালানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা গ্যালাক্সি নামক বিশাল বিশাল তারাজগতের উপর অনেক ছবিসহ তথ্যাদি তুলে ধরেছি। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে গ্যালাক্সির পরিচিতি ও এর গতিবিধি এবং গঠনপ্রণালী, আমাদের ছায়াপথের পরিচিতি, আন্ড্রমেডা নামক প্রখ্যাত গ্যালাক্সির উপর তথ্যাদি।

এরপর সর্বশেষ অধ্যায়ে এসে আমরা বেশ গভীরে যেয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের উপর আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে আপেক্ষিকতা, ক্যুয়ান্টাম থিওরি, প্রাকৃতিক চার শক্তি এবং উপসংহার।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে অনেকেই উৎসাহ উদ্দীপণা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে আমার তরীকতের মুর্শিদ যুগশ্রেষ্ঠ অলিআল্লাহ, সিলেট বিভাগ তথা পুরো বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ও মুরুব্বী কুতবে জামান হযরত মাওলানা আমীনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম। আল্লাহ পাক তাঁর দারাজাতকে বুলন্দ করুন। এরপর এখানে উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা। তিনি মৃত্যুর ক'দিন পূর্বেও একবার আমাকে এই বলে উপদেশ দিলেন, 'তুমি লিখতে থাকো-যাও তুমি লিখো!'। আল্লাহপাক তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসে অধিষ্ঠিত করুন। লেখালেখির জন্য আরও আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন আমার আম্মা মরহুমা হাজ্যিাহ মমরাজ বিবি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চতর মাক্বামে অধিষ্ঠিত করুন।

এ প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করছি সাহেবজাদায়ে শায়খে কাতিয়া হাজী মাওলানা ইমদাদুল্লাহ আমিনী ও ক্বারী মাওলানা উবায়েদুল্লাহ আমিনী, হযরত শায়খে কাতিয়ার বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী [দামাত

বারাকাতুহুম], লেখক ও সাংবাদিক বন্ধুবর কবি আবদুল মুকিত মুখতার, প্রাবন্ধিক দেওয়ান শামসুল হুদা চৌধুরী, লেখক সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক এবং লেখক মাওলানা জালালুদ্দীন কালারুকী সাহেবকে। তাঁদের পরামর্শ ও সঙ্গলাভ থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি এবং লেখালেখির ক্ষেত্রে উৎসাহ পেয়েছি। আমি সকলের জন্য হায়াতে তায়্যিবাহ কামনা করছি মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারে।

সবশেষে পাঠকদের নিকট সবিনয় অনুরোধ, গ্রন্থটি ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা চালিয়েছি। এমনকি বানান বিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্য নিজে একটি 'স্পেলচেকার' বা বানান পরীক্ষকসহ টাইপিং প্রোগ্রাম বানিয়ে পুরো গ্রন্থটি রচনা করে পরীক্ষা করেছি। এরপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যদি কারো চোখে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে অবগত করার অনুরোধ রইলো। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট
০৮ এপ্রিল ২০১১ ঈসায়ী।

প্রথম অধ্যায়

অসীম থেকে অসীমে?

আমরা মনে করি যে কোনো বস্তু সৃষ্ট হলে তা অসীম হতে পারে শুধু ভবিষ্যৎ সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে। অর্থাৎ কোনো বস্তু যেহেতু সৃষ্ট তাই সেটা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব অর্জন করেছে। এখন স্বাভাবিক নিয়ম হলো তা আবার ধ্বংস হয়ে অস্তিত্বহীন হবে। কিন্তু কোনো বস্তু কি অসীম ছিলো এবং অসীম থাকবে- কখনো এরূপ হতে পারে? ব্যাপারটি একটু তলিয়ে দেখা যাক।

বস্তুজগৎ ধ্বংসশীল। কথাটা আমার নয়, আজকের আধুনিক বিজ্ঞানীদের অধিকাংশের মতামত এটাই। বস্তুর অস্তিত্ব যেভাবেই হোক না কেনো তা যে একদা ধ্বংস হবে সেটা নিশ্চিত বলে তারা ঘোষণা দিয়েছেন। এর কারণ হলো পুরো বিশ্বটাই একদা ধ্বংস হয়ে যাবে। আজকের বিজ্ঞান আমাদেরকে "বিগ ব্যাং" [Big Bang] নামক একটি জনপ্রিয় মতবাদ দ্বারা ব্যাপারটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে। সংক্ষেপে এতে বলা হয়েছে, সমগ্র বস্তুজগৎ একদা ছিলো না। আজ থেকে ১৪ কিংবা ততোধিক বিলিয়ন বছর পূর্বে অজানা এক কারণবশত এই মহাবিশ্ব বিরাট এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে। এরপর তা দ্রুত বর্ধিত হয়ে গ্যালাক্সি, তারা ক্লাষ্টার, তারা, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্ট হয়।[6] এই বর্ধিত হওয়ার ক্রিয়াটি কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত পুরো মহাবিশ্ব চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। তবে বিস্তৃতির গতি দিন দিন কমে আসছে। পুরো মহাবিশ্বব্যাপী যে মৌলিক শক্তি কাজ করছে তা-ই হলো বিস্তৃতিকে স্তিমিত করার কারণ। স্তিমিতকরণ প্রক্রিয়ায় যে মৌলিক শক্তিটি ক্রিয়া করছে তার নাম মহাকর্ষ [gravity]। এই শক্তিটি জগতের প্রতিটি পরমাণু-কণার মধ্যে বিদ্যমান। ধারণা করা হয় এই শক্তির ফলেই একদা জগতটি বিস্তৃত হওয়া থেকে বিরত হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়- এরপর তা আবার মহাকর্ষের প্রচণ্ড টানে

---

[6] তারা, তারাপুঞ্জ, গ্যালাক্সি ইত্যাদির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে।

উল্টো দিকে দ্রুত চলমান হবে এবং একদিন আরো একটি মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। সুতরাং জগতের কোনো বস্তুই অনন্ত জিনিসটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে না। সবকিছু সসীমের মধ্যে আবদ্ধ- এমনকি পুরো মহাবিশ্বও এ থেকে মুক্ত নয়। এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে উপ-শিরোনামে কেনো আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্নসহ "**অসীম থেকে অসীমে?**" বললাম? বিজ্ঞান দু'টি জিনিসকে অসীম থেকে অসীম হওয়ার জন্য ক্যান্ডিডেট বানিয়েছে। যদিও এ উভয়টিই মূলত অবস্তু এবং আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। এ দু'টো হলো:

১. সময় এবং ২. সংখ্যা।

সময় নিয়ে কতো কথা

সময় হলো বিজ্ঞানের ভাষায়, "**স্থিতির অভিজ্ঞতার চেতনা**"। সহজ ভাষায়, শুরু ও শেষের মধ্যে স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকায় আমরা সময়ের ধারণা পাই। সময়কে পর্যায় বলা যায়, যার মধ্যে কোনো ঘটনার সূত্রপাত, স্থায়িত্ব ও শেষ হয়। সময় একটি বিস্তৃতিও বটে। স্থানের মধ্যে তিনটি সুপরিচিত বিস্তৃতি আছে: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরত্ব। সময় যেহেতু সবকিছুর উপর ক্রিয়াশীল তাই একেও স্থানের চতুর্থ বিস্তৃতি হিসাবে ধরে নিতে হবে। বস্তু জগতের একটি মৌলিক বিষয় হলো সময়। বস্তুর সংজ্ঞা দিতে যেয়ে আমরা এর ম্যাস [কতটুকু বস্তু বিদ্যমান তার হিসাব], মহাকর্ষের ফলে সৃষ্ট গতি [ওজন], ঘনত্ব [ডেনসিটি - বিশেষ ভলিউম বা ঘনমানে কি পরিমাণ মলিকিউল আছে], এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরত্ব ইত্যাদির পরিমাণ ব্যক্ত করি। এছাড়া কোন্ বস্তু কিভাবে অস্তিত্বশীল আছে, এটা মৌলিক না মিশ্রিত পদার্থ ইত্যাদিও বলি। এসব তথ্যাদি জেনে নিলেই কিন্তু বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি জানা আমাদের হবে না- কারণ, বস্তুর মধ্যে সময়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। বস্তুর সৃষ্টি কবে হয়েছিল, এটা স্থিতিশীল না সময়ের প্রভাবে পরিবর্তনশীল- ইত্যাদিও আমাদেরকে জেনে নিতে হয়। এসব কারণেই আধুনিক ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যায় সময় হলো একটি মৌলিক বিষয়। সময়কে ছাড়া পুরো পদার্থবিজ্ঞান অচল। তবে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, সময়কে বুঝা সর্বাপেক্ষা কঠিন-জটিল ব্যাপার। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকে নিয়ে সময়। আমরা এই তিনটি ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত

কিন্তু বাস্তবে '**সময় কী?**' এ প্রশ্নের জবাব আমরা জানি না! বিজ্ঞানও একে সঠিকভাবে জানতে পেরেছে বলে দাবী করতে পারে নি।

সময় নিয়ে দার্শনিকরাও মাথা ঘামিয়েছেন এবং বলতে দ্বিধা নেই এখনও ঘামাচ্ছেন। কেউ কেউ মনে করেন, সময় কী জিনিস তা আমাদেরকে শিখে নিতে হয়। অভিজ্ঞতার আলোকেই সময়কে চিনতে হবে। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের [১৭২৪-১৮০৪] মতে, নবজাত শিশুরা সময় কী জিনিস বুঝতে পারে। কিন্তু অন্যরা বলেন, মানব মন সময়কে চিনতে যেয়ে সময়ের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হয়। ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসন [১৮৫৯-১৯৪১] বলেন, একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সময়ের ধারণা জন্মে। সময় একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু। অভিজ্ঞতা ছাড়া এর অস্তিত্ব বুঝা যাবে না। সুতরাং বার্গসনের মতে একটি শিশুকে সময় কি জিনিস তা শিখে নিতে হয় অভিজ্ঞতার আলোকে- সে তা এমনিতেই চিনতে পারবে না।

সময়কে চেনার জন্য উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা কতটুকু অতিরিক্ত জ্ঞানবান হয়েছি জানি না। তবে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সময় বাস্তবে একটি অভিজ্ঞতার নাম। আমাদের জন্ম হয়, বড় হই তারপর শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনিত হই। এরপর একদিন মৃত্যুর ডাক এসে যায়। ইতোমধ্যে আমাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, পৃথিবী তার আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কারণে রেকর্ড করে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছর। এ থেকে আমরা বলে থাকি অমুক ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।

এই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট 'পিরিওড' [period] বা স্থিতি অতিক্রান্ত হওয়া- এটাই আমাদের নিকট সময়ের অভিজ্ঞতা। এর বাইরে সময় নিয়ে আমরা অনেক কিছু বললেও বাস্তবে তা অনুভব করি না। দৃষ্টান্ত হিসাবে অতীত ইতিহাস নিয়ে যখন অধ্যয়ন করি, তখন বাস্তবে ঐ অতীত কালের ব্যাপারটি কল্পনা করতে পারি মাত্র। অভিজ্ঞতার আলোকে সেই দিন-কাল কেমন ছিলো তা জানতে অপারগ। তবে আমাদের চেতনাশীল জীবনের অভিজ্ঞতা যেহেতু মস্তিষ্কের স্মৃতি সংরক্ষণ কোষগুলোতে থাকে তাই তা আমরা বাস্তব মতো অতীতের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি। সত্যিকার অর্থে সময়ের বাস্তবতা আমাদের জীবনকালের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ- বাকী সবকিছুই কল্পনার জগতে বিদ্যমান। অবশ্য এখানে 'কল্পনা' বলতে অলীক, অবাস্তব নিষ্কলুষ কল্পনা-ক্ষমতা উদ্দেশ্য নয়। যা বলতে চাচ্ছি তাহলো, আমাদের জীবনসীমার বাইরে ঘটে যাওয়া অনেক ব্যাপার আমরা লোকমুখে কিংবা লিখিত কিতাবের মাধ্যমে জেনে নেওয়ার পর কল্পনা শক্তির সাহায্যে তা মস্তিষ্কের মধ্যে 'চিত্রিত' করে দেখি- সুতরাং এভাবে জানা কল্পনা-ক্ষমতার দ্বারা সম্ভব হয়। অপরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মস্তিষ্কের ক্ষমতা দ্বারা ঘটনাবলী সংঘটনের 'সময়ে' আমরা চলে যাই। তারপর ঐসব ঘটনার বিক্ষিপ্ত চিত্র বা ছবি মানসপটে ভেসে আসে। এভাবে জানার ক্ষেত্রে ভিন্ন মানুষ ভিন্নভাবে কল্পনার ছবি আঁকবে- সুতরাং সঠিকভাবে জানার মধ্যে সর্বদাই মৌলিক পার্থক্য থাকবে। অতএব, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে উপরে বর্ণিত উপায়ে জ্ঞানার্জনের মধ্যে বিরাট তফাৎ থেকেই যায়।

এবার ভেবে দেখা যাক, 'সময়' নামক এখনও অস্পষ্ট এই উপাদানটির অস্তিত্ব ও বিকাশ ঠিক কোথায় আছে? প্রশ্নটি কঠিন তাই সম্ভাব্য উত্তর নিয়ে আলোচনার পূর্বে এটির উপর আরো ব্যাখ্যা দরকার। জগতে সব বস্তুরই একটি ফিজিক্যাল স্টেট বা বাস্তব অবস্থা আছে যা থেকে এটির উপর আমরা সঠিক তথ্যাদি জেনে নিতে সক্ষম হই। যেমন মনে করুন, একখণ্ড পাথর যখন আমাদের চোখের সামনে পড়ে তখন আমরা ইচ্ছে করলে এটি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি বা¯তব অভিজ্ঞতার আলোকে জেনে নিতে পারি। আমরা পাথরটির ওজন, আয়তন, কোন্ কোন্ পদার্থ দ্বারা তৈরী, এর বয়স, রং ইত্যাদি যদি সঠিকভাবে জেনে নিই তাহলে এটিকে চেনার ক্ষেত্রে বেশ গভীরে যেয়ে পৌঁছুব। একইভাবে 'সময়' নামক উপাদানটির অস্তিত্ব, অবস্থান, বিকাশ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি জানতে পারলে এটি সম্পর্কে আমরা অধিক জ্ঞানবান হতে পারবো। সময় নিয়ে যখন আমরা এভাবে গবেষণা করতে যাই তখনই আমাদের সম্মুখে কিছু আশ্চর্য ব্যাপার আত্মপ্রকাশ করে।

নীচের চিত্রটি দেখুন। আমরা সর্বদাই ধারণা করি এবং মেনেও নিই যে, সময় মূলত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু কথাটা কতটুকু সত্য? লক্ষ করুন, সময় নামক জিনিসটি কি তা বুঝা কতো কঠিন! কারণ আসলে সময় একটি অতি সূক্ষ্ম মুহূর্তও নয়- বাস্তবে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র [infinitesimal] ক্ষণ

মাত্র। এই অসীমভাবে ক্ষুদ্র কালটি আবার চলমান, মুহূর্তটি অতিবাহিত হলেই সময়ের আর অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং অতীত মূলত অভিজ্ঞতা, স্মরণ ও ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তব কোনো বস্তু অতীত নয়। একইভাবে ভবিষ্যৎ বলতে বাস্তব কোনো ব্যাপার নেই- ভবিষ্যতের অস্তিত্ব কোনো ধ্রুব সত্য জিনিস নয়। বর্তমান যেহেতু চলমান তাই কালের পরিবর্তনে বস্তুজগতে রদবদল আসে তাই আমরা বলি, "**এক ঘণ্টা পরে, আগামীতে বা কাল কিংবা পরশু**"। আসলে ভবিষ্যৎ সত্যিকার অর্থে আছে কি না তা-ও নিশ্চিতভাবে বলার কোনো উপায় নেই। যদি কোনো অদৃশ্য শক্তি চলমান সময়কে অচল, চিরদণ্ডায়মান করে বসে- তাহলে উপায় কি? সুতরাং সময় মূলতঃ ডাইনামিক, চিরচলমান একটি উপাদান যার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি অতি ক্ষুদ্রকায় 'বর্তমান' এর মধ্যে। সময় অর্থই 'চলমান বর্তমান' [moving present]- আর কিছু নয়। অতীত হচ্ছে বর্তমানের রেকর্ড যা অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত থাকে আমাদের মস্তিষ্কে আর ভবিষ্যৎ হলো সম্ভাব্য বর্তমান যা আসবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে **'সময়'** নামক উপাদানকে আমরা এখন ভিন্নভাবে দেখতে বাধ্য- নয় কি? এবার প্রশ্ন জাগে এই সময় যেহেতু অতীতে সদাচলমান তাই ধরে নেওয়া যায় সুদূর অতীতেও সময় ছিলো। আর এতোকাল যাবৎ এই সময় যেহেতু ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান আছে তাই সেখান থেকে সর্বদাই এটা বর্তমানে

এসে পৌঁছুবে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব ও এর ভেতর দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যাবতীয় বস্তু অস্তিত্বশীল থাকাবস্থায় সর্বদাই ভবিষ্যৎ নামক অজানা কাল বর্তমানে এসে পৌঁছে যাবে। মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর অস্তিত্বের দীর্ঘ ইতিহাস এর প্রমাণ। এখন, এ থেকেই কি সময়ের শুরু ও শেষ সম্পর্কে কিছু জানার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

সময় অতীতে 'সৃষ্ট' হয়েছিল- না তা সর্বদাই অস্তিত্বশীল ছিলো? এই জটিল প্রশ্নের সঠিক উত্তর বিজ্ঞান থেকে জানা আদৌ সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। হ্যাঁ, আমরা বিজ্ঞানের আলোকে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, সৃষ্ট জগতের শুরু থেকেই সময় অস্তিত্বশীল আছে। অর্থাৎ, সৃষ্টির শুরু থেকেই সময়ের ক্রিয়া বস্তুজগতে বিদ্যমান।

বিজ্ঞানীরা আজকাল জগতসৃষ্টি গবেষণায় যে থিওরির উপর আস্থাশীল তার নামটি আমি ইতোমধ্যে ব্যক্ত করেছি: "**দ্যা বিগ ব্যাং থিওরি**" [The Big Bang Theory]। এতে বলা হয়েছে সুদূর অতীতে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বশীল হয়েছে। শূন্য থেকে হঠাৎ এক অজানা কারণবশত মহাবিশ্বের জন্ম। একই সাথে জন্ম নিয়েছে সময়ও। তারা বলেন, সময়ও সৃষ্ট তাই যেহেতু মহাবিশ্ব অস্তিত্বহীন থাকাবস্থায় সময়ের জন্ম হয় নি- তাই সৃষ্টির "পূর্ব" বলা অবান্তর। কোনো পূর্বমুহূর্তের অস্তিত্ব ছিলো না তাই সে ব্যাপারে প্রশ্ন করারও কোনো মানে নাই। এই কথাগুলো বেশ যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়, কিন্তু ... আমাদের মনের গভীরে এই প্রশ্ন থেকেই যায়- সৃষ্টির পূর্বে কি ছিলো? কোন্ কারণে শূন্য থেকে এক বিরাট মহাবিশ্ব জন্ম নিলো? এর পেছনে কোন্ মহাশক্তি ক্রিয়া করেছিল? এককথায়, সময় যদিও সৃষ্টির মুহূর্তে একই সঙ্গে জন্মলাভ করেছিল কিন্তু জন্মের আগে কি হয়েছিল সে প্রশ্নের জবাব জানার স্পৃহা থেকে আমরা কখনও মুক্ত হতে পারছি না। আর এখানেই লুকিয়ে আছে এক বিরাট রহস্য।

সৃষ্টির পেছনে কারণ ছিলো; এবং যদিও আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে তখন '**সময়**' এর জন্ম হয় নি- কারণ, সময়কে আমরা স্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখি- তথাপি, সময় অন্যভাবে তখনও অস্তিত্বশীল ছিলো যার সম্পর্কে কোনো ধারণাই আমাদের নেই। বরং ধারণা করাও অসম্ভব। এদিক থেকে আমরা এ কথার

উপর বিশ্বাস রাখতে বাধ্য যে, সময় সৃষ্টিমুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করেছে- অর্থাৎ সৃষ্ট হয়েছে। এর পূর্বে ছিলো কি না তা আমাদের পক্ষে আদৌ জানা যাবে না। সুতরাং আমরা একদিকে বলতে পারি যে, সময় সৃষ্ট ও অপরদিকে বলতে বাধ্য জগতসৃষ্টির পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিলো কি না জানি না। তাই **'অসীম থেকে অসীমে?'** [from infinity to infinity] প্রশ্নের উত্তরে আমাদেরকে বলতে হবে, জাগতিক 'সময়ের' শুরু ছিলো এবং শেষও আছে। 'অসীম' নামক গুণের অধিকারী হলেন মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা যিনি সময়কে সৃষ্টি করেছেন।[7] বিজ্ঞান বলছে, জগতসৃষ্টির পূর্বে সময়ই ছিলো না- কিন্তু একটি শক্তি ছিলো যা হলো সৃষ্টির কারণ। বাকী থাকলো ভবিষ্যতের কথা।

আমরা বলতে বাধ্য জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলে জাগতিক সময়ের ইতি ঘটবে। সুতরাং এখানেও বলতে হচ্ছে 'জাগতিক সময় মূলত ধ্বংসশীল'। কিন্তু যে এর স্রষ্টা তিনি চিরঞ্জীব। আর পরকালীন জীবন তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে একটি কালের মধ্যে আবদ্ধ করবেন, যার স্বরূপ বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ আদৌ সম্ভব নয়। মোটকথা, **'জাগতিক সময়ের'** শুরু ছিলো শেষও আছে- অর্থাৎ এটা সসীম [finite]। আর পরকালীন জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। এ দু'টি বাক্যের প্রথমটি বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যাত আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে কোনো তথ্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার কোনো উপায় নেই।

সময়কে মাপা

আমরা ইতোমধ্যে সময় বা কাল বলতে কি বুঝায় তার তাত্ত্বিক আলোচনা করেছি। এবার আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক কোন্ কোন্ উপায়ে আমরা ইহলোকে সদাচলমান সময়কে মেপে থাকি। এ ব্যাপারে অবশ্য বেশী বলার প্রয়োজন মনে করছি না যে, সময়কে মাপার মৌলিক সূত্র সৌরজগতে আমাদের এই পৃথিবী ও

---

[7] এখানে উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিকর্তার 'সময়' ও আমাদের ধারণাকৃত 'সময়' এক জিনিষ নয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বিচারদিবসের আলোচনায় বলা হয়েছে: 'এমন একদিন- যা তোমাদের হিসাবে ৫০ হাজার বছর।" [৭০:৪] এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টিমুহূতের পূর্বের 'সময়' আমাদের হিসাবের 'সময়' থেকে ভিন্ন ছিলো। প্রভুর সে 'সময়' অসৃষ্ট ও চিরন্তন। অন্যদিকে আমাদের 'সময়' সৃষ্ট, আপেক্ষিক এবং নশ্বর।

চন্দ্রের বিভিন্ন গতিবিধির উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন সভ্যতা নিজেদের সুবিধার্থে এসব গতিবিধিকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করে ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছে।[৪] নিম্নে আমরা এরূপ ক'টি প্রসিদ্ধ ক্যালেন্ডার সিস্টেমের উপর আলোচনা করছি। তবে প্রথমে পঞ্জিকার সংজ্ঞা জেনে নিতে হবে।

ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা

পঞ্জিকার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে আমরা বলতে পরি: "**মানুষের সুবিধার্থে সময়কে বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ড দ্বারা বিভক্তিকরণকেই বলে পঞ্জিকা।**" আর এটা অর্জন করতে যেয়ে আদি কাল থেকেই মানুষ আপাতদৃষ্টিতে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর গতিবিধিকে কাজে লাগিয়েছে। আমরা সর্বদাই সূর্যকে পূর্বদিকে উদিত হতে
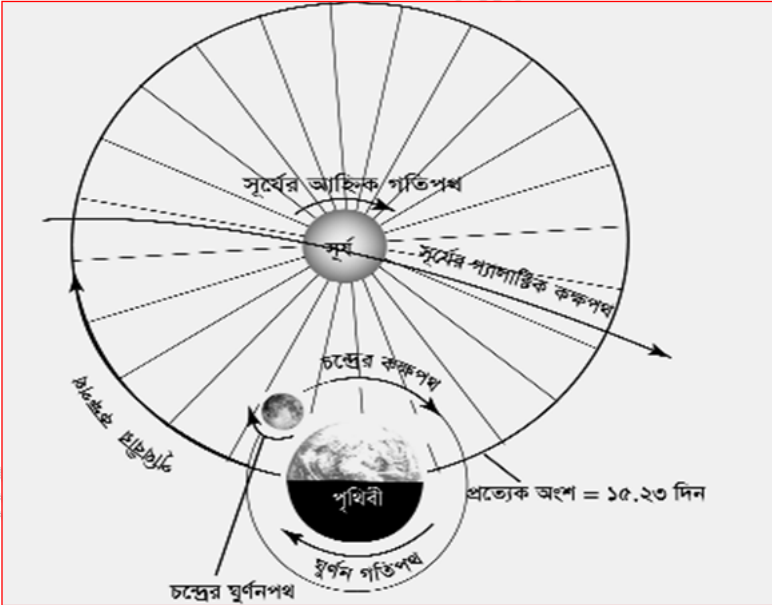
[৪] সময়কে যে যেভাবেই মাপজোখ করুক না কোনো, মনে রাখা জরুরী যে 'সময় মূলত আপেক্ষিক'। এ্যাবস্যুলুট কাল [absolute time] বলতে কিছুই নেই। আলবার্ট আইনস্টাইনের [১৮৭৯-১৯৫৫] থিওরি অব রিলেটিভিটি'র কেন্দ্রীয় বিষয়ই হচ্ছে এটি।

দেখি এবং নির্দিষ্ট কিছু সময়ের ব্যবধানে তা আবার পশ্চিমাকাশে ডুবে যায়। এরপর অন্ধকারে আরো একটি নির্দিষ্ট কাল নিমজ্জিত থাকার পর সূর্যটি সেই আগের জায়গায় ফিরে এসে পূর্বে উদয় হয়- আলোকিত করে তুলে পৃথিবীর মাটিকে। এই দিবারাত্রের আবর্তন থেকেই ক্যালেন্ডার তৈরী হয়েছে। আদি যুগে সূর্যকে সত্যিই পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথে ঘূর্ণমান মনে করা হতো। তবে পরবর্তীতে পরীক্ষা করে দেখা গেল- বাস্তবে যদিও সূর্যও স্থির নেই, তবে পৃথিবীটা মূলতঃ তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে প্রত্যহ একবার ঘুরে আসে [বা স্পিন করে]। এর ফলেই সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যায়। যা হোক, রাত কিংবা দিন বলতে কি বুঝায় তা আশারাখি পাঠকরা পুরোপুরি অবগত আছেন। এ ব্যাপারে আরো কিছু চিত্তাকর্ষক ব্যাপার জানার জন্য পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

চিত্রটি স্কেল ছড়াই আঁকা হয়েছে। ক্যালেন্ডার সিস্টেম বা সময়কে মাপার উপায় এই চিত্র থেকে স্পষ্ট হবে আশারাখি। সৌরজগতে আমাদের পৃথিবী হলো মোট নয়টি গ্রহের একটি।[9] এটি সূর্য থেকে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে প্রদক্ষিণরত আছে। পৃথিবী, সূর্য ও পুরো সৌরমণ্ডলের বেশ ক'টি গতি আছে। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে দু'টি গতি সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট। এর একটি হলো দৈনিক ঘূর্ণন গতি আর অপরটি বাৎসরিক প্রদক্ষিণ গতি। প্রথম গতিটি থেকে 'একদিন' হিসাব করা হয় আর দ্বিতীয়টি থেকে 'এক সৌরবছর' বের করা হয়।

সূর্য পূর্বদিকে উদয় হওয়ার কাল থেকে পুনরায় উদয় হওয়ার পিরিওডকে আমরা একদিন বলি। এই পিরিওডকে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় বিভক্ত করা হয়েছে। উপরের ছবিতে আমরা চন্দ্রের দু'টি গতি দেখতে পাচ্ছি। চান্দ্র্য ক্যালেন্ডারের জন্য পৃথিবীর চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসা বা পূর্ণ চন্দ্র দৃশ্যমান হওয়ার পিরিওডই হিসাবের জন্য যথেষ্ট। পৃথিবীর দিন হিসাবে চন্দ্র ঘুরে আসতে ২৯.৫ দিন সময়

[9] এ গ্রন্থ প্রকাশের সময় জানা গেছে, এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সৌরজগতে ১টি তারা (সূর্য), ৮টি গ্রহ, ৫টি বামন গ্রহ (dwarf planet), ১৮৪টি উপগ্রহ (চাঁদ), অসংখ্য গ্রহাণু (asteroid) ও ধূমকেতু (comet) সনাক্ত করেছেন। দূরের গ্রহ প্লুটোকে এখন আর 'গ্রহ' না বলে 'বামন গ্রহ' বলা হয়। এ হিসেবে মোট গ্রহের সংখ্যা ৮টি।

লাগে।[10] এই পিরিওডই হলো চান্দ্র্যমাসিক ক্যালেন্ডার সিস্টেমে এক মাসের পরিমাণ। অপরদিকে সৌরক্যালেন্ডার প্রবর্তনে সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে যে পিরিওড অতিবাহিত হয় তাকে ১ বছর বলে। এই পিরিওডকে দিনে রূপান্তর করলে তা দাঁড়ায় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫.৫ সেকেন্ড। এখন বুঝাই যাচ্ছে এই সংখ্যাটি ১২ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য নয়। এর ফলেই প্রত্যেক মাসকে ৩০ দিনে করা সম্ভব নয়। অপরদিকে চান্দ্র্যমাসের হিসাবে ১২ মাসে বছর করতে যেয়ে মোট সময় লাগে ৩৫৪ দিন। এতে সৌরবছর থেকে ১১.২৫ দিন কম থেকে যায়। একটু পরই আমরা বিভিন্ন ক্যালেন্ডারের উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরছি। আমরা আরেকটি হিসাব করে থাকি যাকে বলে সপ্তাহ। এটা আসলে স্বভাবের কোনো মৌলিক গতি বা ক্রিয়া থেকে আসে নি বরং সুবিধার জন্য ৭ দিনে এক সপ্তাহ করা হয়েছিল আদি যুগে। বিভিন্ন সভ্যতায় সপ্তাহের প্রচলন ছিলো এবং আজও আছে। মাসের নামের মতো বারেরও বিভিন্ন নাম বিদ্যমান।

বিভিন্ন সভ্যতায় পঞ্জিকা

আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছি যে, সর্বপ্রথম ক্যালেন্ডারের প্রচলন শুরু হয় ব্যাবিলনে। তারা চান্দ্র্যবছর হিসাবে ১২ মাসে বছর নির্ণয় করে। প্রতিটি মাস দৈর্ঘ্যে ৩০ দিন ছিলো। প্রয়োজনে তারা অবশ্য কোনো কোনো মাসের দৈর্ঘ্য লম্বা-বেটে করতো। এরপর মিশরে সর্বপ্রথম সৌর ক্যালেন্ডার চালু হয়। তারা বছরের মধ্যে ৩৬০ দিন ধরে প্রতি মাসে ৩০ দিন রেখে ১২ মাসে বছর হিসাব করতো। বছর শেষে ৫ দিন অতিরিক্ত নিয়ে ৩৬৫ দিন পূর্ণ করতো।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডার

আধুনিক সৌর ক্যালেন্ডারের প্রবর্তক ছিলেন রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার [খ্রি.পূ. ১০০?-৪৪]। তারই নামানুসারে এই ক্যালেন্ডারের নামকরণ হয় জুলিয়ান ক্যালেন্ডার [Julian Calendar]। এই ক্যালেন্ডারে আজকের মতো ৩৬৫.২৫

[10] বাস্তবে চন্দ্রমাসের গড় পিরিওড হলো: ২৭ দিন, ১২ ঘণ্টা, ৪৪ মিনিট, ২ সেকেন্ড।

দিনে বছর ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই ক্যালেন্ডারে যেহেতু চার বছর পরপর একদিন বেড়ে যায় তাই 'লীপ ইয়ার' [leap year] সিস্টেম চালু করা হয়। অর্থাৎ প্রতি চার বছর পরপর ফেব্রুয়ারী মাস ২৯ দিনে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে এই ক্যালেন্ডার সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলো না। একে পরবর্তীতে কিছুটা পরিবর্তন করতে হয়েছে।

গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার

পরীক্ষা করে দেখা গেছে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে বছরের দৈর্ঘ্য ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড অতিরিক্ত। এই মানটি তেমন বড় মনে না হলেও শত শত বছর পর সমস্যার সৃষ্টি হলো। এই সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়ালো ১৫৮২ সালে। চার্চের পাদ্রীরা খ্রিস্টান বিভিন্ন ধর্মোৎসব নিয়ে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। কারণ এসময় ঐ ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড দীর্ঘকালে জমা হয়ে ১০ দিনের ব্যবধান সৃষ্টি করলো। এ বছর 'ভারনেল এক্যুনক্স' [মহাবিষুব] [vernal equinox] ২১ মার্চ না হয়ে ১১ মার্চ দেখা দিল। তখনকার শক্তিশালী রোমান ক্যাথোলিক চার্চের পোপের নাম ছিলো গ্রেগোরী ত্রয়োদশ [১৫৭২-১৫৮৫]। তিনি ক্ষমতাবলে এক নির্দেশ জারী করলেন যে, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে ১০ দিন মুছে দিতে হবে! সুতরাং ১১ মার্চ ২১ মার্চে পরিণত হয়ে গেল। পোপ একটি উন্নতমানের ক্যালেন্ডারও প্রবর্তন করলেন যাকে এখনও তারই নামানুসারে 'গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার' [Gregorian Calendar] বলে। ঐ ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের সমস্যা দূর করতে যেয়ে তিনি বললেন, প্রত্যেক শতবছর যদি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে ঐ বছর হবে লীপ ইয়ার। সে বছর ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে না হয়ে ২৯ দিনে হবে। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান পুরোদমে হলো না।

নিউ স্টাইল ক্যালেন্ডার

পোপ গ্রেগোরির ক্যালেন্ডার ধীরে ধীরে পুরো ইউরোপব্যাপী ব্যবহৃত হতে লাগলো। ইংল্যান্ডে ১৭৫২ সালে এই ক্যালেন্ডার যখন অনুমোদন করা হয় তখন আবারো সেই পুরাতন সমস্যার সৃষ্টি হলো। সুতরাং সবাই মিলে ক্যালেন্ডার থেকে পুনরায় ১১ দিন মুছে দিলেন। সেপ্টেম্বর ২-কে ১৪ সেপ্টেম্বর হিসাবে ঘোষণা করা হলো। একই বছর বৃটিশরা বছরের শুরু জানুয়ারী ১ তারিখে নিয়ে আসলেন। এরপর

ধীরে ধীরে এই নিউ স্টাইল গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার [New Style Gregorian Calendar] ইউরোপব্যাপী চালু হয়ে গেল। রাশিয়া ১৯১৮ এবং গ্রীস ১৯২৩ সালে এই ক্যালেন্ডারকে গ্রহণ করে নেয়। তবে গ্রীকরা তাদের খ্রিস্টীয় বিভিন্ন উৎসবের জন্য পুরাতন জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকেই রেখে দেয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে প্রচলিত নিউ স্টাইল ক্যালেন্ডারকে 'খ্রিস্টান ক্যালেন্ডার' নামেও অভিহিত করা হয়। কারণ এটা হযরত ঈসা [আঃ] বা যীশু খ্রিস্টের জন্ম তারিখের উপর ভিত্তি করে চালু করা হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হলো লাতিন ভাষায় 'এডি' [AD] মানে অ্যানো ডমিনি [Anno Domini - in the year of our Lord] হলেও আধুনিক খ্রিস্টান স্কলারদের মতে যীশু খ্রিস্টের জন্ম ১ এডিতে হয় নি- বরং তিনি ৪ বিসি [Before Christ] জন্মগ্রহণ করেন!

ধর্মভিত্তিক ক্যালেন্ডার

ইতোমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি, বর্তমানে ব্যবহৃত গ্রেগোরিয়ান বা নিউ স্টাইল ক্যালেন্ডার মূলত খ্রিস্টান ক্যালেন্ডার হিসাবে খ্যাত। তবে পৃথিবীতে আরোও অনেক ক্যালেন্ডার আছে যেগুলো আসলে ধর্মভিত্তিক। সাধারণত ধর্মপ্রবর্তকের জন্ম তারিখ কিংবা ঐ ধর্মের ইতিহাসে কোনো বিশেষ দিবস থেকে এসব ক্যালেন্ডার শুরু হয়েছে। এরূপ ধর্মভিত্তিক ক্যালেন্ডারের মধ্যে ইয়াহুদী ক্যালেন্ডার, ইসলামী ক্যালেন্ডার, অ্যাজটেক ক্যালেন্ডার ও মায়া ক্যালেন্ডার এখানে উল্লেখযোগ্য। আমরা এ প্রসঙ্গে ইয়াহুদী ও ইসলামী ক্যালেন্ডারের উপর আরো কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

ইয়াহুদী পঞ্জিকা

হিব্রু কাল নির্ঘণ্ট [chronology - ক্রনোলজি] শুরু হয়েছে ঈসা [আঃ] এর জন্মের ৩৭৬১ বছর পূর্বে। ইয়াহুদীদের মতে এর পূর্বমুহূর্তে জগতসৃষ্টি হয়েছিল! ইয়াহুদীদের ক্যালেন্ডার মূলত চান্দ্রসৌরিক [Luni-Solar]। চন্দ্রের আবির্ভাবের উপর ভিত্তি করে ১২ মাসে এক বছর হয়। এতে আছে ৩০ ও ২৯ দিনে মাস। প্রত্যেক তিন বছর পর একটি অতিরিক্ত মাস যোগ করা হয়। ইয়াহুদীরা তারিখ

লিখতে AM [Anno Mundi] ব্যবহার করে। এর অর্থ ‘পৃথিবীর বছর’। কোনো কোনো সময় BCE [Before Common Era] লিখা হয়।

ইসলামী ক্যালেন্ডার

এই ক্যালেন্ডার সম্পূর্ণ চান্দ্র্যমাসিক। এটাকে হিজরি সন-তারিখ বলে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [৫৭০-৬৩২] -এঁর হিজরতের তারিখ থেকে এই ক্যালেন্ডারের গণনা শুরু হয়েছে। এই সিস্টেমে ১২টি চান্দ্র্যমাস আছে। ৬২২ ঈসায়ী সাল থেকে হিজরী ক্যালেন্ডার শুরু হয়েছে। সৌরবছরের সঙ্গে এই ক্যালেন্ডারের পার্থক্য ১১.২৫ দিন। সৌরবছর ধরা হয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে, কিন্তু চন্দ্রবছর হলো ৩৫৪ দিনে। এর ফলেই হিজরি বছর বিভিন্ন সিজনে ঘূর্ণমান। প্রত্যেক বছর ১১ দিন পূর্বে মুহাররম মাস শুরু হয়ে থাকে। এই ক্যালেন্ডারেও লীপ ইয়ার বিদ্যমান। ত্রিশ বছরের একটি চক্র আছে। এরই মধ্যে ২য়, ৫ম, ৭ম, ১০ম, ১৩তম, ১৬তম, ১৮তম, ২১তম, ২৪তম, ২৬তম এবং ২৯তম বছর হবে লীপ ইয়ার, যাতে বছরে মোট দিন সংখ্যা হয় ৩৫৫। এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, হিজরি মাসের শুরু ‘নতুন চাঁদের’ আবির্ভাব ও তা পৃথিবীর মানুষের চক্ষে দৃশ্যমান হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

সময়ের বৈজ্ঞানিক স্ট্যান্ডার্ড

বিজ্ঞানীরা সেকেন্ডের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতিকে বৈজ্ঞানিক সময়ের স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ধরে নিতেন। কিন্তু ১৯৫৫ সালে তা বদলে যায়। তারা তখন বললেন, ১ সেকেন্ড = ১/৮৬,৪০০ অব গড় সৌরবছর। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর ঘূর্ণনও সম্পূর্ণ নিয়মানুবর্তী নয়। কিছুটা বেশকম আছে। এর ফলে সেকেন্ডকে আবার সংজ্ঞায়িত করা হলো। বলা হলো ১ সেকেন্ড = ১/৩১,৫৫৬,৯২৫.৯৭৪৭ অব সৌরবছর। কিন্তু এটাও আজকাল আর গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে সময়কে ‘এটমিক স্ট্যান্ডার্ড’ [Atomic Standard] দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়: ১ সেকেন্ড = সিজিয়াম-১৩৩ এটমের দু’টি সূক্ষ্ম এনার্জি স্টেটের ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০-টি কম্পন বা পিরিওড।

সময়ের ফিজিক্স

আধুনিক যুগে এসে এখনও অস্পষ্ট 'সময়' নামক জিনিসটির উপর ব্যাপক গবেষণার একাধিক মৌলিক কারণ বিদ্যমান। প্রথমত সময়কে আধুনিক বিজ্ঞানে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পদার্থবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং দর্শন সময় বা কাল ছাড়া অকেজো। সময়ের সঠিক ধারণার উপর নির্ভর করে পৃথিবী, মহাবিশ্ব ও আমাদের নিজস্ব অস্তিত্ব বলতে কী বুঝায় তা জানা ও বুঝা। সুতরাং এখন এ পর্যন্ত সময় নিয়ে বিজ্ঞান কিভাবে গবেষণা করেছে তার উপর একটি তথ্যমূলক বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

গেল শতকের প্রথম দশকে জার্মান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন [১৮৭৯-১৯৫৫] সময়কে আধুনিক ধাঁচে সাজিয়েছেন। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত তার বিশেষ থিওরি অব রিলেটিভিটি [relativity -বা আপেক্ষিকতাবাদ] দ্বারা সময়ের নতুন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আমরা যেভাবে ইতোপূর্বে সময়কে নিয়ে ধারণা করতাম, সময় মূলত তা নয়। সময় সর্বদাই পর্যবেক্ষকের অবস্থান তথা গতির উপর নির্ভরশীল। অন্য কথায় পর্যবেক্ষকের আপেক্ষিক গতির দ্বারাই সময়কে মাপা যায়- অন্য কোনো উপায়ে নয়। এই মহাবিশ্বে এমন একটিও স্থির বিন্দু নেই যে স্থানকে রেফারেন্স হিসাবে সাব্যস্ত করে সময় বা কাল নির্ণয় করতে পারি। যেমন আমরা পৃথিবীতে বসে সূর্যকে রেফারেন্স করে সময় নির্ণয় করি। কিন্তু অপর কোনো গ্রহে বসে এই একই ফলাফল পাবো না- কারণ সে ক্ষেত্রে গ্রহের আহ্নিক ও বার্ষিক গতির মধ্যে পার্থক্য হেতু পর্যবেক্ষকের গতির মধ্যেও বেশকম থাকবে। সুতরাং অন্য গ্রহে বসবাসকারী ব্যক্তির নিকট একদিন, এক ঘণ্টা কিংবা এক মিনিট আমাদের হিসাবে ভিন্ন হবে।

পর্যবেক্ষক-নির্ভর সময়ের ধারণা থেকেই আইনস্টাইনের প্রখ্যাত 'টাইম ডায়লেশন' [Time Dilation] ব্যাপারটি উদ্ভুত হয়েছে।[11] তিনি দেখিয়েছেন-

[11] Dilation শব্দের অর্থ হলো, প্রসারণ বা বিস্তারণ। আইনস্টাইনের মতে 'সময়' এর বিস্তারণ মূলত আলোকের গতির সাথে সম্পর্কিত।

সময়ের একটি অদ্ভুত সত্য হলো কোনো বস্তু বা কারো গতি যদি আলোকের কাছাকাছি উচ্চ গতিসম্পন্ন হয়, তাহলে সময় এ বস্তু কিংবা ব্যক্তির উপর দিয়ে ধীরে চলবে। অর্থাৎ রিলেটিভিস্টিক গতিতে কেউ চলতে পারলে তার বয়স অন্যদের তুলনায় বাড়বে অনেকটা আস্তে। সুতরাং দুই ভাইয়ের একজন যদি আলোকের কাছাকাছি গতিতে মহাকাশে ভ্রমণে যায়, আর অপরজন পৃথিবীতে থাকে তাহলে ঐ ভ্রমণকারী ফিরে এসে দেখবে তার ভাইয়ের বয়স অনেকটা বেড়ে গেছে- কিন্তু তার নিজের বয়স অতি সামান্যই বেড়েছে! অন্য কথায় এরূপ গতিতে চলার পর যে কোনো ব্যক্তি হাজার হাজার বছর ভবিষ্যতে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে। তবে সময় শুধু গতির সাথেই সম্পর্কিত নয়। [আপেক্ষিকতাবাদের উপর বিস্তারিত অষ্টম অধ্যায়ে দেখুন]

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, কোনো বড় মাপের বস্তু- যেমন সূর্যের নিকটে যেহেতু মহাকর্ষের মাত্রা বিরাট, তাই সময়ও সেখানে ধীরে চলবে। 'ব্ল্যাক হোল' নামক বস্তুর নিকটে এই সময়-বিকৃতি অত্যন্ত বেশী, কারণ এসব বস্তুর চতুর্দিকে বিরাজ করে বিরাট শক্তিশালী মহাকার্ষিক ফিল্ড। আইনস্টাইন ১৯১৬ সালে তার প্রখ্যাত জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রকাশ করেন। তিনি এতে বলেছেন, সময় মূলত স্পেইস বা স্থানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যকথায় যেখানে স্পেইস সেখানে টাইম। একটা ছাড়া আরেকটা কল্পনাতীত। আর মহাকর্ষ এই স্থানকে বক্র বা সংকোচন করে দেয়। এই বক্র স্থানের উপর দিয়ে সময় চললে তার গতি অনেকটা কমে আসে। সময় সম্পর্কে এসব চিত্তাকর্ষক ও অদ্ভুত "বৈজ্ঞানিক কথা" বারবার পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। এতে এটাই বলা যায়- সময় যাই হোক এখনও সে আমাদের জন্য অনেক রহস্য লুকিয়ে রেখেছে, যা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটন হবে।[12]

---

[12] 'সময়' সম্পর্কে আইনস্টানের এসব আবিষ্কার ঈমানদার হিসেবে আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলে। পবিত্র কুরআনেও সময়ের গতি বিভিন্নভাবে চলমান থাকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনায় বলা হয়েছে, যুবকরা দীর্ঘ ৩০০ বছর ঘুমন্তাবস্থায় ছিলো। তারা এই দীর্ঘ সময় অক্ষত থাকে। সময় তাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়নি। তারা জেগে ওঠে ভেবেছিলো একদিন কিংবা এর আংশিক সময় মাত্র ঘুমন্ত ছিলো। এখানে পৃথিবীতে একই সঙ্গে অবস্থানরত দুটি মানবগোষ্ঠির (গুহার যুবকরা ও বাইরের সকল লোকের) ওপর সময় ভিন্নভাবে চলমান হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। অর্থাৎ সময় যে আপেক্ষিক তা অহির্জ্ঞানের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। দেখুন, সূরা কাহাফ।

ভূতাত্ত্বিক সময়

ভূতত্ত্ববিদরা পৃথিবী নিয়ে গবেষণায় “জিওলজিক টাইম স্কেল” [Geologic Time Scale] বা ভূতাত্ত্বিক সময়-মাত্রা ব্যবহার করেন। ধারণা করা হয় আমাদের বছর হিসাবে পৃথিবীর বয়স ৪.৫ হাজার মিলিয়ন বছর। [১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ] এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পুরো পৃথিবীব্যাপী অনেক বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং ঐসব ঘটনাবলীকে বুঝাতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা এই দীর্ঘ সময়কে একাধিক জিওলজিক্যাল ‘ইওন’ [Eon] ও ‘ইরা’-তে [Era] বিভক্ত করেছেন। ইওন খুব দীর্ঘ সময়, আর একাধিক ইরা থেকে একেকটি ইওন ঘটিত। ইরাকেও একাধিক ‘পিরিওডে’ [Period] বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক পিরিওড আবার কয়েকটি ইপোকের [Epoch] সমষ্টি। বাংলায় ইওন অর্থ অপরিমেয় কাল, ইরা মানে যুগ, পিরিওড অর্থ ভূতাত্ত্বিক কালসীমা এবং ইপোক অর্থ বৈশিষ্ট্যসূচক সময়। আমরা এ প্রসঙ্গে ভূতত্ত্বের উপর বিস্তারিত বলতে যাচ্ছি না- তবে সময়কে কিভাবে বিভক্ত করে দেখা হয় তার একটি ধারণা দেওয়া উদ্দেশ্য। এখানে মৌলিক ক’টি কালের বর্ণনা তুলে ধরছি।

ভূতত্ত্ববিদরা জিওলজিক্যাল সময়কে তিনটি সুদীর্ঘ ইওনে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো:

১. আরকিয়ান [Archean]- ৩.৮ থেকে ২.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বেকার সময়;

২. প্রটারোজোইক [Proterozoic]- ২.৫ বিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ৫৭০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়;

৩. এবং ফানারোজোইক [Phanerozoic] - ৫৭০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি।

উল্লেখ্য প্রথম দু’টি কালকে ‘প্রিক্যামব্রিয়ান টাইম’ [Precambrian Time] নামেও ডাকা হয়। শেষোক্ত ইওনকে তিনটি ইরায় বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো পালেওজোইক [Paleozoic] - ব্যাপ্তিকাল ৫৭০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ২৪০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত; মেসোজোইক [Mesozoic] - ব্যাপ্তিকাল ২৪০

মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত এবং সিনোজোইক [Cenozoic] - ব্যাপ্তিকাল ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়।

উপরে বর্ণিত পালেওজোইক ইরাকে আবার ছ'টি পিরিওডে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো:

১. ক্যাম্ব্রিয়ান [Cambrian- ৫৭০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ৫০০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত];
২. অরদোভিশিয়ান [Ordovician- ৫০০ মিলিয়ন পূর্ব থেকে ৪৩৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত];
৩. সিলোরিয়ান [Silurian- ৪৩৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ৪১০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত];
৪. ডেভোনিয়ান [Devonian- ৪১০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ৩৬০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত];
৫. কার্বোনিফেরাস [Carboniferous- ৩৬০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ২৯০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত];
৬. এবং পারমিয়ান [Permian- ২৯০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ২৪০ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত কাল]।

মেসোজোইক ইরাকে তিনটি পিরিওডে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. ট্রাইয়াসিক [Triassic- ব্যাপ্তিকাল, ২৪০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ২০৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত];
২. জুরাসিক [Jurassic- ব্যাপ্তিকাল, ২০৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ১৩৮ মিলিয়ন বছর পূর্ব];
৩. এবং ক্রিটেশিয়াস [Cretaceous- ব্যাপ্তিকাল ১৩৮ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত]।

সবশেষে সিনোজোইক ইরাকে দু'টি পিরিওডে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো:

১. টেরটিয়ারি [Tertiary - ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ১.৬ মিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত];

এবং ২. কুয়াটারনারি [Quarternary- ১.৬ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত]।

প্রতিটি পিরিওডকে আবার একাধিক ইপোকে বিভক্ত করা হয়েছে। আমরা এখানে শেষোক্ত পিরিওড তথা কুয়াটারনারি পিরিওডের ইপোকগুলো উল্লেখ করবো। এই পিরিওডে আছে ২টি ইপোক:

১. প্লাইস্টোসিন [Pleistocene] - এই ইপোকের ব্যাপ্তি ১.৬ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে ১০,০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত;

এবং ২. হলোসিন [Holocene] - এটার ব্যাপ্তি ১০ হাজার বছর পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

শেষোক্ত ইপোক শুরু হয় সর্বশেষ মহাদেশীয় বরফ যখন দ্রুত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা থেকে সরে পড়ে এবং পুরো পৃথিবীব্যাপী মানবজাতির বিস্তৃত হওয়া আরম্ভ হয়। এই ইপোকের মধ্যেই সাগর লেবেলে পানি বেড়ে যায় এবং আবহাওয়ার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

জীবের মধ্যে সময়

সময়ের উপর আমাদের এই সংক্ষিপ্ত তথ্যানুসন্ধানের ইতি টানার পূর্বে মানুষসহ জীবজন্তুর মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কিরূপ তা একটু তলিয়ে দেখার প্রয়াস পাচ্ছি। বায়োলজিক্যাল ঘড়ির ফলে আমাদের দেহের সেলগুলোয় পরিবর্তন আসে। এই ঘড়ির প্রতিক্রিয়া হেতু আমরা বৃদ্ধ বয়সে পতিত হই। এছাড়া ঘুমের অভ্যাসে পরিবর্তন আসা এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনে দেহের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি ঐ জীব-ঘড়ির ফলেই হয়ে থাকে। জীব-ঘড়ি মূলত উদ্ভিদজগৎসহ পুরো প্রাণীজগতে বিদ্যমান আছে। সার্কেডিয়ান রিদম [Circadian Rhythm] বা দৈনিক নিয়মিত ঘটনাপ্রবাহ থেকেই এই ঘড়ির অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে। পূর্বদিকে সূর্য উদিত হলো কি না তা জানা থাকলেও আমাদের মন ও তন জানতে পারে ভোর হয়ে গেছে। এতে

এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের ভেতরে কোনো ধরনের সময় নির্ধারক ‘টাইমার’ [timer] যন্ত্র আছে যার প্রতিক্রিয়া হেতু আমরা অনেককিছু জানতে পারি।

ধারণা করা হয় বায়োলজিক্যাল ঘড়ি আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে বিদ্যমান। কেউ কেউ এটাও বলছেন যে, কোষ বা সেলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘড়ি আছে। আর অধিকাংশ জীব-জন্তুর মস্তিষ্কে একটি ‘মাস্টার ক্লক’ [master clock] কাজ করে বলে প্রমাণ মিলেছে। এই ঘড়ি থেকে দেহের প্রত্যন্ত অংশে সময়সংক্রান্ত রসায়নিক সিগনাল প্রেরিত হয়। মস্তিষ্ক থেকে সময়ক্রিয়া সংক্রান্ত একটি হরমোন [Hormone] নির্গত হয় এবং তা প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্যে সঠিক স্থানে গিয়ে পৌঁছে। মানুষের মগজে ‘হাইপোথালামাস’ [Hypothalamus] নামক একটি অংশ আছে যেখানে বিজ্ঞানীদের ধারণা ঐ ঘড়িটির অবস্থান। এই অংশ থেকে আমাদের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনক্ষুধা ইত্যাদির অনুভূতি জন্ম নেয়।

বায়োলজিক্যাল ঘড়ি মূলত একগুচ্ছ নার্ভ কোষের সমষ্টি যার নামকরণ করা হয়েছে “সুপ্রাকায়াজমেটিক নিউক্লিয়াস” [Suprachiasmatic Nucleus]। মেলাটোনিন [Melatonin] নামক একটি হরমোন [hormone] আছে। এটি পিনিয়েল গ্ল্যান্ড [Pineal Gland] নামক একটি অরগ্যান তৈরী করে। এই হরমোনই আমাদের সার্কেডিয়ান রিদম বা দৈনিক নিয়মানুবর্তিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অবশ্য এই বায়োলজিক্যাল ঘড়ি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কার্যাদিকে আমরা ইচ্ছা ক্ষমতাবলে ‘অভাররাইড’ [Override] বা বদলে দিতে সক্ষম। তাই কেউ যদি ইচ্ছা করে সারারাত্র সজাগ থাকবে, তাহলে সে অবশ্যই পারবে। মেলোটনিন হরমোনকে ড্রাগ বা ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়- ফলে সহজেই ঘুম আসে। বায়োলজিক্যাল ঘড়ি সম্পর্কে এখনও আমাদের জ্ঞান সীমিত। তবে এই ঘড়ির অস্তিত্ব একটি রহস্যময় ও চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। এই ঘড়ির উপর গভীর গবেষণা দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হতে পারে এবং বিশেষ করে ‘সময়’ নামক অত্যাশ্চর্য একটি প্রদত্ত উপাদান সম্পর্কে আমরা আরো জ্ঞানবান হতে পারি।

এতোক্ষণ সময় নামক সদাক্রিয়াশীল উপাদানের সৃষ্টিতত্ত্ব ও আমাদের ‘লক্যাল কাল’ [Local Time] মাপার বিভিন্ন উপায়-স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি নিয়ে

আলোচনা হয়েছে। এবার সময়ের ক্রিয়া সেই সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে বস্তুজগতকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিবর্তন করছে সেদিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এটা করা হয়- তার নাম হলো “কজমোলজি” [Cosmology]।

বাংলায় কজমোলজিকে ‘সৃষ্টি ও বিবর্তনতত্ত্ব’ বলা যায়। অনেকে হয়তো ‘বিবর্তন’ শব্দটির প্রয়োগ হেতু চার্লস ডারউইনের বিতর্কিত ‘বিবর্তনবাদ’-এর গন্ধ এখানে পেয়ে থাকবেন। বাস্তবে এরূপ কিছু নয়- এখানে বিবর্তন বলতে শুধুমাত্র ‘বস্তুজগতের’ বিবর্তন উদ্দেশ্য। বস্তুজগতের মধ্যে বিবর্তন, পরিবর্তন, পরিমার্জন, রদবদল একটি সার্বজনীন ব্যাপার। এসব ব্যাপার আমাদের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে। এই বিবর্তনকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আমাদের নিজের শরীরও মায়ের গর্ভে জন্মমুহূর্ত থেকে কবরে যাওয়া এবং এর পরও- বিবর্তনের মধ্যে নিমজ্জিত। চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ মূলতঃ প্রাণীজগতের বিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রজাতি থেকে প্রজাতির উদ্ভাবন আর বিশেষ করে মানবজাতির উৎপত্তি নিম্নজাতের ইতরপ্রাণী তথা ওরাংওটাং বা শিস্পাঞ্জি ইত্যাদি থেকে হয়েছে- এরূপ ব্যাপার-স্যাপার হলো ডারইউনিজমের বিষয়-বস্তু। আমি যেহেতু এক-প্রভুবিশ্বাসী আস্তিক তাই বিবর্তনবাদ আমার নিকট কখনো গ্রহণযোগ্য মতবাদ হতে পারে না। বাস্তবে এটাও যে বাতিল একটি ‘ধারণাভিত্তিক’ থিওরি মাত্র সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়েই এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে অপারগ। যা হোক এবার আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের দিকে আমাদেরকে মনোনিবেশ করা জরুরী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক কজমোলজি

মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনে সর্বদাই আরো বেশী জানার স্পৃহা জাগ্রত হয়- এটা মনুষ্য স্বভাব। আদি যুগ থেকেই বিজ্ঞানের মাধ্যমে অজানাকে জানার এক প্রবল ইচ্ছে মানবমনে সর্বদা ক্রিয়া করে আসছে। কোনো একটি ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়ে গেলেই থেমে যায় না, আরো বেশী জানার ইচ্ছা জাগে। তখন শুরু হয়, এই অপর কোনো ফ্রন্ট উন্মুক্ত করার প্রবণতা। আধুনিক যুগে যদি আমরা বিজ্ঞানের উন্নতি ও দিকনির্দেশনার উপর কিছুটা মনোযোগসহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে ব্যাপারটি আমাদের সামনে ধরা পড়বে অনায়াসেই।

কজমোলজি এবং এ্যাস্ট্রফিজিক্স [Cosmology and Astrophysics]- বিজ্ঞানের এই উভয় শাখা মূলত, মূল শাখা "ফিজিক্স" [Physics] এর উপশাখা মাত্র। কজমোলজির কাজ হলো পুরো মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের উপর পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক গবেষণা আর এ্যাস্ট্রফিজিক্স এই একই কাজে নিয়োজিত আছে, তবে তার মূল হলো গাণিতিক আইন-কানুন। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে উভয়টির উদ্দেশ্য একই এবং মৌলিকভাবে একটা আরেকটার উপর নির্ভরশীল। তবে ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, সর্বদাই এটি নতুন ফ্রন্টিয়ার বা দিগন্ত আবিষ্কার করে যাচ্ছে। গত হাজার বছরব্যাপী এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের স্কোপ ও ফোকাস একটা থেকে আরেকটার উপর নিবদ্ধ হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ১৮০০ ঈসায়ী থেকে ১৮৭০ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞান মূলত "বিদ্যুৎ ও চুম্বক" এবং "আলোকবিজ্ঞান" এই দু'টি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ ছিলো। পৃথিবীর সর্বত্র অধিকাংশ বিজ্ঞানীর গবেষণার ফিল্ড এই বিষয়গুলো ও তৎসাথে সম্পৃক্ত ব্যাপার-স্যাপার ছিলো। অর্থাৎ ফিজিক্স এই বিষয়গুলো নিয়েই বেশী মাথা ঘামিয়েছে। এরপর ১৯০০ থেকে ১৯৩০ ঈসায়ী সাল ছিলো 'এটম গবেষণার যুগ'। তারপর ফ্রন্টলাইন বদলে আরোও গভীরে চলে গেল- ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ ঈসায়ী সাল

"পারমাণবিক যুগ" হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এটমের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস নিয়ে গবেষণায় নিবদ্ধ হলেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলো মারণাস্ত্র- এটমিক, হাইড্রোজেন, নিউট্রন বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র।

এভাবে পদার্থবিদ্যার ফ্রন্টলাইন অগ্রসর হচ্ছিল আর বিজ্ঞানীরা পেছনে রেখে যাচ্ছিলেন বহুতরের ভিন্ন নতুন এবং আন্দোলিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও থিওরি এবং উৎপাদনমূখর ডিসিপ্লিন। এ থেকেই জন্ম নিলো পদার্থবিজ্ঞানের বেশ ক'টি গুরুত্ববহ উপশাখা। এগুলোর মধ্যে কণা পদার্থবিজ্ঞান [Particle Physics], পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান [Nuclear Physics], কজমোলজি [বিশ্বতত্ত্ব], প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান [Plasma Physics] এবং ঘনীভবন বস্তু পদার্থবিজ্ঞান [Condensed Matter Physics] এখানে উল্লেখযোগ্য।

কণা পদার্থবিজ্ঞান [পার্টিকল ফিজিক্স]

উপরে উল্লেখিত সবক'টি উপশাখার সঙ্গে কোনো না কোনভাবে এ প্রসঙ্গে আলোচ্য কজমোলজির সাথে সম্পৃক্ততা বিদ্যমান। তাই আমাদেরকে এই ক'টি উপশাখার স্বরূপ আরো একটু বুঝতে হবে। প্রথমতঃ ঈসায়ী ১৯৫০ সাল থেকে শুরু হয় কণা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা। এসময় 'কজমিক রে' [cosmic ray] বা মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। বাইর মহাকাশ থেকে দ্রুত বেগবান ও উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন এসব রশ্মি এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পতিত হয়। এই রশ্মিগুলোর উপর ব্যাপক গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীরা চাপ সৃষ্টি করলে সংশ্লিষ্ট সরকার [বিশেষকরে আমেরিকা ও ইউরোপীয় সরকারসমূহ] মোটা অঙ্কের টাকা গবেষণার জন্য যোগান দেন। এর ফলশ্রুতিতে ''Particle Accelerators' [বা কণা ত্বরণকরণযন্ত্র] এর জন্ম হয়। পরমাণু ফিজিক্সের উন্নয়নে এটা ছিলো একটি মাইলফলক। মাটির নীচে সৃষ্ট এসব যন্ত্রের উপনাম একদা ''Atom Smasher' [বা পরমাণু গুঁড়োকরণ যন্ত্র] ছিলো। আর সত্যি তা-ই। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে মৌলিক কণাকে উচ্চগতিশীল করা হয়ে থাকে। আমেরিকার ইলিনয় প্রদেশের শিকাগো শহরের ৪৮ কিমি পশ্চিমে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পার্টিকল এক্সেলেরেটর স্থাপিত হয়েছে। সেখানকার প্রখ্যাত ফার্মিল্যাবে 'টেবাট্রন' নামকরণে এই যন্ত্রটি

কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ওখানে পরমাণু, প্রটন ও এ্যন্টিপ্রটনের মধ্যে মোট ২ হাজার মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভল্ট এনার্জিসম্পন্ন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিজ্ঞানীরা এর ফলাফলের উপর গবেষণা করছেন। উল্লেখ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা এখানে এসে গবেষণায় যোগ দিয়ে থাকেন। অপরদিকে ইউরোপেও একটি শক্তিশালী পার্টিকল এক্সেলেরেটর নির্মিত হয়েছে। ইসিভুক্ত ১১টি দেশ একত্রে এই যন্ত্রটি সুইজারল্যান্ডে স্থাপন করেছে। রাজধানী জেনেভার দক্ষিণে মাটির নীচে ২৭ কিমি দৈর্ঘ্য বৃত্তাকার একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে এই যন্ত্রটি তৈরী করা হয়েছে। 'ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ' [সংক্ষেপে CERN] নামক এই ল্যাব ও আমেরিকার ফার্মিল্যাব মিলে 'হিগ্স পার্টিকল' [Higgs Particle] নামক একটি থিওরিটিক্যাল পার্টিকল বা কণার সন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন।

বিজ্ঞানীদের ধারণা উক্ত 'হিগ্স পার্টিকল' বা ফিল্ড হলো অন্যান্য মৌলিক কণার মধ্যে 'ওজন' [mass] সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই কণাটির ফলেই বস্তুর মধ্যে ভিন্নতার জন্ম নিয়েছে। যা হোক, আসল কথা হলো, বিজ্ঞানীরা একদিকে দিন দিন স্বভাবের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বস্তু বা কণা, পরমাণু ইত্যাদির উপর গবেষণা চালিয়ে লুকানো ও রহস্যময় প্রাকৃতিক অনেক তথ্যাদি আবিষ্কারে মত্ত হয়েছেন। অপরদিকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তম তারকাজগৎ তথা গ্যালাক্সির উপরও গবেষণা চালিয়ে জগতসৃষ্টির সূচনা থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রহস্যময় তথ্যাদি আবিষ্কার করে চমক লাগাচ্ছেন।[13]

কণাবিজ্ঞান ও কজমোলজি

আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব বা কজমোলজির মূলে আছে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক মতবাদ যেমন ক্যুয়ান্টাম থিওরি ও আপেক্ষিকতাবাদ এবং বুদ্ধিসম্পন্ন কল্পনা ও দর্শন। এই সবগুলোর ফলাফলই হলো আধুনিক কজমোলজিক্যাল থিওরিবলী। অতীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই শাখাটি পৃথিবী ও সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্বের উপর গবেষণার স্কোপ সীমিত রেখেছিল। আজ কিন্তু ভিন্ন।

---

13 এ কণাটি গত ৪ জুলাই ২০১২ সালে শেষপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখন পুরো মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের উপর ব্যাপক গবেষণা কজমোলজির আওতাভুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে আনবিক কণাবিজ্ঞান সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে। বিশ্বের সৃষ্টি-ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায় গবেষণা করে আমরা এখন অনেককিছু জানতে পেরেছি। কণাবিজ্ঞান ও কজমোলজি এখন একে অন্যের উপর নির্ভরশীল পদার্থবিজ্ঞানের দু'টি শাখা। এখন বিজ্ঞানীরা বলেন, সৃষ্টির পরমুহূর্তে যেসব পার্টিকল বা কণা আত্মপ্রকাশ করেছিল তার সবগুলো সম্পর্কেই ধারণা মিলেছে। আধুনিক পার্টিকল এক্সেলেরেটরে 'বিগ ব্যাং থিওরি' [Big Bang Theory] মুতাবিক কৃত্রিম বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অনেক তথ্যাদি জানা গেছে।

বস্তু ও অবস্তু

বিজ্ঞানীরা জানেন, মেটারের বিপরীত এ্যন্টিমেটার [Antimatter] আছে। এই বস্তু ও অবস্তু যখন একত্রিত হয় তখন এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে উভয়টি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ক্রিয়াকে বলে 'Total Annihilation' [পূর্ণবিলয়]। অবশ্য এই ক্রিয়ার ফল স্বরূপ যা থাকে তাহলো তেজষ্ক্রিয়া। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা জগতসৃষ্টির সূচনালগ্নে সমপরিমাণ বস্তু ও অবস্তুর জন্ম হয়েছিল। এ কথাটি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে সৃষ্টির শুরুতেই সবকিছু ধ্বংস বা অনস্তিত্বশীল হয়ে যাওয়ার কথা, থাকতো শুধু তেজষ্ক্রিয়া। কিন্তু তা-তো নয়। কেউ কেউ বলছেন বস্তু ও অবস্তু কোনো এক বা একাধিক কারণহেতু আলাদা হয়ে গিয়েছিল। যদি তা-ই হয় তাহলে আমরা শুধুমাত্র বস্তু অবলোকন করছি কেন? ওসব অবস্তু কোথায় গেল?

অবশ্য উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে থিওরি তৈরী করা হয়েছে। গেল শতকের শেষে ইলিনয়ের ফার্মিল্যাবে একটি পরীক্ষা করা হয়। এতে বুঝা গেছে সৃষ্টিলগ্নে মেটার-এ্যন্টিমেটারের মধ্যে সামান্যতম অসামঞ্জস্য ছিলো। এরূপ হওয়ার কথা নয় কিন্তু তা-ই ছিলো। এর ফলেই মহাবিস্ফোরণ শেষে বস্তু-অবস্তুর মধ্যে টোটেল এ্যনাইহিলেশন হয়নি। পর্যাপ্ত পরিমাণ মেটার অবশিষ্ট থেকে যায়, যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গ্যালাক্সি, তারা, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তু।

কৃষ্ণ বস্তু সমস্যা

বিশ্বের সর্বত্র এখনও অনেক বস্তু আছে যা আমাদের বর্তমান যন্ত্রাদি দ্বারা আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। এসব বস্তুকে কৃষ্ণ বস্তু বা Dark Matter বলে। এগুলোর অস্তিত্ব বিরাট বিরাট তারাজগত তথা গ্যালাক্সিগুলো পরীক্ষা করে জানা গেছে। এসব গ্যালাক্সির চতুর্দিকে মোটা শক্তির মহাকার্ষিক ফিল্ড বিদ্যমান। এই ফিল্ডের কারণ দৃশ্যমান কোনো বস্তু নয়- সুতরাং অদৃশ্য কোনো বস্তু হবে। এই অদৃশ্য বস্তকেই 'ডার্ক মেটার' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যকথায় এসব বস্তু আলো দান করে
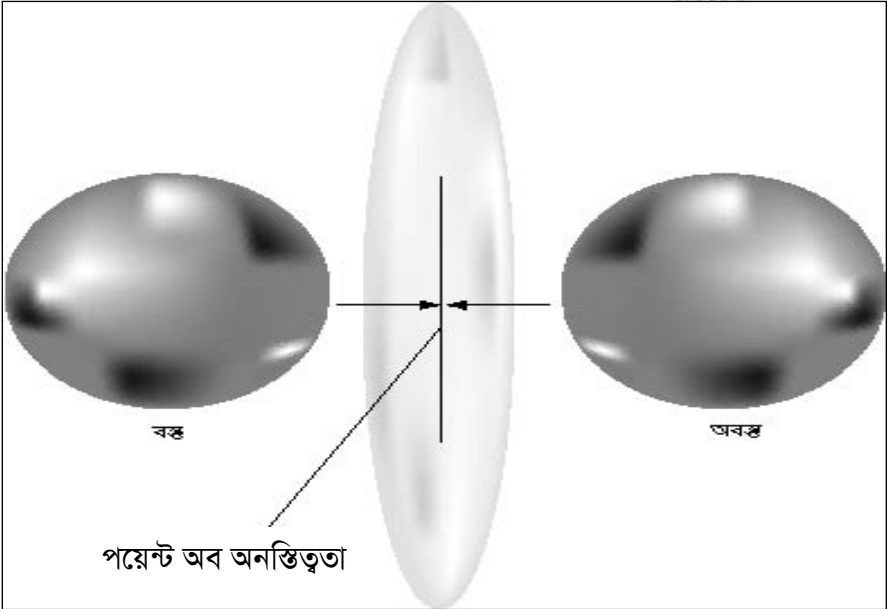
না- কিংবা অন্য কোনো আলো সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে আলোকরশ্মি পেয়ে তা প্রতিবিম্ব হচ্ছে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা পুরো বিশ্বব্যাপী এরূপ কৃষ্ণ বস্তু বিদ্যমান যাদের মোট পরিমাণ বিরাট অঙ্কের হবে।[14] এছাড়া এটাও ধারণা করা হচ্ছে এসব কৃষ্ণ বস্তুর

---

[14] বিজ্ঞানীদের মতে কৃষ্ণ বস্তুর মাত্রা বিশ্বের মোট বস্তুর অন্তত ৮০% থাকার কথা। এগুলো যন্ত্রাদি দ্বারা সনাক্তকরণ খুব কঠিন হলেও অনেকের মতে মহাকাশে আবিষ্কৃত বাদামী বামন তারা, সাদা বামন তারা ও নিউট্রন তারা হয়তো এই কৃষ্ণ বস্তুর দ্বারা তৈরি হতে পারে।

স্বরূপ সাধারণ বস্তুর মতো নয়। এগুলো আমাদের নিকট এখনও অদৃশ্য থাকার এটাও একটি কারণ হতে পারে। এসব ভেবে বিজ্ঞানীরা এখন হন্যে হয়ে নতুন পার্টিকেলের সন্ধানে নিয়োজিত হয়েছেন ফার্মিল্যাব ও ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টারে।

উল্লেখ্য, কৃষ্ণ বস্তুর বাস্তবতার উপর অনেকটা নির্ভর করছে আজকের জনপ্রিয় বিশ্বতত্ত্ব "দ্যা বিগ ব্যাং থিওরি" এবং তা থেকে নির্ণিত মহাবিশ্বের সম্ভাব্য শেষ পরিণতি। এতে বলা হয়েছে, যদি এই মহাবিশ্বে পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্তু বা মেটার থেকে থাকে তাহলে সেই প্রথম বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যকার গতি একদিন থেমে যাবে বস্তুর সমষ্টিগত মহাকর্ষের ফলে। এরপর সবগুলো বস্তু [অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহ, তারা, তারাজগৎ, গ্যালাক্সি ইত্যাদি সবকিছু] পুনরায় মহাকর্ষের টানে বিশ্বের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়ে সুদূর ভবিষ্যতে আরেক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে অস্তিত্বহীন তথা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই Closed Universe বা ধ্বংসশীল বিশ্বের থিওরির উপর অনেকেই আস্থাশীল। কিন্তু ডার্ক মেটার সমস্যার সমাধান ছাড়া হয়তো সবাইকে বাধ্য হয়ে Open Universe [চিরন্তন?] মডেলকে মেনে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে, বিশ্বের মধ্যে মোট বস্তুর পরিমাণ পর্যাপ্ত না হলে তা কোনদিন আর বিপরীতমুখী গতি ধারণ করবে না। অনন্তকাল পুরো মহাবিশ্ব চতুর্দিকে বিস্তৃত হতে থাকবে। কজমোলজির এই মৌলিক প্রশ্নের জবাব কোন্ দিকে যাবে তা একমাত্র সময়ই বলে দিতে পারে।

আমাদের ধারণা, প্রথমোক্ত পরিণতিই সর্বাধিক সম্ভাব্য। মহাবিশ্ব যে একদা ধ্বংস হবে, তার নিশ্চয়তা ধর্মবিশ্বাসের সাথেও সম্পৃক্ত। তবে এই 'ধ্বংসলীলা' সংগঠনের জন্য সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে, সেটা কিন্তু নয়; কারণ, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ক'টি মৌলিক ফিজিক্যাল আইন বা 'Natural Law' -এর মধ্যে কোনো ধরনের হেরফের বা ব্যতিক্রম ঘটলেই সমগ্র মহাবিশ্ব ক্ষণকালের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। চিন্তা করে দেখুন, মহাকর্ষ ছাড়া জগতের পরিণতি কী হতে পারে? এর সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছে করলে ক্ষণকালের মধ্যে এই শক্তিটি উঠিয়ে নিতে পারেন। এর ফলে সমগ্র বস্তুজগৎ তুলার মতো উড়ে যাবে ও সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে অস্তিত্বহীন হবে।

আরো একাধিক উপায়েও এই শেষ পরিণতি তথা 'জগতের ধ্বংসসাধন' সম্ভব। আমরা একটু পরই 'বিজ্ঞানভিত্তিক' এরূপ চারটি পরিণতির উপর বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরবো। তবে এ মুহূর্তে সকল বস্তুর অস্তিত্ব নিশ্চিতকরণের মৌলিক উপাদান সেই 'Atom' বা পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ সদা-ক্রিয়াশীল কিছু Fundamental Forces এবং মৌলশক্তি-সমূহের উপর সামান্য আলোকপাত করা যুক্তিযুক্ত হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ে হয়েছে। এখানে মহাকর্ষ ছাড়াও আরো যে তিনটি শক্তি পরমাণুকে স্থিতিশীল ও অস্তিত্বশীল রেখেছে তা প্রসঙ্গক্রমে বলার কারণ হলো, এটা পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া যে- এসব শক্তির মধ্যে সামান্যতম হেরফের ঘটলেই পুরো পরমাণুটি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে- তথা ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য হবে। আর এটমের ধ্বংস মানেই জগতের সাঙ্গলীলা।

বিজ্ঞান আমাদেরকে বলছে, চার মৌলিক শক্তির মাধ্যমে প্রতিটি পরমাণু স্থিতিশীলতা বজায় রাখছে। উপরে এর প্রথমটির কথা উল্লেখ করেছি- যার নাম Gravitation বা মহাকর্ষ। বাস্তবে এই শক্তিটি পরমাণু থেকে বস্তু-গ্রহ-উপগ্রহ, সৌরজগৎ-তারকাজগৎ, গ্যালাক্সি তথা পুরো মহাবিশ্বব্যাপী সক্রিয়। এটমের ক্ষেত্রে এর মাত্রা অতি অল্প। কিন্তু আয়তন ও ওজনে 'বড় বস্তু' যেমন সূর্য এবং অনেক অনেক সূর্যের সমন্বয়ে গঠিত গ্যালাক্সি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই শক্তিটির প্রভাব বিরাট। বাস্তবে এই শক্তির ফলেই সবকিছু একে অন্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী ঘূর্ণমান-গতিশীল আছে।

এটমের কেন্দ্র ও তার চতুর্দিকে ঘূর্ণমান Electron Cloud বা ইলেকট্রন মেঘমালাকে অপর যে তিনটি শক্তি নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতি প্রদান করে রেখেছে, সেগুলো সম্পর্কে একটু তথ্য-প্রদান এখানে জরুরী মনে করছি। তবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আগেই বলেছি, অষ্টম অধ্যায়ে এসেছে। এই তিনটি শক্তির মধ্যে প্রথমটি হলো Electromagnetic Force বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি। এই শক্তির ফলেই বিপরীতধর্মী ইলেকট্রিক চার্জ একটা আরেকটার প্রতি আকর্ষিত হয়। সুতরাং এটমের নিউক্লিয়াসে স্থাপিত পজিটিভ চার্জ-সম্পন্ন প্রটনের প্রতি আকর্ষিত হয় নেগিটিভ

চার্জ-সম্পন্ন ঘূর্ণমান ইলেকট্রন। যদি তা না হতো তাহলে ইলেকট্রনগুলো উড়ে চলে যেতো। পরমাণু হয়ে উঠতো অস্থিতিশীল। এখন এই শক্তি যদি মহাবিশ্বের প্রতিপালক 'উঠিয়ে নেন' তাহলে উপায় কি হবে? ভাবার ব্যাপার নয় কি?

দ্বিতীয়টি হলো, Strong Nuclear Force - বা সবল আনবিক শক্তি। এটমের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে প্রটন ও নিউট্রন নামক দু'টি কণা আছে। এ দু'টোকে একত্রে জড়িত রাখার দায়িত্ব পালন করে এই সবল আনবিক শক্তি। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও এই শক্তিটির অনুপস্থিতি হবে এটমের জন্য বিরাট বিপর্যয়।

তৃতীয় যে শক্তিটি পরমাণুকে স্থিতিশীল রাখতে কাজে নিয়োজিত আছে তাকে বলে Weak Nuclear Force - বা দুর্বল আনবিক শক্তি। শক্তিটি 'দুর্বল' হলেও এর ক্রিয়া উপরোক্ত দু'টির তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপ্ত। উপরের প্রথমটি তথা ইলেকট্রম্যাগনেটিক শক্তি শুধুমাত্র ইলেকট্রন ও প্রটনে তার শক্তি প্রয়োগ করতে সক্ষম এবং স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের ক্রিয়া এটমের প্রটন ও নিউট্রনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু দুর্বল শক্তি এটমের যাবতীয় কণার উপর ক্রিয়াশীল। এই শক্তি প্রয়োজনে বিভিন্ন কণার ধরন বদলে দিতে সক্ষম। সুতরাং এটা না থাকলে এটমে স্থিতিশীলতা বজায় সম্ভব হতো না। ভেবে দেখুন, এই শক্তিটির স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মহান আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছে করেন 'তুলে নিতে', তাহলে পরমাণু তথা এরই সমন্বয়ে গঠিত পুরো মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে কতটুকু সময় লাগবে?

মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ : চার সম্ভাব্য পরিণতি

আমরা এ পর্যন্ত কজমোলজির উপর আলোচনা করে যা বুঝতে পেরেছি তার সারমর্ম হলো: পদার্থবিজ্ঞানের এই উপশাখাটি পুরো মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত আছে। আমরা এটাও বুঝতে পেরেছি যে, আধুনিক যুগে মহাবিস্ফোরণ থিওরি [ইংরেজীতে The Big Bang Theory] নামক একটি মতবাদ বিজ্ঞানমহলে জনপ্রিয় হয়েছে। অধিকাংশ এ্যাস্ট্রফিজিসিস্ট মনে করেন, এই থিওরিই বিশ্বতত্ত্বের সঠিক মতবাদ। এখন আমরা থিওরিটির উপর আরোও কিছু তথ্যাদি তুলে ধরছি- বিশেষ করে মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি কী হবে তা তলিয়ে দেখা একান্ত জরুরী। বিগ ব্যাং থিওরি দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো এক কারণবশত এ মহাবিশ্ব সুদূর অতীতে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে গ্যালাক্সি, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, সৌরমণ্ডল ইত্যাদির জন্ম দিয়েছে।

বিবর্তনবাদীরা এই ক্রম-সৃষ্টিকর্ম, মৌলিক ফিজিক্যাল আইন-কানুন, গ্যালাক্সি গঠন, তারকা, সৌরজগৎ গঠন এবং সঠিক স্থানে সঠিকভাবে পৃথিবীর মতো মানুষের বাসোপযোগী গ্রহের আবির্ভাব- এই সবকিছুই একগুচ্ছ সুবিধাজনক 'চান্স' বা দুর্ঘটনার ফলাফল বলে প্রচার করে থাকেন। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা যুক্তিসিদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। আর এ জন্যই ধর্মবেত্তাদের ছাড়াও অধিকাংশ বিজ্ঞানীও এর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন। বিবর্তনবাদের উপর অতিরিক্ত কিছু বলার দরকার নেই- কারণ, এটা কোনো 'বৈজ্ঞানিক সত্য' বলে আমি মনে করি না। এ মুহূর্তে বিজ্ঞান বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা, কিছুটা পর্যবেক্ষণ, কিছুটা দর্শন আর অনেকটা গাণিতিক গবেষণা দ্বারা কিসব ফলাফল ও তথ্যাদি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তা-ই হবে আমাদের চিন্তা-আলোচনার ব্যাপ্তি।

সৃষ্টির সূচনা

যে কোনো চেতনাশীল মানুষ অবশ্যই এটা ধারণা করবেন যে, সুদূর অতীতে কোনো এক লগ্নে এই মহাবিশ্ব যেভাবেই হোক জন্ম নিয়েছিল। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই আমরা কথাটি বলবো। আমাদের চোখের সামনে আমরা অসংখ্যবার

জন্ম-মৃত্যুর বাস্তব স্বরূপ অবলোকন করছি। এ থেকেই আমাদের ধারণা জন্মে যে বস্তুজগতেরও জন্ম একদিন হয়েছিল এবং এর মৃত্যুও একদা ঘটবে। যার জন্ম হয় তার মৃত্যুও ঘটে- এটাই স্বাভাবিক। তবে বিজ্ঞান যেহেতু অতিমাত্রায় তথ্যের উপর নির্ভরশীল একটি ডিসিপ্লিন তাই এই ধারণাভিত্তিক কিংবা বিশুদ্ধ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন দ্বারা সুচিন্তিত কোনো থিওরিকে বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করতে পারে না। বিজ্ঞান মূলত প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান- যার মূলে কাজ করে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গাণিতিক গবেষণা। এ কারণেই মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের উপর গবেষণা দর্শন-ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে এসেছে বিজ্ঞানের মাধ্যমে এবং বিজ্ঞানীরা জন্ম দিয়েছেন পর্যবেক্ষণ ও গণিতভিত্তিক একটি মডেল। হ্যাঁ, এই মডেলটি সৃষ্টিতত্ত্বের চূড়ান্ত থিওরি তা কিন্তু বলা যাবে না। এটিও যে ভবিষ্যতে নতুন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে পরিবর্তিত হতে পারে তা নিশ্চিত। এটুকু বলার পর এবার আমাদেরকে বর্তমানে জনপ্রিয় সেই 'বিগ ব্যাং থিওরি' নিয়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করা যায়।

আজ থেকে চৌদ্দ বিলিয়ন বছর পূর্বের কথা [এক বিলিয়ন সমান ১ হাজার মিলিয়ন]। সময় বা টাইম তখন শূন্যের অতি নিকটবর্তী- তবে শূন্যতে নয়। শূন্য সময়ে কি ঘটেছে তা কেউ জানে না। বিশ্বের সৃষ্টিবৃত্তান্ত জার্মান-জন্মিত আমেরিকান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়েকটি সমীকরণের উপর নির্ভরশীল। এগুলোকে বলে "ফিল্ড ইক্যুয়েশন্স" [Field Equations]। আমরা বিশ্বতাত্ত্বিক ফিল্ড সমীকরণে সময়কে শূন্যের কোঠায় নিয়ে যেতে অপারগ- কারণ তখন পুরো সমীকরণ কলাপস্ বা অকেজো হয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ওসব ফিল্ড সমীকরণে ১০$^{-৪৩}$ সেকেন্ড - এই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। এই সংখ্যাটি এতো ছোট্ট যে আমরা সাধারণ্যের ক্ষেত্রে একে শূন্যই বলতে পারি। তবে বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষকরে এ্যাস্ট্রফিজিসিস্টদের [Astro-physicist] নিকট সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে তা বেশ বড়ো। বাস্তবে এই সংখ্যাটি হলো: ০.০০১০।

যা হোক বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন সৃষ্টি শুরুর এই ক্ষুদ্রতম সময় পার হওয়ার পর বেশ কিছু বস্তু অস্তিত্বশীল হয়ে যায়। এরপর এক অত্যাশ্চর্য ক্ষণকাল

অতিবাহিত হয় যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ‘‘Inflation epoch’ বা স্ফীতিকাল বলে।

স্ফীতিকাল থিওরি

জগতসৃষ্টির প্রথম সেকেন্ডের একটি ক্ষুদ্রাংশের মধ্যেই এই অত্যাশ্চর্য স্ফীতিকাল স্থায়ী ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে জগতের আয়তন আগের তুলনায় হঠাৎ ১০৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়। প্রথম সেকেন্ডের মধ্যে এভাবে বিরাট আয়তনে উপনিত হয়ে সমগ্র বিশ্ব একটি স্থিতিশীল রেইটে বর্ধিত হতে থাকে যা আজো বিদ্যমান আছে। ইনফ্লেশনারী থিওরির প্রবর্তকরা আমদেরকে অবগত করছেন, যেটুকু ক্ষণকালের মধ্যে এই বিরাট ঘটনা ঘটেছিল, তার পরিমাণ ছিল সময় সৃষ্টির পর $১০^{-৩৫}$ সেকেন্ড থেকে $১০^{-৩২}$ সেকেন্ডের মধ্যে! বাস্তবে বলা যায় এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সাথে সাথেই তা বিরাট আয়তনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কোন্ শক্তি এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিলো? ভাবার ব্যাপার নয় কি?

আমরা সংক্ষেপে স্ফীতিকাল থিওরিটা কি তা বলেছি। এই থিওরি বিশ্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলে, এটা কোনো একদিন মহাকর্ষের টানে ভেতরের দিকে ছুটে চলবে। অর্থাৎ তখন এটা দ্রুত ছোট হতে থাকবে এবং একদিন বিরাট আরেক বিস্ফোরণের মাধ্যমে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এই থিওরির সত্যতা নির্ভর করে বিশ্বটা ‘ক্লোজড ইউনিভার্স’ [Closed Universe] হওয়ার উপর। যদি ভবিষ্যতে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মহাবিশ্ব আসলে ক্লোজড নয়, তাহলে এই থিওরি গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।

সৃষ্টিতত্ত্বের উপর এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা-ই আমাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। আজ থেকে সুদূর অতীতে সৃষ্ট এই মহাবিশ্ব মূলত কোনো এক কারণে অকল্পনীয় এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এরপর উপরোক্ত ‘ইনফ্লেশনারী থিওরি’ মুতাবিক তা সেকেন্ডের এক ক্ষুদ্রাংশ সময়ের মধ্যে বিরাট আয়তনে রূপান্তরিত হয়। এরপর মহাবিশ্বে উপগ্রহ, গ্রহ, সৌরমণ্ডল, তারা, তারা ক্লাস্টার, তারাজগৎ, গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সি গ্রুপ ইত্যাদির জন্ম হয়। সৃষ্টির শুরু থেকে ঐ

বিস্ফোরণের ফলে পুরো মহাবিশ্ব চতুর্দিকে বর্ধিত হতে থাকে যা আজো অব্যাহত আছে। এই হলো সর্বাধিক সংক্ষেপে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা। এখন প্রশ্ন হলো এর পরিণতি কোন্ দিকে যাচ্ছে?

বিগ ব্যাং থিওরি বলে, এই মহাবিশ্ব আজ থেকে ১৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই থেকেই তা চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ চারটি সম্ভাব্য পরিণতির যে কোনো একটি হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস রাখেন। এগুলো হচ্ছে:

১. যদি বিশ্বটি ক্লোজড ইউনিভার্স [বন্ধ-বিশ্ব মডেল] হয়, তাহলে সুদূর ভবিষ্যতে একদা এর বর্ধিত হওয়ার গতি স্তিমিত হয়ে মহাকর্ষের টানে উল্টোদিকে গতিশীল হয়ে, ছোট্ট হতে থাকবে ও আরেকটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে।[15]

২. যদি মহাবিশ্ব অপেন ইউনিভার্স [উন্মুক্ত-বিশ্ব মডেল] হয়ে থাকে তাহলে তা চিরকালের জন্য বর্ধিত হতে থাকবে।

৩. যদি আমরা ফ্ল্যাট ইউনিভার্সের [সমতল-বিশ্ব মডেল] বাসিন্দা হয়ে থাকি তাহলে এটা কোনদিনই নিজস্ব মহাকর্ষের প্রভাবে পুনরায় ধ্বংস হবে না। একদিন বর্ধিত হওয়া থেকে মুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট এক আয়তনে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বজায় থাকলেও সার্বিক আয়তনে আর পরিবর্তন আসবে না। একটা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করবে চিরকাল।

৪. চতুর্থ অবস্থার সৃষ্টি হবে যদি এ মহাবিশ্ব চিরত্বরণশীল হয়ে থাকে অর্থাৎ তা যদি এক্সেলেরেটিং ইউনিভার্স [ত্বারণিক বিস্তারণ বিশ্ব মডেল] হয়। এক্ষেত্রে জগতের

[15] এভাবে মহাবিশ্বের ধ্বংসের পর কী হবে? অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, পুনরায় আরেক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের জন্ম হবে। এভাবে বার বার জন্ম-মৃত্যু হতে থাকবে অনন্ত কালব্যাপী। এই ধারণাকে কেউ কেউ ‘‘The Big Bounch Therory’ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

আয়তন বৃদ্ধি পেতেই থাকবে এবং সুদূর ভবিষ্যতে ত্বরণ গতি বেড়ে পরমাণুকে পর্যন্ত ভেঙ্গে দেবে।
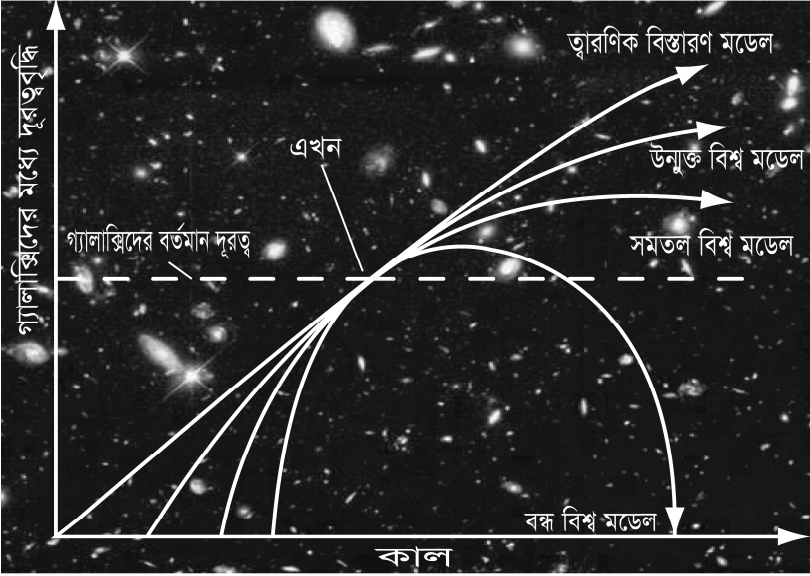
বিজ্ঞানীরা উপরোক্ত চার অবস্থার কোনটি সঠিক হবে তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না, যদিও বর্তমানে অধিকাংশের মতে প্রথমটি তথা ক্লোজড ইউনিভার্স হয়তো বাস্তবতার কাছাকাছি হবে। অবশ্য কেউ কেউ এখন এটাও প্রশ্ন করছেন, বর্তমানে সার্বজনীন 'বিগ ব্যাং থিওরি' মূলত সঠিক কি না তা-ও অনিশ্চিত। ভবিষ্যতে অন্য আরেকটি থিওরি এসে একে ভুল প্রমাণ করতে পারে- এটা অসম্ভব মোটেই নয়।

এ অধ্যায়ের উপসংহারে দু'চারটে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের উপর বিজ্ঞানের এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থিওরিবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানেই শেষ। তবে জানা থাকা প্রয়োজন যে, সৃষ্টিতত্ত্বের উপর বাস্তবে গভীর গবেষণার ইতিহাস এই ... মাত্র শত বছরের পুরাতন। আজ থেকে সুদূর ভবিষ্যতে

এই গবেষণা ও এ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি কী পরিমাণ হবে এবং কোন্ দিকে যাবে তা নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায় নেই।

উপরোক্ত কথাটি অনুধাবনে বৈজ্ঞানিক 'fact' [তথ্য], 'hypothesis' [সুচিন্তিত ধারণা], 'theory' [মতবাদ] ও 'law' [আইন]- এ চারটে শব্দের ভাব ও অর্থ এবং একে অন্যের মধ্যে পার্থক্য কী তা আমাদেরকে জানতে হবে।

তথ্য [fact]: আমাদের চতুর্দিকের জগত সম্পর্কে সম্যক পর্যবেক্ষণ। দৃষ্টান্ত: "গাছ থেকে পাকা আম মাটিতে পড়ে।" এটা পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য। আমরা এখনও জানি না, আম পড়ার কারণ কী হতে পারে?

সুচিন্তিত ধারণা [hypothesis]: যে কোনো প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম কোনো ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে প্রাথমিক ধারণামূলক উপস্থাপন। এটা মূলত তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য আবিষ্কারের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র [a starting point]। দৃষ্টান্ত: "গাছ থেকে আম পড়ে কোনো টান-শক্তির কারণে।" এখানে কারণটি 'টান-শক্তি' তা কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। সুচিন্তিত ধারণা হলো নিশ্চয় কোনো টান-শক্তি কাজ করতে পারে।

মতবাদ [theory]: একটি উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত প্রমাণ উপস্থাপন। এর পেছনে থাকতে হবে মতবাদ সৃষ্টির প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর [scientific method] যথাযথ অনুসরণ। এর অর্থ হলো, মতবাদের সাথে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষণ দ্বারা প্রমাণসাপেক্ষ করা চাই। দৃষ্টান্ত: "আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি।" মহাকর্ষ হেতু আমটি মাটিতে পড়ার কারণ এ থিওরি দ্বারা বুঝানো সম্ভব।

আইন [law]: এটা হচ্ছে কোনো প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ঘটনার একটি বর্ণনা বা ব্যাখ্যা- যার মূলে আছে বার বার পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও গাণিতিক সমর্থন। কিছু ঘটছে ও কোন্ কারণে ঘটছে তার প্রমাণ হচ্ছে আইন। তবে 'কেনো' যেভাবে ঘটছে

সেভাবে ঘটে- তা কিন্তু নয়। দৃষ্টান্ত: নিউটনের মহাকার্ষিক আইন। এটা দ্বারা মাটির উপর আমটি পড়ার গতি ও সময় নির্ধারণ করা যায়।

উপরে সংজ্ঞায়িত বৈজ্ঞানিক চারটে পদ্ধতির আলোকে 'ঈমানদার' হিসেবে আমরা কী ভাবতে পারি? এ প্রশ্নের জবাব আপাতদৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও বাস্তবে তা নয়।
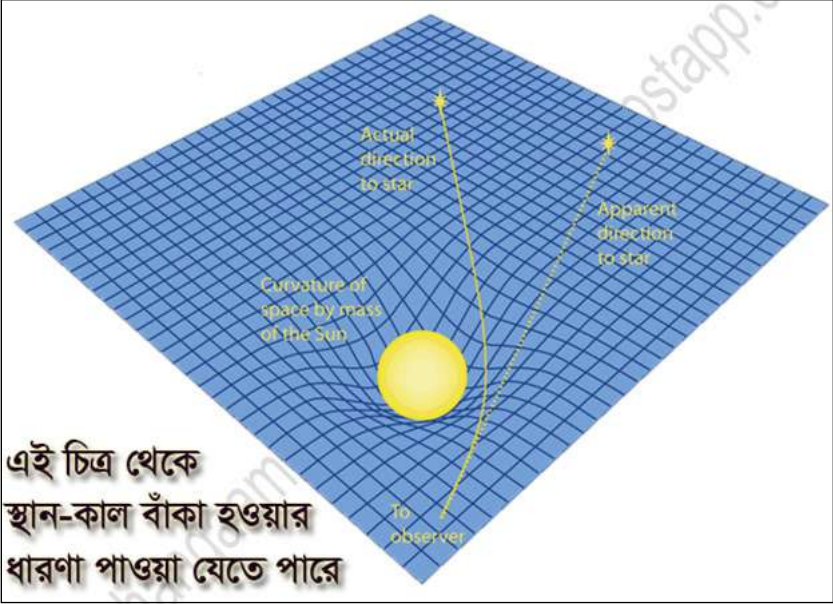
স্বভাবের মৌলিক শক্তি 'মহাকর্ষ' দ্বারা আমরা চারটি সংজ্ঞায়ই দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। চারটি ক্ষেত্রে চার ধরনের ব্যাখ্যা এসেছে। এর মধ্যে একমাত্র আইনস্টাইনের 'থিওরি' দ্বারা মহাকর্ষের আসল রূপ কী, তা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সবগুলোর মতো এখানেও সীমাবদ্ধতা আছে। আইনস্টাইন যা বলেছেন তাহলো, মহাকর্ষ মূলত বস্তুর চতুর্দিকে সৃষ্ট একটি বক্র স্থান-কাল। অর্থাৎ মহাকর্ষের কারণে ভারী বস্তু যেমন, আমাদের সূর্য- তার চতুর্দিকে একটি বাঁকানো স্থান-কাল তৈরি করে। সুতরাং এই বক্র স্থান-কালের মধ্যে গ্রহগুলো সূর্যের চতুর্দিকে পড়ন্তাবস্থায়

থেকে ঘুরতে থাকে। তিনি এটাও বলেছেন, বক্র স্থান-কালের ফলে আলোকরশ্মি পর্যন্ত বাঁকা পথে চলে। আরো অদ্ভুত কথা হলো, উচ্চশক্তিসম্পন্ন মহাকার্ষিক স্থান-কাল বক্রতার কারণে সেখানে সময়ের গতিও কম হবে! আইনস্টাইনের থিওরির এসব 'ধারণা' কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হয়েছে। তবে, যা ভাবার তাহলো- মহাকর্ষ স্থান-কালকে কেনো বক্র করে? এ প্রশ্নের জবাব আইনস্টাইনও জানেন না! বক্র করে বলে তিনি প্রমাণসাপেক্ষে থিওরি উপস্থাপন করেছেন মাত্র। মহাকর্ষসহ মৌলিক চার শক্তি কেনো জগতসৃষ্টির সূচনায় আত্মপ্রকাশ করলো তাদের সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও আইন-কানুন নিয়ে- এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আর এখানেই 'ঈমান বিল গায়েব' এসে আমাদের হতাশার মধ্যে স্বস্তি দান করে।

তৃতীয় অধ্যায়
সংখ্যা কী এবং কেন?

সংখ্যার কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে আমাদের এই অধ্যায়ের গবেষণা শুরু করা যাক। ইংরেজী বিভিন্ন ইনসাইক্লোপিডার মধ্যে ব্রিটেনিকা একটি প্রসিদ্ধ জ্ঞানকোষ। প্রথমেই আমরা সেখানে দেওয়া সংখ্যার সংজ্ঞা তুলে ধরছি।

"Any of various sets of symbols and the rules for using them to express quantities as the basis for counting, comparing amounts, performing calculations, determining order, making measurements, representing value, setting limits, abstracting quantities, coding information, and transmitting data."

ভাবার্থ: "[সংখ্যা হলো] বিভিন্ন সংকেতের সমষ্টি ও এগুলো ব্যবহারের আইন-কানুন যদ্বারা গণনা, মানের পার্থক্য নির্ণয়, অঙ্ক কষা, বিন্যাস নির্ণয়, মাপজোখ করা, ভেল্যু প্রতিনিধিত্ব, সীমা নির্ধারণ, পরিমাণ বেরকরণ, তথ্যাদি কোডকরণ এবং তথ্য সম্প্রচার।"

অন্য আরেকটি বিজ্ঞানের গ্রন্থে সংখ্যার অর্থ বলা হয়েছে:

"Number, word or symbol used to designate quantities of entities that behave like quantities."

ভাবার্থ : "শব্দ বা সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো পরিমাণ কিংবা পরিমাণের মতো কোনো রাশিকে নামকরণ করাকে বলে সংখ্যা।"

উপরে বর্ণিত উভয় সংজ্ঞাই যথার্থ। আমরা জানি জগতব্যাপী একক যেমন আছে তেমনি একের অধিকও আছে। এছাড়া কোনো বস্তু নাই বলতে কি বুঝায় তা-ও আমরা বুঝি। সংখ্যা মূলত 'গণনা' করাকে বুঝায়। গণনা করতে যেয়ে সংখ্যার ব্যবহার অপরিহার্য। তবে এই সংখ্যা বিভিন্ন ধরনের আছে।

এই অধ্যায়ে আমরা সংখ্যার উপর তথ্যমূলক আলোচনা করবো। পাঠকরা অধ্যায়টি পাঠ শেষে একদিকে সংখ্যার গুরুত্ব আর অপরদিকে এর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন অস্পষ্টতারও স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আসলে সংখ্যার শুরু ও শেষ এই উভয় ধারণার সঠিক সংজ্ঞা এখনও বিজ্ঞান খুঁজে পায় নি। সংখ্যা সম্পর্কিত অনেক তথাকথিত 'কঞ্জেকচার' [conjecture] বা অনুমানভিত্তিক থিওরিও আছে। এসব থিওরির প্রমাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আজো গাণিতিকরা করে যাচ্ছেন। সুতরাং সংখ্যা সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে- এরূপ দাবী কেউ করতে পারবেন না।

রেশন্যাল বা যুক্তিসিদ্ধ সংখ্যা

সাধারণ সংখ্যা হলো অকৃত্রিম রাশি যেমন ১, ২, ৩, ৪, ... । এসব সংখ্যাকে অবিভক্ত রাশি, পজিটিভ আস্ত রাশি কিংবা পজিটিভ রেশন্যাল সংখ্যাও বলে। আমরা সকল আস্ত সংখ্যাকে 'স্বভাবজাত' রাশিও বলতে পারি। সকল স্বভাবজাত সংখ্যা কিছু মৌলিক আইন মেনে চলে। যেমন দু'টি অকৃত্রিম সংখ্যার যোগফল, গুণফল, বিয়োগফল কিংবা ভাগফল সর্বদাই আরেক অকৃত্রিম সংখ্যা। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করা নিষেধ। অপরদিকে শূন্যকে যে কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ফলাফল সর্বদাই শূন্য হবে। যে কোনো ভাগফল দু'ধরনের হয়ে থাকে: ১. সীমিত বা সমাপ্তি দশমিক- যেমন: ২৭/৯ = ৩.০০০; ২. ফিরে ফিরে আসা দশমিক- যেমন ১৯/৭ = ২.৭১৪২৮৭১৪২৮৭১৪২৮ ... [এখানে ৭১৪২৮ ফিরে ফিরে আসে]।

ইরেশন্যাল সংখ্যা

ইরেশন্যাল শব্দের অর্থ যুক্তিহীন। কিন্তু সংখ্যার ক্ষেত্রে যখন শব্দটি প্রয়োগ হবে, তখন কিন্তু এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইরেশন্যাল সংখ্যা অযৌক্তিক নয়-

এগুলোও আসল সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত, তবে এদের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন একক ইউনিটবিশিষ্ট বাহুযুক্ত একটি সমচতুর্ভুজের ডায়াগনাল বা তির্যক রেখার মান কোনো রেশন্যাল সংখ্যা হবে না। কারণ, জ্যামিতি থেকে আমরা নিশ্চিত জানি এই লাইনের মান হলো ২ এর স্কোয়ার রুট। এর ফলাফল হলো: ১.৪১৪২৩৫৬২৩৭৩০ .... অনন্ত। এই দশমিকটি রেশন্যাল সংখ্যার মতো ফিরে ফিরে আসে না- তাই এটি ও অনুরূপ যে কোনো সংখ্যাকে গাণিতিকরা ‘ইরেশন্যাল’ [irrational] সংখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপর একটি প্রখ্যাত ইরেশন্যাল সংখ্যা হলো ‘পাই’ [μ] যার মান ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫ ... অনন্ত। এই সংখ্যাটি যে কোনো বৃত্তের পরিধিরেখাকে এর ব্যাস দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায়। আরেকটি ইরেশন্যাল সংখ্যা হলো ২.৭১৮২৮১৮২৮৫ ... অনন্ত। এটাকে ইংরেজী অক্ষর 'e' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। গণিতে এর ব্যবহার অপরিহার্য। উপরের চিত্রগুলো দেখুন।

পজিটিভ ইন্টেজার [ধনরাশি]
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ... অনন্ত

নেগিটিভ ইন্টেজার [বিয়োজ্য রাশি]
অনন্ত ... -৫, -৪, -৩, -২, -১

রেশন্যাল নাম্বার [যুক্তিসিদ্ধ রাশি]
২৭/৯ = ৩.০০০ ... [এখানে ০ ফিরে ফিরে আসে]
১৯/৭ = ২.৭১৪২৮৭১৪২৮৭১৪২৮ ... [এখানে ৭১৪২৮ বার বার আসে]

ইরেশন্যাল নাম্বার [যুক্তিহীন রাশি]
μ = ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫ ... অনন্ত; e = ২.৭১৮২৮১৮২৮৫ ... অনন্ত
√২ = ১.৪১৪২৩৫৬২৩৭৩০ .... অনন্ত

সংখ্যা রেখা [পজিটিভ, নেগিটিভ, রেশন্যাল ও ইরেশন্যাল]
অনন্ত ... -7 , -6 , -5 , -4 , -3 , -2 , -1 0 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ... অনন্ত

কমপ্লেক্স নাম্বার বা জটিল রাশি

উপরে উল্লিখিত 'বাস্তব' সংখ্যা ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যা আছে যেগুলোর ব্যবহার অপরিহার্য কিন্তু বুঝা কঠিন। এগুলোকে সার্বিকভাবে কমপ্লেক্স নাম্বার [complex number] বলে। কোনো বাস্তব সংখ্যার নিজস্ব গুণফল শূন্য বা পজিটিভ হবে। সুতরাং সমীকরণ $x^2 = -1$ এর কোনো বাস্তব সমাধান নেই। কারণ যে কোনো সংখ্যার গুণফল সর্বক্ষেত্রেই একমাত্র পজিটিভ হয়ে থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে x এর গুণফল যেহেতু -১ তাই এটার কোনো বাস্তব সমাধান নেই। কিন্তু আমাদেরকে সমাধান বের করার প্রয়োজন দাঁড়াতে পারে। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা এ ব্যাপারে পুরো ওয়াকিফহাল। সে ক্ষেত্রে বর্ণিত সমীকরণ নিয়ে কাজ করতে হয়। গাণিতিকরা এই সমস্যা সমাধানে একটি সংখ্যা আবিষ্কার করেছেন যা মূলত কাল্পনিক- এটা বাস্তব নয়। সুতরাং কমপ্লেক্স নাম্বার বলতে সেটিকে বুঝায় যা মূলত একটি বাস্তব সংখ্যা ও কাল্পনিক সংখ্যার যোগফল। কাল্পনিক সংখ্যা হলো i এর গুণফল, যেখানে i সমান -১ এর স্কোয়ার রুট। যে কোনো কমপ্লেক্স সংখ্যাকে আমরা a+bi দ্বারা উপস্থাপন করতে পারি। এখানে a এবং b হলো রিয়েল নাম্বার [বাস্তব সংখ্যা]। মোটকথা, সমীকরণ a+bi এর a ও b বাস্তব হলেও যেহেতু i কাল্পনিক তাই bi- হবে কাল্পনিক।

সুতরাং আমরা বলতে পারি কমপ্লেক্স নাম্বারের মধ্যে সকল বাস্তব সংখ্যা এবং সকল কাল্পনিক সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত। একই কথা রেশন্যাল ও ইরেশন্যাল সংখ্যার ক্ষেত্রে সত্য নয়- কারণ বাস্তব নাম্বার রেশন্যাল কিংবা ইরেশন্যাল হলেও কাল্পনিক নাম্বার তা-ই নয়।

কমপ্লেক্স সংখ্যার গুরুত্ব বেশ বড়ো। পদার্থবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জটিল সংখ্যা ইলেকট্রিক সার্কেট বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ইলেকট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গেও i-এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ক্যুয়ান্টাম থিওরি এবং গণিতের কালকুলাসেও কমপ্লেক্স নাম্বার ব্যবহৃত হয়।

নাম্বার থিওরি

আমরা এতক্ষণ সংখ্যার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি সংখ্যার বিভিন্ন চরিত্র যেমন: বাস্তব, কাল্পনিক, যুক্তিসিদ্ধ, যুক্তিহীন ইত্যাদি সংখ্যা। সংখ্যা অবশ্য ১-এর কম, ২-এর বেশী কিন্তু ৩-এর কম ইত্যাদিও হতে পারে। যেমন:

০.৫, ০.৯, ১.৫, ২.৯ ইত্যাদি।

এগুলো সবই ভগ্ন বা ব্রোকেন [broken] সংখ্যা। কিন্তু যেসব সংখ্যা ভগ্ন নয় অর্থাৎ আস্ত [whole] ওগুলোকে বলে ইন্টেজার [integer] বা পূর্ণসংখ্যা।
সুতরাং ১, ২, ৩, ৪ ... -৯, -৬, -৮ ... ইত্যাদি হলো পূর্ণসংখ্যা।

এই সংখ্যাগুলো নিয়ে ইতিহাসব্যাপী গবেষণা হয়ে আসছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাধিক থিওরি। এই থিওরিগুলোই হলো নাম্বার থিওরি।

পূর্ণসংখ্যা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন:
-৪, -২, ০, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি হলো জোড়;
অপরদিকে -৩, -১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি হলো বেজোড় সংখ্যা;
৬, ২৮ ইত্যাদি হলো পারফেক্ট বা নিখুঁত নাম্বার কারণ ১+২+৩ = ৬ এবং ১, ২ এবং ৩ দ্বারা ৬-কে ভাগ করা যায়,
অনুরূপ ১+২+৪+৭+১৪ = ২৮ এবং ১, ২, ৪, ৭ ও ১৪ দ্বারা ২৮-কে ভাগ করা যায়।

অন্যান্য পজিটিভ সংখ্যা যেগুলোর ভাজকের যোগফল সংখ্যার সমান নয় তাকে বলে ইমপারফেক্ট [imperfect] বা ত্রুটিপূর্ণ সংখ্যা। ইমপারফেক্ট সংখ্যা আবার দু'ধরনের: ডেফিসিয়েন্ট [deficient- ন্যূন] কিংবা এবানডেন্ট [abundant- প্রচুর]। ইমপারফেক্ট সংখ্যার ভাজকের যোগফল যদি মূল সংখ্যা থেকে কম হয়, তাহলে সেটা ডেফিসিয়েন্ট- আর বেশী হলে এফিসিয়েন্ট। দৃষ্টান্ত:

৯ হলো ডেফিসিয়েন্ট ইমপারফেক্ট সংখ্যা কারণ এর ভাজক ১ ও ৩ এর যোগফল ৪।

কিন্তু ১২ হলো এবানডেন্ট ইমপারফেক্ট সংখ্যা কারণ, এর ভাজক ১, ২, ৩, ৪, ৬ এর যোগফল ১৬।

প্রাইম বা অবিভাজ্য সংখ্যা

নাম্বার থিওরির অধিকাংশ বিচরণ মূলত প্রাইম সংখ্যার উপর। প্রাইম বা অবিভাজ্য মৌলিক সংখ্যাগুলো ইতিহাসব্যাপী গাণিতিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে আসছে। আর এই আকর্ষণের কারণ এখনই উন্মোচন হবে। মূলত সকল সংখ্যার মধ্যে প্রাইমের ভেতর অনেক চিত্তাকর্ষক রহস্য লুকিয়ে আছে। তাহলে আসুন এই একক নেচারেল সংখ্যাগুলো কী তা একটু তলিয়ে দেখি।

প্রাইম সংখ্যার সংজ্ঞা হলো: একটি সংখ্যা m [m = + ১ কিংবা - ১ নয়] প্রাইম হবে যদি এটাকে একমাত্র +/-১ কিংবা +/-m দ্বারা বিভাজ্য হয়। সকল সংখ্যা এক বা একাধিক প্রাইম সংখ্যার গুণফল: ৯ = ৩x৩; ১০ = ২x৫; ১২ = ২x২x৩ ইত্যাদি। প্রথম ১০টি পজিটিভ প্রাইম বা মৌলিক সংখ্যা হলো: ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯।

প্রাইম নয় এমন সংখ্যাকে বলে কম্পোজিট [composite] বা যৌগিক সংখ্যা। গ্রীক গাণিতিক ইউক্লিড [খ্রি.পূ. ৩য় শতক] সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রাইম সংখ্যা অশেষ। অর্থাৎ সর্ববৃহৎ কোনো প্রাইম সংখ্যা নেই। যতো বড়ো প্রাইম সংখ্যাই আবিষ্কৃত হোক না কেনো এর বড়ো আরেকটি বিদ্যমান। সুতরাং প্রাইম সংখ্যা অসংখ্য। তবে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, সংখ্যা যতো বড় হবে প্রাইম সংখ্যাও ততো বিরল হবে। অর্থাৎ সংখ্যা রেখার দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো সংখ্যা যতো বড়োর দিকে যাবে প্রাইম সংখ্যাও ততো কম হবে। নীচে প্রথম ১৬৮টি প্রাইম বা মৌলিক সংখ্যা তুলে ধরেছি।

২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৫৩, ৫৯, ৬১, ৬৭, ৭১, ৭৩, ৭৯, ৮৩, ৮৯, ৯৭, ১০১, ১০৩, ১০৭, ১০৯, ১১৩, ১২৭, ১৩১, ১৩৭, ১৩৯,

১৪৯, ১৫১, ১৫৭, ১৬৩, ১৬৭, ১৭৩, ১৭৯, ১৮১, ১৯১, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৯, ২১১, ২২৩, ২২৭, ২২৯, ২৩৩, ২৩৯, ২৪১, ২৫১, ২৫৭, ২৬৩, ২৬৯, ২৭১, ২৭৭, ২৮১, ২৮৩, ২৯৩, ৩০৭, ৩১১, ৩১৩, ৩১৭, ৩৩১, ৩৩৭, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৭৩, ৩৭৯, ৩৮৩, ৩৮৯, ৩৯৭, ৪০১, ৪০৯, ৪১৯, ৪২১, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৯, ৪৪৩, ৪৪৯, ৪৫৭, ৪৬১, ৪৬৩ ৪৬৭, ৪৭৯, ৪৮৭, ৪৯১, ৪৯৯, ৫০৩, ৫০৯, ৫২১, ৫২৩, ৫৪১, ৫৪৭, ৫৫৭, ৫৬৩, ৫৬৯, ৫৭১, ৫৭৭, ৫৮৭, ৫৯৩, ৫৯৯, ৬০১, ৬০৭, ৬১৩, ৬১৭, ৬১৯, ৬৩১, ৬৪১, ৬৪৩, ৬৪৭, ৬৫৩, ৬৫৯, ৬৬১, ৬৭৩, ৬৭৭, ৬৮৩, ৬৯১, ৭০১, ৭০৯, ৭১৯, ৭২৭, ৭৩৩, ৭৩৯, ৭৪৩, ৭৫১, ৭৫৭, ৭৬১, ৭৬৯, ৭৭৩, ৭৮৭, ৭৯৭, ৮০৯, ৮১১, ৮২১, ৮২৩, ৮২৭, ৮২৯, ৮৩৯, ৮৫৩, ৮৫৭, ৮৫৯, ৮৬৩, ৮৭৭, ৮৮১, ৮৮৩, ৮৮৭ ৯০৭, ৯১১, ৯১৯, ৯২৯, ৯৩৭, ৯৪১, ৯৪৭, ৯৫৩, ৯৬৭, ৯৭১, ৯৭৭, ৯৮৩, ৯৯১, ৯৯৭

আমরা গুণে দেখতে পারি প্রতি ১০০ টি সংখ্যার মধ্যে কটি করে মৌলিক সংখ্যা আছে: ১-১০০ = ২৫টি; ১০১-২০০ = ২১টি; ৩০১-৩০০ ১৬টি; ৩০১-৪০০ = ১৬টি; ৪০১-৫০০ = ১৭টি; ৫০১-৬০০ = ১৪টি; ৬০১-৭০০ = ১৬টি; ৭০১-৮০০ = ১৪টি; ৮০১-৯০০ = ১৫টি; ৯০৭-১০০০ = ১৪টি।

মৌলিক সংখ্যা যে রাশি বাড়ার সাথে কমে আসে তার প্রমাণ উক্ত সিরিজটি থেকে কিছুটা উন্মোচন হয়েছে। তবে দেখা গেছে পুরো সংখ্যা লাইনের ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে আছে ২৫% প্রাইম, ১ থেকে ১০০০ এর মধ্যে আছে ১৭% প্রাইম এবং ১ থেকে ১০,০০,০০০ এর মধ্যে প্রাইমের সংখ্যা মাত্র ৭%।

সর্ববৃহৎ প্রমাণিত প্রাইম সংখ্যা

গাণিতিক, গবেষক ও অঙ্কের প্রতি আগ্রহশীল হাজার হাজার লোক সর্বদাই সর্ববৃহৎ প্রাইম সংখ্যা আবিষ্কারে সচেষ্ট আছেন। আমার জানা মতে এ পর্যন্ত যে প্রাইম সংখ্যা সর্ববৃহৎ বলে প্রমাণিত হয়েছে তাহলো ১৯৯৮ সালে আবিষ্কৃত সংখ্যা যার মধ্যে মোট ৯,০৯,৫২৬-টি ডিজিট (রাশি) আছে। রোনেল্ড ক্লার্কসন নামক একজন ভলোন্টিয়ার এই সংখ্যার আবিষ্কারক। উল্লেখ্য বিশ্বব্যাপী প্রাইম সংখ্যার সন্ধান চলছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। গ্রেট ইন্টারনেট মারসেন প্রাইম সার্চ [সংক্ষেপে GIMPS] নামক একটি সংস্থা আছে। ক্লার্কসন ঐ সংস্থার একজন সদস্য। কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেট থেকে 'ডাউনলোড' করা একটি প্রোগ্রাম ব্যবহার

করে তিনি এই নাম্বার আবিষ্কার করেন। প্রাইম সংখ্যা বের করার একটি ফর্মুলা আছে। এই সমীকরণটি হলো: $2^n - 1$। এখানে n হলো জানা প্রাইম সংখ্যা। এই সমীকরণে ক্লার্কসন যেসব সংখ্যা ব্যবহার করেন তাহলো: $২^{৩০,২১,৩৭৭}$ - ১। এই আবিষ্কার থেকে ইতোমধ্যে বর্ণিত ৩৭তম পারফেক্ট বা নিঁখুত সংখ্যাও নির্ণিত হয়েছে।

প্রাইম সংখ্যা সম্পর্কে প্রুফ ও কনজেকচার [প্রমাণ ও অনুমান]

প্রাইম সংখ্যা অসীম হওয়ার প্রমাণ সেই পুরাতন যুগে ইউক্লিড করে গেছেন। তার ঐ প্রমাণটি সত্যিই সহজ ও চিত্তাকর্ষক। মনে করুন প হলো যে কোনো প্রাইম সংখ্যা এবং ক = ১ X ২ X ৩ X ৪ X... X প + ১; অর্থাৎ, ক হলো প্রাইম সংখ্যাসহ সকল আস্ত সংখ্যার গুণফল থেকে ১ বেশী। আস্ত সংখ্যা ক হলো প থেকে বড়ো এবং এটা ২ থেকে প্রাইম প [প-সহ] পর্যন্ত কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয়। অতএব, এর- ১ ছাড়া যে কোনো পজিটিভ ভাজক এবং এর যে কোনো প্রাইম সংখ্যা ভাজক প থেকে অবশ্যই বড়ো হতে হবে। সুতরাং এ থেকে এটা সহজে প্রমাণ হলো যে, প থেকেও আরেকটি বড়ো প্রাইম সংখ্যা আছে।

আমরা ইতোমধ্যে সমীকরণ 2^n-1 নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। মারসেন নামক একজন ফরাসী গাণিতিক ৩ শতাধিক বছর পূর্বে এই ফর্মুলা আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিয়েছেন উক্ত ফর্মুলায় n যদি প্রাইম হয় তাহলে এটি দ্বারা অপর আরেকটি প্রাইম বের করা সম্ভব। দৃষ্টান্ত: $২^{২}$ - ১ = ৩ [যা আরেকটি প্রাইম]; $২^{৫}$ - ১ = ৩১ [যা আরেকটি প্রাইম]।

দু'টি প্রাইম যদি ২ সংখ্যা পরিমাণ পার্থক্যবিশিষ্ট হয় তাহলে এগুলোকে জোড়া প্রাইম বলে। দৃষ্টান্ত হলো: ৫,৭; ১১,১৩; ১৭,১৯; ২৯,৩১; ৪১,৪৩; ৫৯,৬১; ৭১,৭৩; ১০১,১০৩; ১০৭,১০৯ ইত্যাদি। এটা জানা নেই এরূপ অসংখ্য জোড়া প্রাইম আছে কি না।

আরেকটি ধারণা হলো, ২ এর অধিক প্রত্যেক জোড় সংখ্যাকে দু'টি প্রাইম সংখ্যার যোগফল হিসাবে দেখানো যাবে। দৃষ্টান্ত হলো: ৪ = ২+২; ৬ = ৩+৩; ৮

= ৩+৫; ১০ = ৫+৫; ২০ = ৩+১৭; ১০০ = ৩+৯৭ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে এখনও কোনো প্রমাণ মিলেনি যে, সকল ক্ষেত্রে এরূপ হবে- কিন্তু মনে করা হয় তা-ই হবে।

শূন্যের গুরুত্ব

কোন কিছু নাই- কথাটি বেশ ছোট্ট এবং সাধারণ ক্ষেত্রে তেমন বেশী গুরুত্বহও নয়। ব্যাপারটি ঠিক এরকম নয় যখন আমরা গণিত নিয়ে চিন্তা করবো। শুধু গণিত কেনো- পুরো বিজ্ঞানজগৎ নিয়ে গবেষণায় শূন্যের গুরুত্ব যে কতো বড়ো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তী লেখার মাধ্যমে তা পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হবে। শূন্যস্থান বা কোনো কিছু নাই- এই ব্যাপারটি কিন্তু অনেক বিজ্ঞানচেতা মানুষকেও অতীতে বোকা বানিয়েছে। কারণ তারা মনে করেছেন, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতায় আবিষ্কৃত ও মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত ও প্রচারিত শূন্য সিস্টেম আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়! সুতরাং ইউরোপীয় মধ্যযুগ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ‘কট্টরবাদী’ ঐসব বিজ্ঞানী ও সাধারণ ইউরোপিয়ানরা শূন্যের [০] গুরুত্ব অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। শেষে দেখলেন, এটার ব্যবহার এতো বড়ো যে, এটাকে উপেক্ষা করলে পুরো বিজ্ঞানচেতনায় শুধু ভাটা পড়বে না, মূলত বৈজ্ঞানিক উন্নয়নই সম্ভব নয়। পাঠকরা এ পর্যন্ত যাকিছু পড়েছেন তাতে অবশ্যই শূন্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিয়েছেন। শূন্য ছাড়া গণিত অচল- আর গণিত অচল হওয়ার মানে হলো পুরো বিজ্ঞান অচল। এবার শূন্যসহ সর্বত্র সচরাচর ব্যবহৃত ১০টি সংখ্যা কিভাবে আবিষ্কার ও ব্যবহৃত হলো তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নিলে ভালো হয়।

আমরা জানি সংখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত গণিতের প্রধান একটি শাখা পাটিগণিত। সংখ্যা নিয়ে যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ করা একান্ত জরুরী। যে কোনো সভ্যতায় মানুষ বাণিজ্য করে থাকে। আর বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হিসাবনিকাশ তো থাকবেই। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরেই পাটিগণিত আবিষ্কৃত হয় যার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সংখ্যা সিস্টেম। সুতরাং বলা যায় মানবসভ্যতার আবির্ভাব যেদিন হয়েছিল সেদিন থেকেই গণনার শুরু হয়েছে। হয়তো প্রাথমিক যুগে হাতের দশটি অঙ্গুলি বা পায়ের দশটি মিলে বিশটি অঙ্গুলি ব্যবহার করে গণনার সূত্রপাত হয়েছিল।

অবশ্য আমাদের সংখ্যা সিস্টেমে 'দশকে বেইজ' হিসাবে প্রতিষ্ঠার পেছনে যে এই হাতের দশ আঙ্গুল দ্বারা গণনা এর মূল কারণ, তা নিশ্চিত বলা যায়। আমাদের বর্তমান সংখ্যাপদ্ধতি নিয়ে একটু পরই আলোচনা করবো। প্রথমে জেনে নিই কিভাবে লিখিত ঐতিহাসিক কাল থেকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ক্রমোন্নতি ঘটলো।

ছবির সাহায্যে সংখ্যা

প্রাথমিক দিকে যে বস্তু নিয়ে গণনা হবে সে বস্তুর 'ছবি' এঁকে উপস্থাপিত হতো। যেমন 'চারজন পুরুষ' বুঝাতে মানুষের মতো ছবি চারবার আঁকা। অপর একটি সিস্টেম ছিলো ছোট্ট এক বা একাধিক সরল রেখা। যে ক'টি বস্তু বুঝানো হবে সে সংখ্যা পরিমাণ লাইন আঁকা হতো। আমাদের হাতে পাঁচটি আঙ্গুল থাকায় সংখ্যা পাঁচ বুঝাতে একটি হাতের ছবি এঁকে ৫ বুঝানো যায়। দু'টি হাত দ্বারা ১০ ও তিনটি দ্বারা ৩০ বুঝানো যাবে। এভাবে ছবির সাহায্যে সংখ্যার উপস্থাপন কিন্তু বেশীদূর এগোয় না- সুতরাং আরোও উন্নতমানের সংখ্যা সিস্টেমের প্রয়োজন দাঁড়ালো।

গূঢ়লিপি বা হাইয়েরোগ্লিফ [hieroglyph]

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরে সংখ্যার চিহ্নসহ লেখালেখির একটি অভিনব সিস্টেম ৩০০০ বছর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়। এই সিস্টেমকে বলে হাইয়েরোগ্লিফ [hieroglyph] বা গূঢ়লিপি। এই সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ছিলো একই সংখ্যার জন্য একই ছবি বা চিহ্নের পুনঃপুন ব্যবহার। উচ্চ সংখ্যা উপস্থাপনের জন্য এই সিস্টেম অনেকটা সহায়ক হয়। তবে একই সংখ্যা যখন বার বার লিখতে লিখতে পাপাইরাসে [papyrus] বা কাগজে কুলাতো না তখন সময় সময় 'পূরণ' করার ব্যবস্থা থাকতো।

১ ১০ ১০০ ১০০০

১০,০০০ ১০,০০০ ১০০,০০০
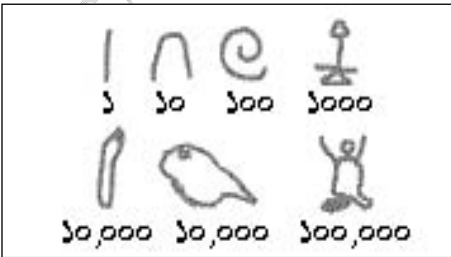
প্রাচীন মিশরে তিনটি ভিন্ন সংখ্যা সিস্টেম চালু ছিলো। এগুলো হলো হাইয়েরোগ্লিফ, হাইয়ারেটিক ও ডিমোটিক। প্রথমটি ছিলো ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ 'পবিত্র' লেখালেখি

যা মূলত দেওয়ালে অঙ্কিত হতো দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকার উদ্দেশে। এই সিস্টেমে খুব অল্প ক্ষেত্রে সংখ্যা লেখালেখি হতো। দ্বিতীয়টি বিশেষ অনুলেখক, পুরোহিত প্রমুখ দৈনিক রেকর্ড হিসাবে ‘পাপাইরাসে’ লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করতেন।

সবশেষে তৃতীয় লেখার সিস্টেমটি প্রাত্যহিক অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। মিশরে সংখ্যা লিখার পদ্ধতি ছিলো ডান থেকে বায়ের দিকে। সংখ্যার শুরু ছিলো ১ দিয়ে এবং উর্ধ্বে ১ মিলিয়ন [দশ লক্ষ] পর্যন্ত লেখা হতো। পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে বিভিন্ন সংখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত মিশরীয় সংখ্যার একটি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।

সুমারিয়ান সংখ্যা

বর্তমান ইরাকে আদি যুগে একটি সভ্যতার জন্ম হয়েছিল যারা লেখালেখি ও চাকার মতো মানবেতিহাসের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিল। এই সভ্যতায় সংখ্যাও লেখার মাধ্যমে উপস্থাপন হতো। ৬০ বেইজের উপর ভিত্তি করে একটি উন্নতমানের সংখ্যা সিস্টেমের উদ্ভাবন ঘটে এই সুমারিয়ায়। ষাট বেইজের সিস্টেম

১০+ ১+১+১ ১+১ ১০+১০

$$১৩X৬০^{২} \quad ২X৬০^{০} = ২০X১$$

$$১৩X৬০^{২} + ২X৬০ + ২০ = ৪৬৯৪০$$

আমরা আজো ব্যবহার করে থাকি। ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ড মূলত ৬০-বেইজ সিস্টেম। এছাড়া কোনো বৃত্তের মধ্যে আমরা যে ৩৬০ ডিগ্রীর হিসাব করি তা-ও কিন্তু বেইজ ৬০ এর উপর নির্ভরশীল। সুমারিয়ান সিস্টেমে প্লেইস-ভেল্যুর [place value - স্থানিক মান] ব্যবহারও লক্ষণীয়। সুতরাং ‘আরবি সংখ্যা’ তথা বর্তমানে ব্যবহৃত বেইজ-১০ সিস্টেমে লিখিত সংখ্যা ৪৬,৯৪০-কে আমরা অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারি (দেখুন পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রটি)।

কিন্তু উপরোক্ত অপেক্ষাকৃত সরল সুমারিয়ান সিস্টেমেও শূন্যের জন্য কোনো বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার ছিলো না। ফলে অঙ্ক কষা অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া কোনো সংখ্যা আসলে কী তা সহজে জানাও কঠিন। যেমন উপরের চিত্রে উপস্থাপিত চিহ্নগুলো থেকে আমরা বলতে পারি এটা আমাদের হিসাবে ৪২১, ৪২১০, ৪০২১ ইত্যাদি যে কোনো সংখ্যা হতে পারে। মোটকথা, একেক সংখ্যার জন্য একেকটি আলাদা চিহ্ন ছাড়া সার্বিকভাবে ব্যবহারযোগ্য কোনো সংখ্যা সিস্টেম হয় না।

ব্যাবিলনীয় সংখ্যা

সভ্যতার আরেক লীলাভূমি ব্যাবিলনে যে সিস্টেম চালু ছিলো তা-ও মূলত উপরে বর্ণিত সিস্টেমের মতোই। তবে বেইজ-৬০ ছাড়াও তারা বেইজ-১০ ব্যবহার করেছে। তাদের সংখ্যার জন্য যেসব চিহ্ন ছিলো তার একটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো।

চীনা সংখ্যা

চীনদেশ অবশ্য পুরাতন সভ্যতার আরেক লীলাভূমি। এখানেও অনেক আগে সংখ্যার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আর তাদের আবিষ্কৃত হিসাব-মেশিন ‘আবাকাস’ সম্পর্কে কে না জানেন। চীন সরকার ১৯৫৫ সালে ‘আরবি’ সংখ্যা ব্যবহার বৈধ ঘোষণা করেছেন।

মায়া ও আজটেক সংখ্যা

উত্তর আমেরিকায় এই দু’টি সভ্যতা গড়ে ওঠে দুই হাজার বছর পূর্বে। এখানকার লোকেরা ২০-কে বেইজ করে সংখ্যা সিস্টেম গড়ে তুলে। মায়ান সিস্টেমে ১ থেকে ৪ সংখ্যাগুলো শুধুমাত্র বিন্দুর মাধ্যমে লেখা হতো। ৫, ১০, ১৫ লেখা হতো
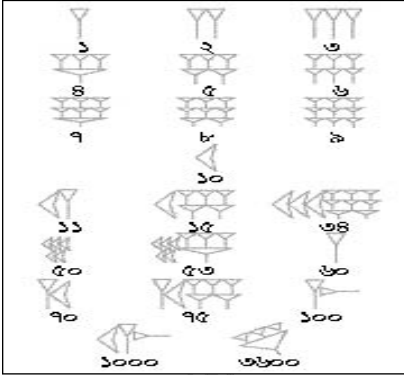
কাঠি ও রেখা দ্বারা। তারা চন্দ্রকে অঙ্কন করতো ২০ সংখ্যা বুঝাতে। মায়ানরা প্লেইস ভেল্যু [Place Value] চিহ্ন ব্যবহার করা শিখে নি।

আজটেকরা ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যাকে বিন্দু কিংবা ছোট্ট বৃত্তের মাধ্যমে লিখতো। সংখ্যা ২০ এর জন্য ছিলো একটি ধর্মীয় পতাকা। ৪০০ [২০ X ২০] লিখা হতো একটি পাইন গাছের ছবি দ্বারা এবং ৮০০০ [২০ X ২০ X ২০] এর জন্য ছিলো একটি থলে। মায়ান সিস্টেমে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো ১,৮১৪,৩৬৯,৮০০। সংখ্যাটি এতো দিনের জন্য লিখা হয়েছে যা ৫,১০০,০০০ বছরের সমান।

হিব্রু বর্ণসংখ্যা

হিব্রু ভাষায় মোট অক্ষরসংখ্যা ২২টি। এই বর্ণগুলো দিয়ে সংখ্যা লিখা হতো। ১ থেকে ৪০০ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য বর্ণের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদে ৪০০ এর অধিক সংখ্যার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন ৫০০ = ৪০০ + ১০০; ৯০০ = ৪০০ + ৪০০ + ১০০ ইত্যাদি। পরবর্তীতে কিছুটা উন্নতমানের সংখ্যা সিস্টেম চালু হয়। উপরের চিত্রে এই সিস্টেমের একটি নমুনা তুলে ধরা হলো।

গ্রীক সংখ্যা

এই প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ম হয়েছে বলে অনেকেই নিশ্চিত হয়ে বলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে এতো জ্ঞানী-গুণীদের এই জন্মভূমিতেও সার্বজনীন কোনো সংখ্যা সিস্টেমের আবির্ভাব ঘটেনি। এর পেছনে মূল কারণ হলো, এখানেও সংখ্যার জন্য বিশেষ কোনো চিহ্নের বদলে ভাষার বর্ণগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্ণকে সংখ্যা

বানানোর ফলে এগুলো দিয়ে অঙ্ক কষা যে কতো কঠিন তা আমরা একটু পরই বুঝতে পারবো।

গ্রীকরা দু'টি সিস্টেম ব্যবহার করে। প্রথমটি খ্রিস্টপূর্ব ৫ম থেকে ১ম শতক পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। এগুলোকে 'হিরোডিয়ান' বা 'আতিক' নাম্বার সিস্টেম বলে। উপরের (প্রথম) চিত্রে এই সিস্টেম অঙ্কিত হয়েছে।

পরবর্তীতে ব্যবহৃত গ্রীক সিস্টেম অনেকটা ভিন্ন। ক্লাসিক্যাল গ্রীক ভাষায় মোট বর্ণসংখ্যা ছিলো মাত্র ২৪টি। কিন্তু সংখ্যার জন্য সুবিধাজনক হয় যদি ২৭টি বর্ণ থাকে। সুতরাং তারা তিনটি অতিরিক্ত চিহ্ন আবিষ্কার করে। উপরের দ্বিতীয় চিত্রে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ব্যবহৃত গ্রীক বর্ণসংখ্যার একটি নমুনা তুলে ধরেছি।

রোমান সংখ্যা

সার্বজনীন 'আরবি' সংখ্যা নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা আরেকটি প্রসিদ্ধ সংখ্যার উপর কিছুটা তথ্য তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। এই সংখ্যাটি হলো রোমক সংখ্যা। বর্ণভিত্তিক সকল পুরাতন সিস্টেমের মধ্যে একমাত্র এই সিস্টেমটিই কিছুটা স্থায়িত্ব লাভ করেছে। কেউ কেউ এখনও বিশেষ প্রয়োজনে বা ফ্যাশন হিসাবে রোমান সংখ্যা ব্যবহার করে থাকেন। আমরা প্রায়ই বইয়ের প্রথমে, ঘড়ির ডায়ালে এবং তারিখ লিখন ইত্যাদিতে এসব সংখ্যার ব্যবহার দেখতে পাই।

আধুনিক রোমক সিস্টেমে 'বিয়োগ পদ্ধতি' ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত হলো: ৪ যা লেখা হয় IV- অর্থাৎ ৫-১ = ৪ [I=১, V=৫]। এখানে IIII লিখা যেতো। ৯ লেখা হয় IX দ্বারা, অর্থাৎ ১০-১ = ৯ [I=১, X=১০]- এখানেও লিখা যেতো VIIII। অপর আরেকটি উপমা হলো ৯০০। এ সংখ্যার জন্য DCCCC না লিখে লেখা হয়

CM- অর্থাৎ ১০০০-১০০। সুতরাং ১৯৯৬ লিখার জন্য ব্যবহৃত হয় MCMXCVI। উপরে বর্ণিত অন্যান্য সিস্টেমের মতো অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের রোমক সংখ্যাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে নি। এর কারণ হলো প্রথমতঃ বড় সংখ্যা লিখতে সমস্যা এবং অঙ্ক কষা খুব বেশী কঠিন। পাঠকদের কেউ চাইলে DCCCC x DCCCC কী হবে তা বের করে দেখুন। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে পাটিগণিতের জন্য উপরোক্ত কোনো সংখ্যা সিস্টেমই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই দরকার পড়লো উন্নতমানের সরল একটি সিস্টেমের।

‘আরবি’ সংখ্যা

‘আরবি সংখ্যা’ [Arabic numerals] কথাটি ইউরোপ থেকে এসেছে। বর্তমানে সর্বত্র ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি মূলত ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। শেষে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে ইউরোপসহ পুরো পুরাতন বিশ্বব্যাপী তা বিস্তৃত হয়েছে। সংখ্যাটির সারল্যতা হেতু এখন এমন কোনো দেশ বা জাতি নেই যেখানে এই সংখ্যা সিস্টেম চালু হয় নি। অবশ্য চিহ্নের মধ্যে তারতম্য আছে। কিন্তু মৌলিকভাবে সবগুলোই একই জিনিস। ইতিহাস থেকে এটা জানা গেছে যে ০-সহ ১০টি সংখ্যা প্রথমে খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতকে ভারতে আবিষ্কৃত হয়ে মুসলিম গাণিতিকদের হাতে উৎকর্ষলাভ করে। এই সিস্টেম থাকার ফলেই গণিত তথা পুরো বিজ্ঞানশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা ‘আলজেবরা’ বা বীজগণিতের জন্ম হয়। অবশ্য এর জন্মদাতা যে অষ্টম শতকের প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী আল-খোয়ারিজমি এব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

নবম শতকের শুরুতে খোয়ারিজমি বর্তমানে ব্যবহৃত সংখ্যার উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে কিভাবে অঙ্ক কষা যায় তা দেখিয়ে দেন। এই পদ্ধতিকে পরবর্তীতে ‘আল-খোয়ারিজমি’ নামের বিকৃত রূপ হিসাবে পাশ্চাত্য জগতে ‘আলগোরিজম’ [algorism] বা ‘আলগোরিথম’ [algorithm] নামে চিহ্নিত করা হয়। যদিও খোয়ারিজমি একজন মুসলমান হওয়ায় হিংসার বশবর্তী হয়ে ইউরোপিয়ানরা পুরো সংখ্যাসিস্টেম গ্রহণ করতে প্রচণ্ড বিরোধিতা করে শত শত বছরব্যাপী। খোয়ারিজমির গ্রন্থ লেটিন ভাষায় ১২ শতকে অনূদিত হলেও পশ্চিম ইউরোপে আরবি সংখ্যা গ্রহণ করা হয় ৩ শত বছর পরে- অর্থাৎ ১৫ শতকের দিকে।

প্লেস-ভেল্যু সিস্টেম

ইতোমধ্যে একাধিকবার এই সিস্টেমের কথা ব্যক্ত করেছি। সংখ্যা সিস্টেমে প্লেস-ভেল্যুর [স্থানিক মান] গুরুত্ব কতটুকু তা এখন বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবো। পাঠকরা এ থেকেই বুঝতে সক্ষম হবেন আরবি সংখ্যা কেনো সবার নিকট এতো বেশী গ্রহণযোগ্যতা পেল। প্লেস-ভেল্যু [place value] অর্থ স্থানিক মান। সংখ্যার মধ্যে কোন্ রাশি কোথায় স্থান পেয়েছে সেটার উপর নির্ভর করে সংখ্যার মান।

এবার একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। আমরা ৩,০৯৮,৩২৩ সংখ্যাকে ভেঙ্গে এভাবে লিখতে পরি: [৩ x ১০৬] + [০ x ১০৫] + [৯ x ১০৪] + [৮ x ১০৩] + [৩ x ১০২] + [২ x ১০১] + [৩ x ১০০]। এখন আমরা ডান থেকে পাঠ করতে গেলে বলবো: প্রথম ‘৩’ হলো ৩ ইউনিট [একক]; দ্বিতীয় ‘৩’ হলো ৩০০ ইউনিট; এবং তৃতীয় ‘৩’ হলো ৩ মিলিয়ন ইউনিট। লক্ষ করুন, ‘০’ দু’টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে: এটা শূন্য বুঝায় ও দশের গুণক বুঝায়। যেমন ক’টি শূন্য আছে তার উপর নির্ভর করে সংখ্যাটির মান: ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি।

অন্যান্য সকল সংখ্যার ক্ষেত্রেও রাশিটি কোথায় আছে তার উপর এর মান নির্ণিত হয়। সুতরাং প্লেস-ভেল্যুর গুরুত্ব অনুধাবন করেই শেষ পর্যন্ত সবাই এই সিস্টেমকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। ১০-বেইজড আমাদের এই সিস্টেমে শূন্যের গুরুত্ব কী বিরাট তা আরো অনুধাবনের জন্য এবার কিছু আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি।

শূন্য কোথায় বসে আছে তা থেকেই সংখ্যার মান নির্ণয় হয়। যেমন ১১০ এবং ১০১, এই উভয় সংখ্যায় দু’টি ‘১’ এবং একটি ‘০’ আছে। শূন্য যখন শেষে তখন সংখ্যাটির ভেল্যু একটি ও মাঝখানে হওয়ায় তা আরেকটি। শূন্যের গুরুত্ব আরো বেশী যখন এটা আমরা কোনো সমীকরণে ব্যবহার করবো:

ক - ট = ০

ক + খ - জ = ০ ইত্যাদি।

মূলত শূন্য ছাড়া কোনো সমীকরণই লিখা সম্ভব হবে না। উল্লেখিত প্রথম সমীকরণ দ্বারা আমরা যা বলছি তাহলো, ‘রাশি ক থেকে রাশি ট বাদ দিলে ফলাফল

হবে শূন্য' এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা বলছি 'রাশি ক ও খ এর যোগফল থেকে রাশি জ বাদ দিলে ফলাফল হবে শূন্য'।

শূন্যের সাথে অপর ৯টি সংখ্যাকে যোগ, বিয়োগ, ভাগ, পূরণ করলে কি হবে? এ ক্ষেত্রে কয়েকটি আইন মেনে চলতে হবে:

১. ০ x ০ = ০;
২. ০ x ক = ০ [এখানে ক হলো যে কোনো সংখ্যা];
৩. ০/০ = ০;
৪. ০/ক = ০;
৫. ০-ক = -ক;
৬. ০+ক = +ক;
৭. ০+০ = ০;
৮. ০-০ = ০;
৯. ক/০ [অজানা- সুতরাং শূন্য দ্বারা ভাগ নিষিদ্ধ]।

আলহামদুলিল্লাহ! 'ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনা'র উপর আমরা অনেক আলোচনা করলাম। আশা করছি পাঠকরা এ থেকে অন্তত কিছুটা চিন্তার খোরাক পেয়ে থাকবেন। এছাড়া বিজ্ঞানের গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন নিশ্চয়ই। আমরা এ পর্যন্ত গবেষণা থেকে যাকিছু অতিরিক্ত জ্ঞানবান হয়েছি তা সম্বল করে এবার আরোও অগ্রসর হতে চাই। বিজ্ঞানের রহস্যের সাগরে আরোও গভীরে নিমজ্জিত হয়ে তলিয়ে দেখতে চাই 'বিজ্ঞান আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'। তবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোর মূল উদ্দেশ্য হবে ঈমানী আলোকে বিজ্ঞান গবেষণা দ্বারা আমরা কতটুকু উপকৃত হতে পারি সেটা উন্মোচন। আমরা অণু-পরমাণুর জগৎ থেকে গ্যালাক্সি ও সুপারক্লাস্টার পর্যন্ত বস্তুজগতের কার্যকারিতা ও রহস্যাবলীর যাকিছু বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে তা যেটুকু সম্ভব গভীরভাবে অধ্যয়ন করবো। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জনের তাওফিক দিন।

চতুর্থ অধ্যায়
মহাকাশ বিজ্ঞান

আলহামদুলিল্লাহ! আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা বিশ্বতত্ত্ব, সময় ও সংখ্যার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিগ ব্যাং থিওরি সম্পর্কে ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে এই মহাবিশ্ব একদা জন্ম নিয়েছিল। এরপর খুব দ্রুত বিস্তৃত হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে। এতে আছে কোটি কোটি তারা, তারা ক্লাস্টার, গ্যালাক্সি, সৌরজগৎ ইত্যাদি। বিশ্বতত্ত্বের উপর আলোচনায় আমরা বাস্তবে বিশ্বের কাঠামোর উপর খুব একটা বলি নি। অপরদিকে সংখ্যার উপর ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা ইতিহাস চয়ন করেছি যাতে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়ে যাই। সংখ্যার গুরুত্বও বর্ণিত হয়েছে। এখনও অস্পষ্ট অথচ জরুরী ‘কাল’ বা ‘সময়’ বলতে কি বুঝায় এবং এর ব্যবহার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এখন থেকে আমরা তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর আমাদের বিজ্ঞানভাবনা সীমিত রাখবো। এর প্রথমটি হলো মহাকাশবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিজ্ঞান- ইংরেজীতে যাকে বলে ‘এ্যাস্ট্রনোমি’ [astronomy]। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান বা ফিজিক্স [physics], তৃতীয় বিষয়টি মূলত একাধিক বিষয়ের সমষ্টি। আমরা একে একে কয়েকটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক থিওরির উপর ব্যাখ্যা তুলে ধরবো। জগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থেকে যে কোনো ঈমানদারের ঈমানী শক্তি দৃঢ় হবে- এই আশাই বাস্তব। তাহলে আসুন, বিজ্ঞানের গভীরে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে এই মহাবিশ্ব ও এর সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৃষ্টিনৈপুন্য অনুধাবন করে ঐ নিয়ামতের অংশীদার হওয়ার চেষ্টা চালাই।

আগেই বলেছি ইংরেজী শব্দ এ্যাস্ট্রনোমির অর্থ হলো মহাকাশবিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করতে আমি খুব একটা আগ্রহী নয়। এই শব্দটির সাথে জ্যোতিষশাস্ত্র বা জ্যোতিষ শব্দটি সম্পৃক্ত বলে মনে হয়- অন্তত শোনতে তা-ই লাগে। কিন্তু, এ্যাস্ট্রনোমি মোটেই তাই নয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের ইংরেজী শব্দটাও একই ধরনের- অর্থাৎ ‘এ্যাস্ট্রলজি’

[astrology]। আকাশের তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ ও কল্পিত 'নক্ষত্রপুঞ্জ' [constellation] ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়ের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য-নীরিক্ষণ মোটেই বিজ্ঞানসম্মত কিছু নয়। সুতরাং এ্যাস্ট্রনোমি কিংবা জ্যোতির্বিজ্ঞান না বলে আমাদেরকে 'মহাকাশবিজ্ঞান' বা ইংরেজী শব্দদ্বয় 'স্পেইস-সাইন্স' [space-science] বলাই হবে যুক্তিসিদ্ধ।

মহাকাশবিজ্ঞান আসলে সর্বাপেক্ষা পুরাতন বিজ্ঞান। পৃথিবী ও মহাকাশে যা কিছু দৃশ্যমান আছে তা উপেক্ষা করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনুসন্ধিৎসু মানুষ এই বিরাট দৃশ্যমান বস্তুজগতকে আরো বেশী জানার আগ্রহ থেকে কিভাবে দূরে থাকতে পারে? বাস্তবে কিভাবে সূর্য উদয় হয় আর অস্ত যায়, দিবারাত্রির আবর্তন ঘটে, মহাকাশে চন্দ্র ও অসংখ্য তারা রাতের বেলা জ্বলে উঠে, পৃথিবীটা কিভাবে মহাকাশে ভাসমান আছে- ইত্যাদি শত শত প্রশ্ন থেকেই সুদূর অতীতে জন্ম নিয়েছে জগৎ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানান্বেষা, যাকে আমরা আজ মহাকাশবিজ্ঞান বলি। আমরা আপাতত এই জ্ঞানের অতীত ইতিহাসের উপর বিশ্লেষণে যাচ্ছি না। প্রয়োজনবোধে অবশ্য অতীতে আবিষ্কৃত তথ্যাদির কথা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করবো। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানের কথা বুঝিয়ে বলা।

মহাকাশবিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা আছে যেগুলোর সমষ্টিই হলো এ বিষয়ের পুরো ব্যাপ্তি। আর সবগুলো শাখা-উপশাখার উপর মৌলিক জ্ঞান ছাড়া আসল ব্যাপারই আমাদের নিকট অস্পষ্ট থেকে যাবে। তাই আসুন, প্রথমে মহাকাশবিজ্ঞানের মৌলিক ক'টি শাখা-উপশাখার উপর আলোচনায় যাই। তবে প্রথমে শাখাগুলোর নাম উল্লেখ করে নিই:

ক. এ্যাস্ট্রফিজিক্স [astrophysics] বা মহাকাশ-পদার্থবিজ্ঞান।

খ. সোলার সিস্টেম [solar system] বা সৌরজগৎ।

গ. স্টার [star] ও স্টার সিস্টেম [star system] বা নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডল।

ঘ. গ্যালাক্সি [galaxy] ও গ্যালাক্সি সিস্টেম [galaxy system] বা তারাজগৎ ও তারাজগৎ-মণ্ডল।

ঙ. ব্ল্যাক হোল [black hole] বা কৃষ্ণ গর্ত।
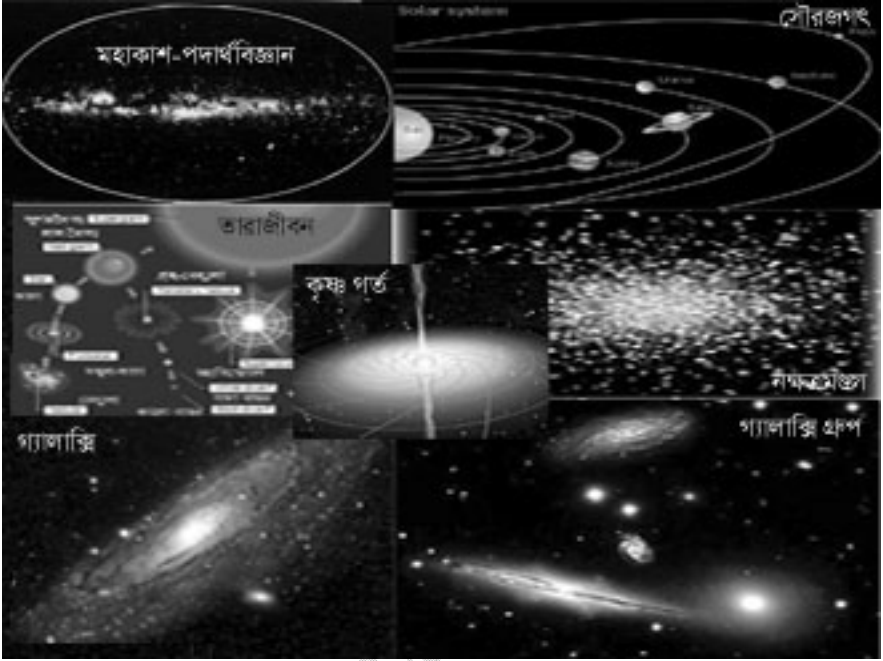
এ্যাস্ট্রফিজিক্স বা মহাকাশ-পদার্থবিজ্ঞান

মহাকাশের অসংখ্য বস্তুর উপর সঠিক জ্ঞানার্জন করতে যেয়ে মহাকাশবিজ্ঞানের যে শাখাটি বস্তুর গতিমতি ও ডাইনামিক্স নিয়ে গবেষণা করে তাকেই বলে এ্যাস্ট্রফিজিক্স [astrophysics]। আকাশের বিভিন্ন বস্তু যেমন তারা, গ্যালাক্সি ইত্যাদি থেকে যেসব প্রকাশ্য ও গোপন তথ্যাদি আমাদের পৃথিবীতে নেমে আসে ওগুলো বিভিন্ন যন্ত্রাদির মাধ্যমে সনাক্তকরণ ও মাপা এবং গবেষণা করা হলো এ্যাস্ট্রফিজিক্সের কাজ। আমি এখানে প্রকাশ্য ও গোপন এই উভয় শব্দ ব্যবহার করে বুঝাতে চেয়েছি যে, আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতির আয়ত্তে এবং বাইরে অনেক ফিজিক্যাল বিষয়-বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান, যেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন বিশেষভাবে নির্মিত যন্ত্রাদি বা ডিটেক্টর ছাড়া সম্ভব নয়। দৃশ্যমান বিষয়ের মধ্যে আলো, তাপ, বস্তুর গতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে গোপন বা অদৃশ্য বস্তুগুলোর মধ্যে

ইলেকট্রম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের [electromagnetic spectrum] [বা বিদ্যুৎচুম্বকীয় বর্ণচ্ছটার] যাবতীয় বিকিরণ নিয়ে গবেষণা ছাড়া আমাদের জ্ঞান সীমিত থেকে যেতে বাধ্য। আমরা একটু পরই বিদ্যুৎচুম্বকীয় বর্ণচ্ছটার উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যাবতীয় তথ্য একত্রিত হওয়ার পর একজন এ্যাস্ট্রফিজিসিস্টের কাজ হলো গণিতভিত্তিক থিওরিটিক্যাল 'মডেল' তৈরী করে প্রাপ্ত তথ্যাদির সঠিক কারণ নিরূপণ। এতে অবশ্য ভুল-ত্রুটি হতে পারে- অতীতে হয়েছেও। কিন্তু মূলতঃ ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টার মাধ্যমে সত্যকে আবিষ্কারই হলো বিজ্ঞানের কাজ। মহাকাশ ও পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রতিমুহূর্তের ঘটনাবলীর সঠিক জবাব আমরা বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোথাও পাবো না। যেমন উপরে বর্ণিত ইলেকট্রম্যাগনেটিক বিকিরণ যেসব বস্তু থেকে হচ্ছে তার ব্যাখ্যা জানতে এ্যাস্ট্রফিজিক্সের শরণাপন্ন হতেই হবে। বস্তুর আপেক্ষিক গতি, কিসব পরমাণু দ্বারা এটা গঠিত, আয়তন, এনার্জির মাত্রা, দূরত্ব ইত্যাদি অনেক তথ্যাদি ঐ বিকিরণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এমনকি দূরবর্তী একটি তারকার মধ্যে কি পরিমাণ তাপ ও চাপ আছে তা থার্মোডাইনামিক্সের [thermodynamics] আইন ব্যবহার করে বের করা সম্ভব। এখানে দূরবর্তী বলতে কোটি কোটি মাইল কিংবা আলোক বছর বুঝাচ্ছে।

আমরা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নিকটতম তারায় যাওয়ার কল্পনাই করতে পারি না কারণ, তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড- এই উচ্চ গতিতে আলোকরশ্মি ভ্রমণ করেও ঐ তারাটির কাছে যেতে প্রায় ৪ বছর সময় লাগবে। বর্তমান প্রযুক্তি দ্বারা সর্বাপেক্ষা গতিশীল মহাকাশযান ঘণ্টায় ৪০ হাজার মাইল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু এটা আলোকের গতির তুলনায় অতি নগণ্য! এই গতিতে চললেও ৯ আলোক বছর দূরে অবস্থিত 'ভেগা' নামক তারার নিকট যেতে অন্তত ৪০ হাজার বছর পার হয়ে যাবে! কিন্তু ভেগা থেকে আগত বিকিরণ থেকে আমরা তার সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি অবগত হতে পারি। বিকিরণের মধ্যে বস্তু লুকিয়ে রাখে নিজের অনেক গোপন তথ্য। এ্যাস্ট্রফিজিক্স কিভাবে গবেষণা করে তা বুঝার ক্ষেত্রে সারল্যতা অবলম্বন হেতু আমরা বিষয়টিকে ক'টি মৌলিক উপশাখায় ভাগ করে

নিতে পারি। এগুলো হলো তারা, গ্যালাক্সি ও সার্বিকভাবে মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা। আমরা অবশ্য এসব বস্তুর উপর বিস্তারিত আলোচনা পরে করবো। তবে এ্যাস্ট্রফিজিক্সের সাথে এগুলোর সম্পর্ক আগে জেনে নিলে পুরো মহাকাশবিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনা অনেকটা সহজবোধ্য হবে।

তারা নিয়ে গবেষণা

এ্যাস্ট্রফিজিক্সের ব্যাপ্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি বিষয়ের একটি হলো তারকাদের নিয়ে গবেষণা। মহাকাশবিজ্ঞানের উপর গবেষণার ক্ষেত্রে তারা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সর্বাপেক্ষা বেশী অর্জিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দাবী করেন, আমরা তারা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানি। কোনো তারা থেকে প্রাপ্ত আলোকরশ্মিকে রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য মুতাবিক যখন আমরা স্পেকট্রামের মাধ্যমে আলাদা করবো তখন ঐ তারার অনেক গোপন তথ্য আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। থার্মেল রেডিয়েশনের আইন [Law of Thermal Radiation] থেকে তারাটির উপরিস্থ তাপমাত্রা জানা যায়। তারার দূরত্ব জানা থাকলে এর ঔজ্জ্বল্যতা বের করা যাবে। আর ঔজ্জ্বল্যতা বা লিউমিনোসিটি [luminosity] যেহেতু বস্তুর মধ্য হতে প্রতি ইউনিট ক্ষেত্র থেকে নির্গত এনার্জি ও মোট সারফেস ক্ষেত্রফলের গুণফল- তাই এ থেকেই আমরা তারাটির ব্যাস বের করতে সক্ষম হবো।

তারার ইলেকট্রম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে আমরা উচ্চ রিজোলুশন দ্বারা গবেষণা করলে অনেক কালো লাইন দেখতে পাই। এসব লাইন এমনিতেই আত্মপ্রকাশ করে না- বাস্তবে প্রতিটি লাইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে একেকটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তারার উপরিভাগ ও অভ্যন্তরের তাপমাত্রার তারতম্য থেকে এগুলোর জন্ম। উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত কম গরম এটমগুলো নীচের বেশী গরম এটম থেকে নির্গত আলোকে চুষে নেওয়ার ফলে এসব লাইন স্পেকট্রামে আত্মপ্রকাশ করে। এখন, এই লাইনগুলো গবেষণা করে বুঝা যাবে কোন্ কোন্ পদার্থের এটম এরূপ করে। কারণ, আমরা সহজেই গবেষণাগারে অনুরূপ স্পেকট্রাম তৈরী করে দেখতে পারি কোন্ এটম এই কাজের জন্য দায়ী। সুতরাং স্পেকট্রামের লাইনই আমাদেরকে বলে দিচ্ছে ঐ দূরবর্তী তারাটি কিসব পদার্থের তৈরী।

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অধিকাংশ তারাকে ‘Main Sequence’ বা মূল পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। এসব তারার মধ্যে তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যতার সম্পর্ক হলো ম্যাস বা বস্তুর মাত্রার মধ্যে। বস্তু যতো বেশী হবে তারাটির তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যতা আনুপাতিক হারে বেশী বলেই দেখা যায়। কোনো কোন তারা আছে যাদের মধ্য থেকে উজ্জ্বল আলো নির্গত হয়- এগুলো তাপমাত্রায় সমান হলেও সাইজে অনেক বড়ো। এগুলো আসলে মেইন-সিকুয়েন্সের বাইরে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এসব অতিরিক্ত মোটা তারার নামকরণ করেছেন, ‘Red Giant’ বা লাল দানব! অপরদিকে আরো অনেক তারা আছে যেগুলো আয়তনে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট্ট কিন্তু তাপমাত্রা সমান। এদের নামকরণ করা হয়েছে, ‘White Dwarf’ ও ‘Neutron Star’। হুয়াইট ডোর্ফকে আমরা বাংলায় ‘সাদা বামন’ ও নিউট্রন স্টারকে ‘নিউট্রন তারা’ বলতে পারি। সাদা বামনদের আয়তন সূর্যের তুলনায় মাত্র ১ শতাংশ, আর নিউট্রন তারার আয়তন সূর্যের তুলনায় ০.০০১ শতাংশ মাত্র।

মহাকাশে আরো অনেক তারা আছে যেগুলোকে ইরহধৎু ঝঃধৎ বলে। বাংলায় ‘জোড়া তারা’ বলা যায়। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো একে অন্যকে খুব দ্রুত থেকে ধীর

গতিতে প্রদক্ষিণ করা। অনেকে মনে করেন মহাকাশে দৃশ্যমান সিকি শতাংশ তারাই মূলত বাইনারি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। এ্যাস্ট্রফিজিক্সে এসব জোড়া তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। এর কারণ হলো, জোড়া তারা থেকে যেসব তথ্যাদি পাওয়া যায় তা অন্য কোনো একক তারা থেকে পাওয়া যায় না। যেমন তারার ভর বা বস্তুমাত্রা।

বাইনারি তারাদেরকে চারটি ক্যাটাগোরিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো:

১. দৃশ্যমান বাইনারি সিস্টেম। 'সিগনাস' [Cygnus] নামক নক্ষত্রপুঞ্জ বা কন্সটেলেশনে আল-বিরিও নামক একটি জোড়া তারা সিস্টেম আছে। এটা দৃশ্যমান বাইনারি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত।

২. কোনো কোন সময় জোড়া তারার একটি দৃশ্যমান হলেও অপরটি অদৃশ্য থাকে। তবে দৃশ্যমান তারাটির প্রদক্ষিণপথ আঁকাবাঁকা দেখায় তাই বুঝাই যায় এটা অপর অদৃশ্য তারার প্রভাবে এমনটি করে। এরূপ জোড়া তারা সিস্টেমকে বলে 'Astrometric Binary System'।

৩. অনেক বাইনারি সিস্টেম ধরা পড়ে উভয় তারার স্পেকট্রাম গবেষণার মাধ্যমে। পুনঃপুন নির্দিষ্ট গতিবিধি থেকে বুঝা যায় যে তারার একটি পৃথিবীর দিকে আসে আর অপরটি দূরে সরে যায়। যে উপায়ে স্পেকট্রাম গবেষণার মাধ্যমে গতির মধ্যে এই তারতম্য ধরা পড়ে তার নাম হলো 'Doppler Effect'। আমরা অধ্যায়ের শেষের দিকে থিওরির উপর আলোচনাকালে এই ইফেক্টটি কী তা বুঝিয়ে বলবো। এরূপ জোড়া তারা সিস্টেমকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'Spectroscopic Binary System' বলে।

৪. চতুর্থ ধরনের বাইনারি সিস্টেমকে বলে ''Eclipsing Binary System'। এর অর্থ হলো উভয় তারার অবস্থান এমন যে, আমাদের পৃথিবী থেকে ওগুলো দেখতে মনে হয় একে অন্যকে আড়াল করে রেখেছে। সুতরাং তারাগুলো একে অন্যের সামন দিয়ে চলে যায় [যেমনিভাবে সূর্যের সামন দিয়ে চন্দ্র চলে যায়- এবং সূর্যগ্রহণ ঘটায়, আর এভাবে গ্রহণকেই বলে এক্লিপ্স [eclipse]]।

আরেক ধরনের জোড়া তারা আছে কিন্তু ওগুলো সত্যিকার অর্থে বাইনারি নয়। উভয় তারা আসলে একে অন্য থেকে বিরাট দূরত্বে অবস্থান করে ঘূর্ণমান আছে।

পৃথিবী থেকে দৃশ্যতঃ মনে হয়ে তারা একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলোকে বিজ্ঞানীরা ''Optical Double' বলেন। এর কারণ হলো বিষয়টি মহাকাশে আমাদের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। 'আরসা মেজর' [Ursa Major] নামক নক্ষত্রপুঞ্জে এরূপ একটি অপটিক্যাল ডাবল তারা সিস্টেম আছে যার নাম 'মিজার'।

আমরা তারাদের নিয়ে আলোচনায় বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো। তবে তারা নিয়ে গবেষণায় এ্যাস্ট্রফিজিক্স আরোও অনেক ব্যাপারে অনুসন্ধান করে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে, তারকার অভ্যন্তরীণ অবস্থার থিওরিটিক্যাল মডেল সৃষ্টি, প্লানেটারী নেব্যুলা [Planetary Nebula] নামক সিস্টেমের কারণ, নিউট্রন স্টার [Neutron Star] ও ব্ল্যাক হোল [Black Hole] কিভাবে জন্ম নেয়, নোবা [Nova- বিস্ফোরণ] ও সুপারনোবা [Supernova- বিরাট বিস্ফোরণ] কেনো হয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ্যাস্ট্রফিজিক্যাল যন্ত্রাদি ও পরীক্ষার উপায়-উপকরণ

মহাকাশ বিজ্ঞানের মূল শাখা এ্যাস্ট্রফিজিক্স। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি কিভাবে এ্যাস্ট্রফিজিসিস্টরা তারা, গ্যালাক্সি ইত্যাদি গবেষণা করতে যেয়ে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও যন্ত্রাদি কাজে লাগিয়ে থাকেন। এ মুহূর্তে আমাদের কথা ছিলো "সোলার সিস্টেম বা সৌরজগৎ"- এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া। তবে এর পূর্বে উক্ত যন্ত্রাদি ও উপায়-উপকরণ এবং পদ্ধতির উপর কিছু ব্যাখ্যামূলক তথ্য পাঠকদের সুবিধার্থে বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। এগুলো জানা হয়ে গেলে পরবর্তীতে বর্ণিত বিষয়াদি বুঝা ও অনুধাবন অনেকটা সহজ হবে। আর বিশেষ করে জিজ্ঞাসু মনের প্রশ্ন 'এসব ব্যাপার তারা জানলো কি করে?' - এটির সঠিক জবাবও পাওয়া যাবে।

স্পেকট্রোস্কোপি: আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, মহাকাশে দূর-দূরান্তে অবস্থিত তারা ও গ্যালাক্সি থেকে আগত ইলেকট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গ পরীক্ষার মাধ্যমে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ঐ সূত্র সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারেন। এই বিকিরণ পরীক্ষা করার পদ্ধতিকে বলে স্পেকট্রোস্কোপি। প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃশ্যমান আলোসহ

বিভিন্ন বিকিরণ নির্গত হয়ে আলোকের গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে যদি বস্তুর মধ্যে এনার্জি বিদ্যমান থাকে। যেমন আমাদের সূর্য একটি তারা। তার ভেতর আনবিক স্কেলে বিস্ফোরণ ঘটছে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ফিউশন [Fusion] প্রতিক্রিয়া বলে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে সূর্য থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যম বা এনার্জি বিকিরণ হচ্ছে। এর একটি আমাদের সবার দৃষ্টিগোচর হয়। সেটা হলো সূর্যালোক। কিন্তু এই সূর্যালোক মোটেই 'সাদা' আলো নয়। মূলত সাতটি রঙের সমষ্টি হলো সূর্যের আলো। একখণ্ড ত্রিফলা কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো চলে গেলে অপরদিকে ঐ সাতটি রঙ বেরিয়ে আসে। এভাবে কোনো বিকিরণ [আর আলোকরশ্মিও মূলত এক ধরনের বিকিরণ] যখন আলাদা করা হয় তখন এটাকে বলে, ঐ সূত্রের 'স্পেকট্রাম' [Spectrum]।

স্পেকট্রাম আসলে অনেক তথ্য লুকিয়ে রাখে- যা গবেষণা করা হয় স্পেকট্রোস্কোপির [Spectroscopy] মাধ্যমে। এটা আবিষ্কৃত হয়েছে যে, প্রতিটি রসায়নিক পদার্থের নিজস্ব গুণাবলীসম্পন্ন আলাদা স্পেকট্রাম আছে। সুতরাং যে কোনো সূত্র থেকে আগত রশ্মির স্পেকট্রাম গবেষণা দ্বারা ঐ সূত্রটি কি কি রসায়ন পদার্থ দ্বারা গঠিত তা নির্ণয় সম্ভব। যে যন্ত্রের মাধ্যমে এই গবেষণা হয় তাকে বলে 'স্পেকট্রোমিটার' [Spectrometer]। নীচের চিত্রে এরূপ যন্ত্রের মৌলিক প্রিন্সিপাল তুলে ধরা হয়েছে।
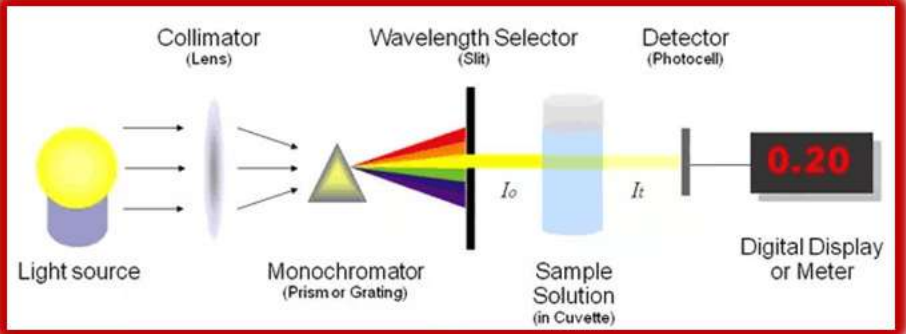
স্পেকট্রাম গবেষণা: সাধারণ আলো নির্গত ও চুষে যাওয়ার মূলে যে জিনিসটি কাজ করে তাহলো অতি ক্ষুদ্রকায় ইউনিট যার নাম 'ফোটন' [Photon]। একক একটিমাত্র ফোটনে যে পরিমাণ এনার্জি [Energy] থাকে তা তার তরঙ্গমাত্রার [Frequency] সঙ্গে সরাসরি আনুপাতিক ও উল্টোভাবে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যরে [Wavelength] সাথেও আনুপাতিক। সুতরাং আমরা যদি এনার্জিকে E, তরঙ্গমাত্রাকে f, এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে λ (λ = লামদা) দ্বারা চিহ্নিত করে নিই তাহলে ফোটন এনার্জির সমীকরণ দাঁড়ায়: $E = nf = nc/\lambda$

উপরোক্ত সমীকরণে n হলো প্লাংক কন্সটেন্ট [Planck Constant -এটা একটি অপরিবর্তনীয় রাশি] এবং c হচ্ছে আলোকের গতি [Velocity of Light]। সুতরাং আমরা কোনো এটম বা মলিকিউলে আলোকরশ্মি পতিত করে কিংবা এ থেকে আলো সৃষ্টি করে ফোটন গবেষণার মাধ্যমে ঐ এটম বা মলিকিউল সম্পর্কে অনেক তথ্য বের করতে পারি- কারণ ভিন্ন পদার্থ আলো বিকিরণ ও চুষে নেওয়ার ক্ষেত্রে আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে থাকে।

সূর্যের স্পেকট্রাম: আমরা যদি সূর্যের স্পেকট্রাম নিয়ে গবেষণা চালাই তাহলে অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে পারি। পূর্বের পৃষ্ঠার ছবিতে সূর্যের স্পেকট্রাম দেখা যাচ্ছে। এ থেকে আমরা বিভিন্ন স্পেকট্রাম রেখা কোন্ দ্রব্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা জানতে পারি।

পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে এই ভয়ে অতিরিক্ত আর কিছু বলার ইচ্ছে রাখি না- কিন্তু মহাকাশবিজ্ঞানে স্পেকট্রোস্কোপির গুরুত্ব এতো বেশি যে, বাধ্য হয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করছি।

আমরা সবাই সোডিয়াম বাতি রাস্তায় রাস্তায় দেখেছি। সোডিয়াম গ্যাস টিউবে যখন জ্বলে উঠে তখন এ থেকে হলদে রঙের আলো নির্গত হয়- কিন্তু কেন? হলদে রঙ কেন?। এছাড়া নিওন বাতিও আমরা দেখেছি। এ থেকে বেরিয়ে আসে লাল রঙের আলো। আরেক ধরনের বাতি আছে যাকে বলে মারকারি বাতি। এটা থেকে বেরিয়ে আসে নীল রঙের আলো। এসব বাতির মধ্য থেকে বিভিন্ন রঙের আলো বেরিয়ে আসার কারণ হলো তাদের এটম ও মলিকিউলের গঠনে ভিন্নতা। প্রতিটি বাতির গ্যাস তার স্পেকট্রামে রেখা দেখিয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস¡রূপ সোডিয়ামের হলুদ রঙ ৫৮৯.০ নানোমিটার ও ৫৮৯.৬ নানোমিটার দৈর্ঘ্য দু'টি রেখা থেকে সৃষ্টি হয়। যদি এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য না হয়ে অন্যত্র রেখাগুলো আত্মপ্রকাশ করতো তাহলে রঙও ভিন্ন হতো। মোটকথা বস্তুর এটম ও মলিকিউল থেকে নির্গত আলো নিজের পদার্থের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। এসব রঙ স্পেকট্রামে বিভিন্ন রেখা অঙ্কন করে যা থেকে বস্তুটি কি তা সহজে নির্ণয় করা যায়।

স্পেকট্রোস্কোপির ব্যবহার: আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি স্পেকট্রোস্কোপি অর্থ কি। এবার জেনে নেবো কিভাবে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এটা কাজে লাগিয়ে থাকেন। একটি স্পেকট্রোস্কোপ আলোকরশ্মির সূত্র থেকে কতটুকু দূরে আছে তা খুব একটা আসে যায় না। এ কারণেই সূর্যের অভ্যন্তরস্থ বস্তু সম্পর্কে আমরা গবেষণা করতে পারি। এমনকি সুদূর মহাকাশে মিটুমিটুভাবে জ্বলন্ত কোটি কোটি তারার আলোকরশ্মি নিয়েও আমরা স্পেকটোস্কোপির মাধ্যমে গবেষণা করতে সক্ষম।

সূর্যের আলো নিয়ে গবেষণাকে বলে ‘স্পেকট্রোহিলিওগ্রাফ’ [Spectroheliograph]। সূর্যের প্রধান পদার্থের নাম হাইড্রোজেন এবং দ্বিতীয় স্থানে আছে হিলিয়াম। পৃথিবীর কোথাও তখন হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয় নি, যখন সূর্যালোক গবেষণা করে হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছিল। সম্প্রতি সূর্যের মধ্যে হাইড্রোজেনের নেগিটিভ আয়ন [Negative Ion - বৈদ্যুতিকভাবে ঋণাত্মক চার্জসম্পন্ন পরমাণু] থাকার সম্ভাবনা স্পেকট্রোহিলিওগ্রাফের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

সৌরজগতের একটি চিত্তাকর্ষক গ্রহ শনি। শনির মধ্যে খুব সুন্দর রিং সিস্টেম আছে। এই রিং সিস্টেম থেকে আগত আলোকরশ্মিকে স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে গবেষণা করে জানা গেছে যে, এর অধিকাংশ বস্তু ‘এ্যামোনিয়া বরফ’।

গত জুলাই ১৯৯৪ সালে এক বিরাট এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ঘটনা ঘটে গেল। শুমেকার-লেভি নামক একটি কমেট [comet] বা ধূমকেতু খুব দ্রুত বেগে সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ জুপিটারের উপর পতিত হয়। জুপিটারের বায়ুমণ্ডল ও উপরিভাগের পদার্থ সনাক্তকরণে বিজ্ঞানীরা স্পেকট্রোস্কোপি ব্যবহার করেছিলেন। ধূমকেতুটি পতিত হওয়ার সময় প্রচণ্ড বেগে গ্রহের অনেক বস্তু মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাটির চিত্র টেলিস্কোপের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

ডপলার শিফট [Doppler Shift]

পর্যবেক্ষক ও বিকিরণ সূত্রের মধ্যে যখন গতি বিদ্যমান থাকে তখন স্পেকট্রামের রেখাগুলোর মধ্যে স্থান-পরিবর্তন বা শিফ্ট সৃষ্টি হয়। স্থান-পরিবর্তন লালের দিকে না নীলের দিকে হবে তা নির্ভর করে সূত্রটি পর্যবেক্ষক থেকে সরে যাচ্ছে না কাছে আসছে। কাছে আসলে নীল-শিফ্ট করবে আর দূরে গেলে লাল-শিফ্ট হবে। এই ব্যাপারটি অস্ট্রিয়ান গাণিতিক ক্রিস্টিয়ান ডপলার আবিষ্কার করেছিলেন, তাই তারই নামানুসারে এটাকে ‘ডপলার ইফেক্ট’ বা ‘ডপলার শিফ্ট’ বলা হয়। কি

পরিমাণ শিফ্ট হচ্ছে তা থেকে সূত্রের গতিও নির্ণয় করা যায়। এই মুহূর্তে ব্যাপারটি আরো বুঝিয়ে বলা জরুরী মনে করছি।
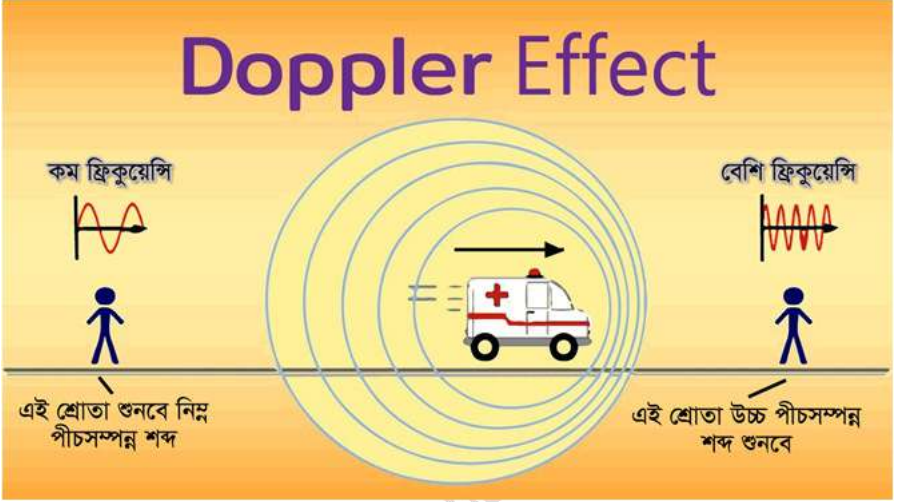
ডপলার ইফেক্ট গতি ছাড়াও শব্দ তরঙ্গের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। উপরের চিত্রে একটি গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ-তরঙ্গ অঙ্কিত হয়েছে। এতে দেখাই যাচ্ছে শ্রোতার দিকে দ্রুত ধেয়ে আসার ফলে সামনের তরঙ্গে পেছনের তরঙ্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত তরঙ্গ-গতি অনেকটা বেশী দেখাচ্ছে। এতে শ্রোতা উচ্চ পীচের শব্দ শোনতে পায়। কিন্তু গাড়িটি তার নিকট থেকে দূরে সরে যাওয়ার সময় শব্দের তরঙ্গ-গতি কম হওয়ায় তার পীচও কমে যায়। একইভাবে দূরের তারা বা গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোকরশ্মির মধ্যে এই তারতম্য পরিলক্ষিত হবে যদি সূত্রটি পৃথিবী থেকে দ্রুত দূরে সরে যায় কিংবা কাছে আসতে থাকে।

আমাদের মহাবিশ্ব দিন দিন বর্ধিত হওয়ার প্রধান প্রমাণই হলো এই ডপলার ইফেক্ট। অধিকাংশ গ্যালাক্সির আলোকরশ্মি স্পেকট্রোগ্রাফের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা গেছে লাল-শিফ্ট ঘটছে। আর ডপলার ইফেক্ট অনুযায়ী লালের দিকে সরে যাওয়ার অর্থই হলো সূত্রটি দূরে সরে যাচ্ছে। পর্যবেক্ষক থেকে শব্দ কিংবা

আলোকরশ্মি বিকিরণের সূত্র দূরে সরে গেলে লাল-শিফ্ট আর কাছে আসতে থাকলে নীল-শিফ্ট হয়- এই ব্যাপারটির নামই হলো ডপলার ইফেক্ট।

বিভিন্ন ধরনের টেলিস্কোপ

উপরে বর্ণিত ইলেকট্রম্যাগনেটিক রেডিয়েশনকে 'দেখার' জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ যন্ত্রের। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা যে যন্ত্রের মাধ্যমে এই কাজ আঞ্জাম দেন তার নাম হলো টেলিস্কোপ। পাঠকদের সবাই দূরবীক্ষণ যন্ত্র কি জিনিস তা জানেন। এরপরও আমি বেশ কয়েকটি এরূপ যন্ত্রের মৌলিক প্রযুক্তি এখানে বর্ণনা করতে ইচ্ছুক। কিভাবে আধুনিক রিফ্লেক্টিং [Reflecting], রিফ্রেকটিং [Refracting], রেডিও [Radio], এক্স-রে [X-Ray] আর গামা-রে [Gamma-Ray] টেলিস্কোপ কাজ করে তা আমাদের জেনে নিলে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাজ সম্পর্কে ধারণা অনেকটা পেয়ে যাবো।

আজকের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মূলত ৬ ধরনের টেলিস্কোপ ব্যবহার করে আকাশের অসংখ্য, তারা, তারা ক্লাস্টার, গ্যালাক্সি ও সৌর-জগতের গ্রহ-উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এই অর্ধ-ডজেন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একেকটির বৈশিষ্ট্য একেক ধরনের। কোনো বিশেষ গবেষণায় কোনটি কাজে লাগানো হবে তা নির্ভর

করে গবেষণার ধরন ও উদ্দেশ্যের উপর। আমরা একে একে এই ৬টি দূরবীক্ষণযন্ত্রের প্রযুক্তি ও ব্যবহার নিয়ে এখন আলোচনা করবো।

অপটিক্যাল [আলোক] দূরবীক্ষণযন্ত্র

বুঝাই যাচ্ছে এই যন্ত্রের কাজ হলো দূরের বস্তুকে 'কাছে এনে' বড় আকারে পরিবর্তন করে দেখা। আলোক দূরবীক্ষণযন্ত্র মূলত দু' ধরনের হয়ে থাকে: রিফ্রেক্টিং [refracting] ও রিফ্লেক্টিং [reflecting]। এই উভয় শব্দ প্রায় একই মনে হলেও বাস্তবে এদের মধ্যে মৌলিক তফাৎ আছে। প্রথমটির মূলে আছে দৃশ্য বড়করণের জন্য লেন্স আর দ্বিতীয়টি এই একই উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করে বক্র আরশি।
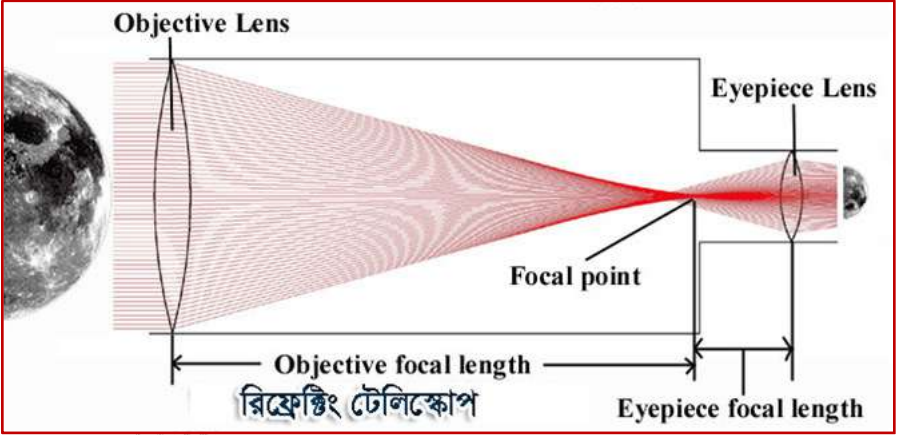
উপরের চিত্রে আমরা রিফ্রেক্টিং টেলিস্কোপের মৌলিক প্রযুক্তি অঙ্কন করেছি। লক্ষ করুন, দু'টি আলাদা লেন্স ব্যবহৃত হয়েছে। বড় অবজেক্টিভ লেন্সের মধ্য দিয়ে বস্তু থেকে আগত আলো ঢুকে আই-পিস লেন্সে পতিত হয়। লেন্সের মাপজোখ অনুযায়ী বস্তুটি আই-পিসে বড় দেখাবে। জানা থাকা দরকার যে, এই অতি সাধারণভাবে অঙ্কিত দূরবীক্ষণযন্ত্রের আই-পিসে বস্তুর ছবিটি উল্টো অবস্থায় দেখাবে। অপর আরেকটি লেন্স দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা যায়। তৃতীয় লেন্স দিয়ে দৃশ্যটি আবার পাল্টিয়ে সঠিক করা হয়।
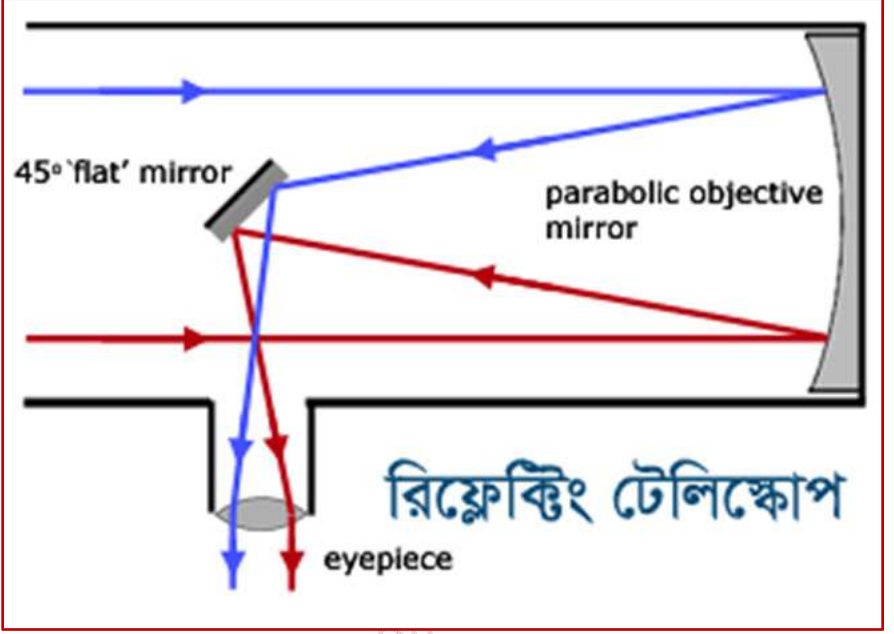
এবার উপরোক্ত দ্বিতীয় চিত্রটি দেখুন। এতে অঙ্কিত হয়েছে অতি সাধারণ একটি রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ। আগেই বলেছি এরূপ যন্ত্রের মূল বস্তু হলো একটি বক্র আরশি। বস্তু থেকে আলো ঐ আরশিতে পতিত হয়। এতে বস্তুটির ছবির আয়তন অনেক বড় হয়ে ওঠে। এরপর এই আলো অপর একটি সাধারণ আরশির উপর পতিত হয়ে আই-পিসে গিয়ে পৌঁছে। এরূপ টেলিস্কোপ বেশ বড় আয়তনে নির্মিত হতে পারে। তবে একই কথা রিফ্রেক্টিং দূরবীক্ষণের ক্ষেত্রে সত্য নয়। আধুনিক বড় আয়তনের এরূপ রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপের মূল আরশির ব্যাস ৪০০ থেকে ৫০০ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় স্থাপিত 'পালোমার অবজারভেটরী' যে টেলিস্কোপ ব্যবহার করে তার মূল আয়নার ব্যাস ২০০ ইঞ্চি [৫০৪ সেন্টিমিটার]। চিলির লা সেরেনার নিকট অপর আরেকটি অবজারভেটরী আছে যার নাম 'ইন্টার-আমেরিকান অবজারভেটরী'। এখানকার মূল টেলিস্কোপের রিফ্লেক্টারের ব্যাস হলো

১৫৮ ইঞ্চি [৪০০ সে.মি]। রিফ্রেক্টিং ও রিফ্লেক্টিং এই উভয় ধরনের টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা শুধু পর্যবেক্ষণ করেন না, সংশ্লিষ্ট বস্তুর ছবিও তুলেন। আজকাল আর আগের মতো ক্যামেরা ফিট করে ছবি তুলতে হয় না। কম্পিউটারের মাধ্যমে 'ডিজিটেল' [Digital] ছবি ধারণ করা হয়। এভাবে ছবি তুলে ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে পরে গবেষণা করা যায়।

বেতার দূরবীক্ষণযন্ত্র

এটাকে ইংরেজীতে জধফরড় ঞবষবংপড়ঢ়ব বলে। আমরা যে তারাজগতের অধিবাসী তার নাম মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। এটা অন্যান্য কোটি কোটি গ্যালাক্সির মতো মধ্যম আয়তনের একটি 'স্পাইর‍্যাল' [Spiral] গ্যালাক্সি। কার্ল জান্সকি নামক একব্যক্তি ১৯৩১ সালে আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবোরেটরীতে কর্মরত অবস্থায়, একটি রেডিও অ্যান্টেনার মাধ্যমে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে আগত কিছু রেডিও সিগনাল সনাক্ত করেন। এ থেকে এটা প্রমাণিত হলো যে, দূরের তারা ও গ্যালাক্সি থেকে শুধুমাত্র আলোকরশ্মিই আসে না, বরং ইলেকট্রম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের বিভিন্ন ওয়েভলেন্থ থেকেও বিকিরণ হয় যার একটি হলো রেডিও তরঙ্গ। জান্সকির এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার থেকেই 'রেডিও এ্যাস্ট্রনোমি' [Radio Astronomy] নামক মহাকাশবিজ্ঞানের একটি অভিনব শাখার জন্ম হয়। এরপর শুরু হলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপনের পালা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে। এর মধ্যে নিউট্রন তারা [neutron star], পালসার [pulsar], ব্ল্যাক হোল [black hole], বাইনারি তারা [binary star] ও বিগ ব্যাং থিওরির [big bang theory] সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রমাণ 'বেগগ্রাউ রেডিয়েশন' [Background Radiation- জগতব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিকিরণ যা বিজ্ঞানীদের ধারণা সেই মহাবিস্ফোরণের স্বাক্ষর বহন করছে।] অন্যতম।

অপটিক্যাল ও রেডিও টেলিস্কোপের মধ্যে মৌলিক প্রযুক্তি প্রায় একই। তবে রেডিও দূরবীক্ষণযন্ত্রটি অবশ্যই অনেক বড় আয়তনের হতে হবে। মহাকাশের বস্তুগুলো থেকে আগত ইলেকট্রম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম পরীক্ষণ খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার।

বড়ো ডিটেক্টর ছাড়া তা উল্লেখযোগ্য হবে না। এর মূল কারণ হলো ওসব বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে খুব বেশী। রেডিও তরঙ্গের দৈর্ঘ্যরে ব্যাপ্তি সাধারণত ১ মিটার থেকে ১ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু দৃশ্যমান আলোর ক্ষেত্রে তা মাত্র ০.০০১ মিটার। বউলের মতো 'ডিসঅ্যান্টেনা' ইস্পাত ও তারের মেশ দ্বারা তৈরী করা যায়। তরঙ্গকে একটি ফোকাস বা কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। রেডিও তরঙ্গ গবেষণা অন্যান্যগুলোর তুলনায় অনেকটা সহজ ও সুবিধাজনক। এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা আকাশকে 'স্ক্যান' করা সম্ভব। কিন্তু একই জিনিস দৃশ্যমান আলোসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্ভব নয়- কারণ সূর্যের কিরণ বিরাট বাধার সৃষ্টি করে থাকে।

রেডিও ইন্টারফেরোমিটার

একাধিক রেডিও টেলিস্কোপ যখন কোনো বিশেষ দূরত্বে স্থাপিত হবে এবং সবগুলোর সিগনাল একত্রিত করে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে তখন এই সিস্টেমকে বলা হয়, রেডিও ইন্টারফেরোমিটার [Radio Interferometer]। আমেরিকার নিউ মেক্সিকো প্রদেশের সকোরো নামক এলাকায় এরূপ একটি খুব বড়ো 'এ্যারে' রেডিও ইন্টারফেরোমিটার স্থাপিত হয়েছে। এতে আছে ২৫ মিটার ব্যাসসম্পন্ন ২৭টি ডিশ অ্যান্টেনা। এগুলো তিনটি সোজা লাইনে ২১ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। নিচে এর একটি ছবি দেখুন।

রেডিও টেলিস্কোপ মহাকাশ বিজ্ঞানীদের জন্য বিরাট নিয়ামত হলেও ইদানিং পুরো বিশ্বব্যাপী মোবাইল ফোন ও রেডিও-টিভির ব্যবহার ব্যাপক আকার ধারণ করায় 'ইন্টারফেরেন্স' বা ব্যতিচার একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং মহাকাশ বিজ্ঞানীরা নিজেদের গবেষণা অব্যাহত রাখতে যেয়ে রেডিও টেলিস্কোপগুলোকে ভূ-স্থিত রেডিও তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট এসব ইন্টারফেরেন্স থেকে মুক্ত রাখতে আজকাল হিমশিম খাচ্ছেন। তবে চেষ্টা তো আর থেমে নেই- গবেষণা হচ্ছে এবং হবেই।
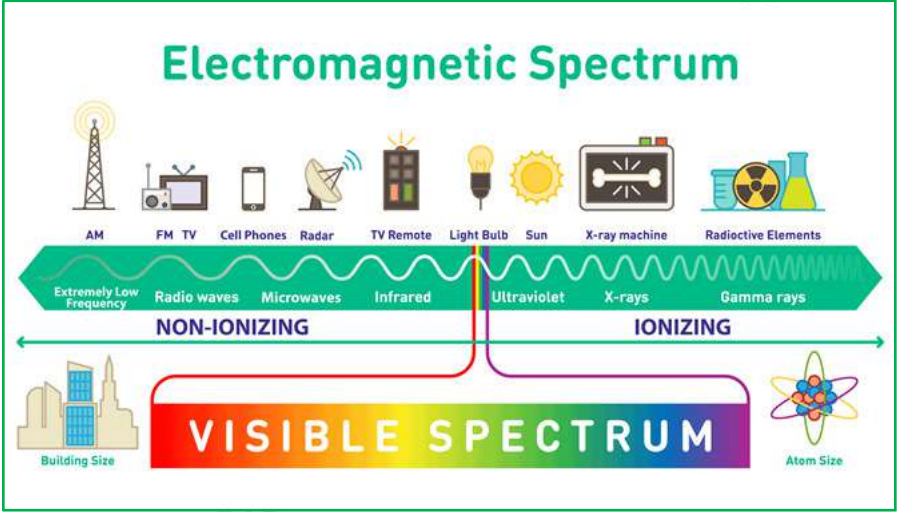
ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ

আমরা যদি ইলেকট্রম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো, 'দৃশ্যমান আলো' ছাড়াও অনেক রেডিয়েশন এতে আছে যা আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। উপরের চিত্রে আমরা পুরো স্পেকট্রামটি তুলে ধরেছি।

দৃশ্যমান আলোর বামে আমরা ইনফ্রারেড ফ্রিকুয়েন্সি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দৃষ্টির বাইরে এই ফ্রিকুয়েন্সির তরঙ্গের দৈর্ঘ্যরে ব্যাপ্তি $১০^{-৬}$ থেকে $১০^{-৩}$ মাত্র। এই তেজস্ক্রিয়া বস্তুর মধ্যস্থ তাপশক্তি থেকে বের হয়ে থাকে। সুতরাং অন্ধকার রাতে দেহের মধ্যে তাপ আছে এমন কোনো জন্তুকে বিশেষ ইনফ্রারেড ক্যামেরার মাধ্যমে

দেখা সম্ভব। এরূপ ক্যামেরা আজকাল চোর ধরা থেকে নৈশযুদ্ধ পরিচালনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইনফ্রারেড তেজস্ক্রিয়া দূরবর্তী তারা ও গ্যালাক্সি থেকেও নির্গত হয়। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই বিকিরণকে তেমন বেশী রদবদল করতে পারে না। সুতরাং যেসব তারা, তারা ক্লাস্টার, নেব্যুলা ও গ্যালাক্সি সাধারণ আলোর মাধ্যমে দেখা যায় না ওগুলো ইনফ্রারেড রেডিয়েশনের মাধ্যমে 'দেখা' সম্ভব। বিজ্ঞানীরা ইনফ্রারেড টেলিস্কোপের মাধ্যমে দূর মহাকাশে তারার জন্ম বৃত্তান্ত থেকে আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলোর অবস্থা এবং বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারছেন। ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে স্থাপিত হলে ভালো হয়। এতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা ব্যাঘাত কম হবে। সর্বাপেক্ষা ভালো ব্যবস্থা হলো মহাকাশে এরূপ টেলিস্কোপ স্থাপন। আর ইতোমধ্যে মহাকাশে ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ স্থাপিত হয়েছেও এবং দীর্ঘ ৩ বছর সার্ভিস শেষে এটা ১৯৯৮ সালে কাজ সমাপ্ত করেছে। 'ইনফ্রারেড স্পেইস অবজারভেটরী' নামক এই কৃত্রিম উপগ্রহ ইউরোপিয়ান স্পেইস এজেন্সি ১৯৯৫ সালে মহাকাশে প্রেরণ করে। এই অবজারভেটরীর প্রধান যন্ত্র ছিলো একটি ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ। নিচের ছবিতে আমরা অনুরূপ একটি ইনফ্রারেড টেলিস্কোপের অঙ্কিত চিত্র দেখতে পাচ্ছি। এতে যন্ত্রটির মৌলিক ডিজাইন ও কার্যকারিতা তুলে ধরা হয়েছে।

দেখাই যাচ্ছে অপটিক্যাল টেলিস্কোপের তুলনায় মৌলিক ডিজাইন খুব একটা ভিন্ন নয়। তবে ফোকাসে একটি যন্ত্র আছে যা একমাত্র ইনফ্রারেড রেডিয়েশন সংগ্রহ করে। ইনফ্রারেড রেডিয়েশন থেকে তাপ সৃষ্টি হয়। তাই সিগনাল ছাড়াও টেলিস্কোপের যন্ত্রাদি ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট তাপ আসলটির সাথে মিশে ভুল তথ্য দিতে পারে। এ কারণেই মহাকাশে এরূপ টেলিস্কোপ স্থাপন অনেকটা নিরাপদ।

আলট্রাভাইলেট টেলিস্কোপ

চতুর্থ ধরনের 'ইলেকট্রম্যাগনেটিক' দূরবীক্ষণযন্ত্রের নাম হলো 'আলট্রাভাইলেট টেলিস্কোপ' [Ultraviolet Telescope]। ৮৫ পৃষ্ঠার চিত্রে অঙ্কিত স্পেকট্রামের 'আলট্রাভাইলেট' এলাকায় যেসব বিকিরণ হয় সেটা পরীক্ষার জন্য এই টেলিস্কোপের উদ্ভাবন। মহাবিশ্বের এমন কিছু এলাকা বা বস্তু আছে যা অত্যন্ত গরম। এসব এলাকা একমাত্র আলট্রাভাইলেট লাইট দ্বারা 'দেখা' সম্ভব। কিন্তু এসব আলো আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আটকে রাখে- মূলত এটা আমাদেরই নিরাপত্তা হেতু। সুতরাং আলট্রাভাইলেট রশ্মিকে স্ট্যাডি করার স্থান এই পৃথিবীর উপর নয়- মহাকাশে। তাই গেল শতকের আশি ও নব্বুই দশকে একাধিক আলট্রাভাইলেট স্পেইস অবজারভেটরী স্থাপিত হয়। এগুলো মহাবিশ্বের আলট্রাভাইলেট জগৎ নিয়ে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় একাধিক স্পেইস অবজারভেটরী স্থাপিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'ইন্টারনেশন্যাল আলট্রাভাইলেট এক্সপ্লোরার' [IUE], 'এক্সট্রিম আলট্রাভাইলেট এক্সপ্লোরার' [EUVE], 'এ্যাস্ট্র স্পেইস শাটল অবজারভেটরী' এবং 'হাব্ল স্পেইস টেলিস্কোপ' [HST] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলট্রাভাইলেট টেলিস্কোপ অপটিক্যাল রিফ্লেক্টিং যন্ত্রের মতোই। তবে তাদের আয়নাগুলোর মধ্যে বিশেষ বস্তুর লেপ আছে যার ফলে শুধুমাত্র আলট্রাভাইলেট আলো এগুলো প্রতিবিম্ব করে। আলট্রাভাইলেট টেলিস্কোপ থেকে আমরা আন্তঃতারা মহাকাশের গ্যাস, অতি নবীন তারা এবং এক্টিভ গ্যালাক্সির মধ্যে গ্যাসীয় এলাকা গবেষণা করতে পারি।

এক্স-রে টেলিস্কোপ

মহাকাশে অনেক উদ্যমী বস্তু আছে। এসব এনার্জিসম্পন্ন বস্তু থেকে কি পরিমাণ এক্স-রে সিগনাল আসে তা আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছেন। তারপর এসব এক্স-রে কিভাবে ধারণ করা যায় সে চিন্তা শুরু হলো এবং ১৯৬০ দশকে এক্স-রে টেলিস্কোপ জন্ম নিলো। সাধারণত মহাকাশে প্রদক্ষিণরত অবস্থায় এসব টেলিস্কোপ স্থাপন করতে হয়। গেল শতকের সত্তুর দশকে 'ইউএস এক্সপ্লোরার ৪২' নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহে সর্বপ্রথম মহাকাশ এক্স-রে টেলিস্কোপ স্থাপিত হয়েছিল। এই উপগ্রহ এক্স-রে টেলিস্কোপ দ্বারা পুরো আকাশের ম্যাপ তৈরী করা হয়। ১৯৯৯ সালে আরো দু'টি এক্স-রে টেলিস্কোপ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা এজেন্সি নাসা [National Aeronautics and Space Administration - NASA] কর্তৃক একটি- যার নামকরণ করা হয় ভারতীয়-আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের নামানুসারে, 'চন্দ্র এক্স-রে

অবজারভেটরি' এবং ইএসএ [European Space Agency] কর্তৃক অপরটি- যার নাম, এক্স-রে মাল্টিমিরর মিশন [XMM] প্রেরিত হয়।

গামা-রে টেলিস্কোপ

ষষ্ঠ ধরনের দূরবীক্ষণযন্ত্রের নাম গামা-রে টেলিস্কোপ। নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে এটা কোন্ রশ্মিকে রেকর্ড করে। ইলেকট্রম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে দৃশ্যমান আলো ও এক্স-রে থেকেও স্বল্প-দৈর্ঘ্য তরঙ্গসম্পন্ন রশ্মিকে বলে গামা-রে। মহাজগতের কিছু কিছু স্থান আছে যেখানে কল্পনাতীত ঘটনাবলী ঘটছে। সেসব স্থানে এক তারা অপরটির সঙ্গে মিলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে কিংবা গ্যালাক্সি-গ্যালাক্সির মধ্যে বিস্ফোরণ হচ্ছে। এসব বস্তু, নিউট্রন তারা এবং ব্ল্যাক হোল থেকে বিরাট ক্ষমতাসম্পন্ন গামা-রে মহাকাশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে আসার পর একে ধরে এ থেকে ঐসব বিস্ফোরণে পতিত

বস্তু সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে এসব ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর উপর পৌঁছতে পারে না। সুতরাং এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল বস্তু থেকে আগত গামা-রশ্মি গবেষণা মহাকাশে স্থাপিত যন্ত্রাদি ছাড়া অন্যত্র সম্ভব নয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গামা-রশ্মি গবেষণার জন্য বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে গামা-রে টেলিস্কোপ তৈরী করেছেন। এখানে এই বিশিষ্ট দূরবীক্ষণযন্ত্রের মৌলিক ডিজাইনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।
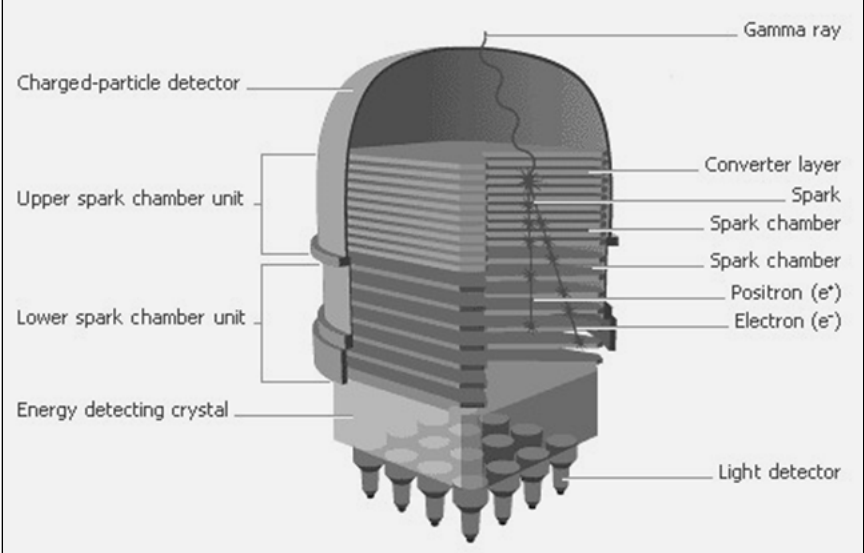
গত শতকের নব্বই দশকের শুরুতে মহাকাশে স্থাপিত ‘কম্পটন গামা-রে অবজারভেটরি’ [CRO] থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পুরো মহাকাশের চতুর্দিকে প্রায়ই একই রেইটে গামা-রে ছড়িয়ে আছে। এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, প্রত্যেক গ্যালাক্সির মধ্যে এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রশ্মি সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ, ইতোমধ্যে এটাও জানা গেছে যে, পুরো মহাবিশ্বব্যাপী কোটি কোটি গ্যালাক্সিও এরূপ সমভাবে বিস্তৃত।

অবজারভেটরি: এ্যাস্ট্রফিজিক্যাল যন্ত্রাদি ও উপায়-উপকরণ সম্পর্কে আমাদের এই তথ্যানুসন্ধানের শেষের দিকে এসে ‘অবজারভেটরি’ [Observatory] বলতে

কি বুঝায় তার কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। অবজারভেটরির বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার কিছু অবজেকশন আছে। অবজার্ভ অর্থ পর্যবেক্ষণ। আর যেখানে অবজার্ভ করা হয় সেই গৃহকে বলে অবজারভেটরি। সুতরাং বাংলায় কোন্ যুক্তিতে এটিকে 'মানমন্দির' বলা হবে? আমরা এটাকে অবশ্যই মানমন্দির বলবো না- বলবো, মহাকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্র বা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণকেন্দ্র।

পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের ইতিহাস অতি পুরাতন। টেলিস্কোপ ও অন্যান্য মহাকাশ যন্ত্রাদির আবির্ভাব অনেক পরের ব্যাপার হলেও ৫ হাজার বছর পূর্বে ইরাকের ব্যাবিলনে সর্বপ্রথম 'মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছিল বলে প্রমাণ মিলে। এরপর অন্যান্য পুরাতন সভ্যতার লীলাভূমি যেমন, মিশর, চীন, ভারত ইত্যাদি অঞ্চলেও পর্যবেক্ষণকেন্দ্র নির্মাণ করে তখনকার মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আকাশের তারাগুলোর উপর গবেষণা করেছেন।

যা হোক আজকের পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনকি মহাকাশেও গড়ে উঠেছে বহু ধরনের পর্যবেক্ষণকেন্দ্র। সাধারণত ইতোমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণযন্ত্রই হলো একটি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের মৌলিক যন্ত্র। এই যন্ত্রের মাধ্যমে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু থেকে আগত আলোকরশ্মিসহ পুরো

ইলেকট্রম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের উপর গবেষণা করা হয়ে থাকে পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে। টেলিস্কোপ পরেও অনেক ধরনের সাহায্যকারী যন্ত্রাদিও পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে থাকতে হবে। এমন একটি আধুনিক যন্ত্র হচ্ছে কম্পিউটার।

আলহামদুলিল্লাহ! আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞান সম্পর্কে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমরা এই গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্রাদির উপর বিস্তারিত জেনে নিলাম। এখন আশা করা যায় পরবর্তীতে বর্ণিত তথ্যাদি কোত্থেকে কিভাবে আবিষ্কৃত হলো তার একটি ধারণা আমরা পেয়ে যাবো। মূলত মহাকাশবিজ্ঞান অনেকটাই নির্ভর করে উপরে বর্ণিত যন্ত্রাদি বিশেষকরে টেলিস্কোপের উপর। পর্যবেক্ষণ এবং এর উপর ভিত্তি করে থিওরি তৈরীই হলো মহাকাশবিজ্ঞানের মৌলিক কার্যাদি। তাহলে আসুন, আমরা এবার এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য মহাবিশ্বের উপর মহাকাশবিজ্ঞানের মাধ্যমে গবেষণা দ্বারা যা কিছু তথ্যাদি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, সেসব ব্যাপার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাই।

পঞ্চম অধ্যায়

সোলার সিস্টেম বা সৌরজগৎ

আমরা এখন একটি কাল্পনিক ভ্রমণে যাচ্ছি, আর এই ভ্রমণের শুরু সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র সূর্য থেকে। তবে সৌরজগৎ বলতে কি বুঝায় তার কিছু বর্ণনা আগেই তুলে ধরা ভালো।
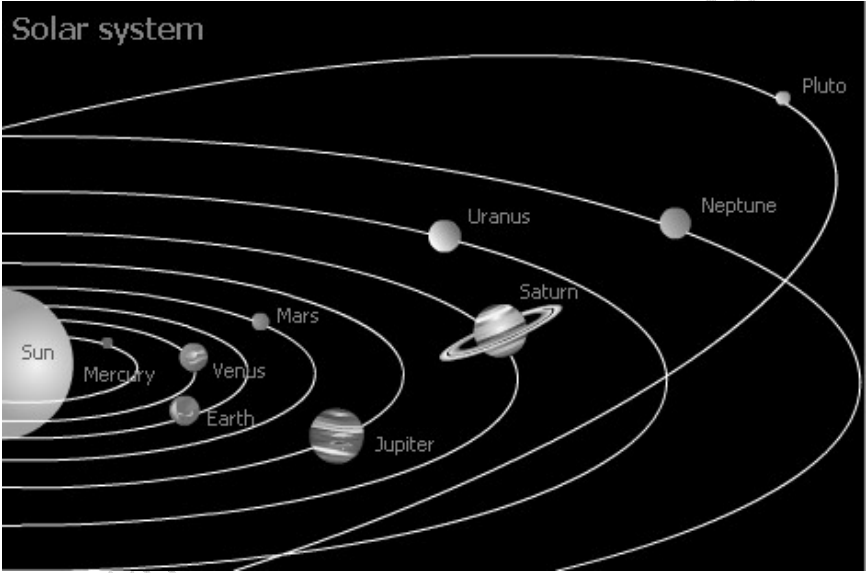
সূর্য এবং যা কিছু একে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে তা সবই সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত। সৌরজগতের মধ্যে ৯টি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ ছাড়াও আরো আছে ধূমকেতু, এ্যাস্টারোইড [গ্রহাণুপুঞ্জ], আন্তঃগ্রহ মহাকাশের গ্যাস ও ধূলো। আমাদের সৌরজগৎ ছাড়াও দূর দূরান্তে অন্য কোনো তারা [সূর্য] হয়তো আরেকটি সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র হতে পারে। একটি কেনো, শত শত কিংবা লাখ লাখ সৌরজগৎ মহাবিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে আমাদের গবেষণা 'নিশ্চিতভাবে অস্তিত্বশীল' এই সৌরজগতের উপরই সীমিত

থাকবে। ইদানিং একাধিক অন্য সৌরজগতের সন্ধান মিলেছে বলে খবরা-খবর বেরিয়েছে সত্য। কিন্তু ওসব সৌরজগৎ সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্যাদি আদৌ পাওয়া যায় নি।

সৌরজগৎ বলতে মূলত সূর্যকেই বুঝায়। এর কারণ হলো তুলনামূলকভাবে সকল গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদির মোট ভর বা ম্যাস এর ৯৯% সূর্যের মধ্যেই নিহিত। এ কারণেই সূর্যকে 'মাদার অব সোলার সিস্টেম' বলে। প্রত্যেকটি বস্তু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে জন্ম থেকেই সূর্যকে কেন্দ্র করে 'Elliptical' [ডিম্বাকৃতিক বা উপবৃত্তিক] কক্ষপথে ঘূর্ণমান আছে। মনে করুন আমরা যদি দক্ষিণ মেরু থেকে সরাসরি ঊর্ধ্বে আরোহণ করে পুরো সৌরমণ্ডলের প্রতি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহ তথা কক্ষপথে ভ্রমণকারী সকলেই বায়ে [ঘড়ির কাটা যেদিকে যায় তার বিপরীত দিকে] ঘুরছে। আমরা বলেছি কক্ষপথ মূলত ডিম্বাকৃতির। এই ডিম্বাকৃতি বা ইলিপটিক্যাল আকৃতিটি আসলে কি?
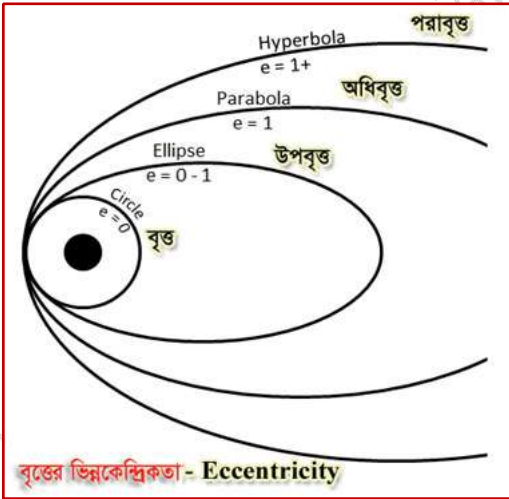
গণিতে এই আকৃতি নির্ভর করে তার 'একসেন্ট্রিসিটি' [Eccentricity] -এর উপর। একটি বৃত্তের জন্য একসেন্ট্রিসিটির মাত্রা = ০; আর প্যারাবোলার [অধিবৃত্ত] জন্য তা হলো = ১.০। এই শূন্য ও এক এর মধ্যখানে যা সংখ্যা আছে তাই হলো এলিপ্স নামক ক্ষেত্রের একসেন্ট্রিসিটি। সৌরজগতের দু'টি গ্রহের একসেন্ট্রিসিটি প্রায় বৃত্তের মতো। এগুলো হলো শুক্র ও নেপচুন। শুক্রের মাত্রা ০.০০৭ এবং নেপচুনের মাত্রা ০.০০৯। এ থেকে বুঝা গেল এই উভয় গ্রহের কক্ষপথ অনেকটা বৃত্তাকার তবে পুরোটা নয়। কোনো একটি গ্রহের এই ডিম্বাকৃতি গতিপথ ছাড়াও অপর একটি

বৈশিষ্ট্য আছে গতির ক্ষেত্রে। এই বৈশিষ্ট্যের নাম 'ইনক্লিনেশন' [Inclination]। এটার অর্থ সৌরজগতে আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে কত ডিগ্রী উচ্চে বা নীচে অপর কোনো গ্রহের ঘূর্ণনপথ বিদ্যমান। বিষয়টি বুঝার জন্য নীচের চিত্রটি স্ট্যাডি করে দেখুন। সূর্যের নিকটস্থ প্রথম গ্রহ বুধ। এটার ইনক্লিনেশন ৬.৩ ডিগ্রী। অপরদিকে দূরতম গ্রহ প্লুটোর ইনক্লিনেশন হলো ১৭.১৪ ডিগ্রী। নিচের চিত্রটি দেখুন।
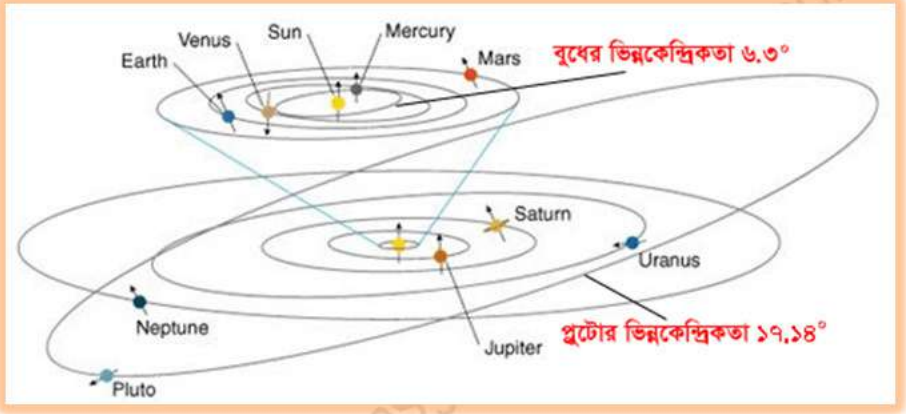
সোলার সিস্টেমের সার্বিক একটি ধারণা আমাদের হয়ে গেছে। তবে সোলার সিস্টেম ভ্রমণে যাওয়ার পূর্বে সূর্য ও তার ফ্যামিলির অবস্থান আমাদের নিজস্ব তারাজগৎ মিল্কিওয়ে সিস্টেমে কোথায় কিভাবে আছে তা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

আমাদের তারাসিস্টেম মূলত স্পাইর‍্যা-ল [spiral- পেঁচানো] গ্যালাক্সি নামক এক ধরনের তারাজগতের মতো। সর্বশেষ ধারণা মতে এতে আছে চল্লিশ কোটিরও বেশী তারা। পুরো সিস্টেমের মধ্যে কয়েকটি হাত আছে এবং এদের একেকটি প্রস্থে ১০,০০০ আলোক বছর হবে। এরূপ একটি হাতের মধ্যে সূর্যের অবস্থান। গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে ২৫,০০০ আলোক বছর দূরে থেকে পুরো সৌরজগৎ গ্যালাক্সির চতুর্দিকে দ্রুত বেগে প্রদক্ষিণরত আছে। অধিকাংশ হিসাব মতে সূর্যের প্রদক্ষিণ গতি ২৪০ কিমি/সেকেন্ড [১৪৯ মাইল/সেকেন্ড] এবং ২৫০ মিলিয়ন [বা ২৫ কোটি] বছরে একটিমাত্র প্রদক্ষিণ শেষ হয়। অর্থাৎ যদি সূর্যের জন্ম বর্তমান ধারণা মতে

৪.৫ বিলিয়ন [৪৫০ কোটি] বছর পূর্বে হয়ে থাকে তাহলে এ পর্যন্ত মোট 'গ্যালাক্টিক বছর' পার হয়েছে মাত্র ১৮টি। নীচের চিত্রে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে সূর্যের অবস্থান দেখানো হয়েছে।
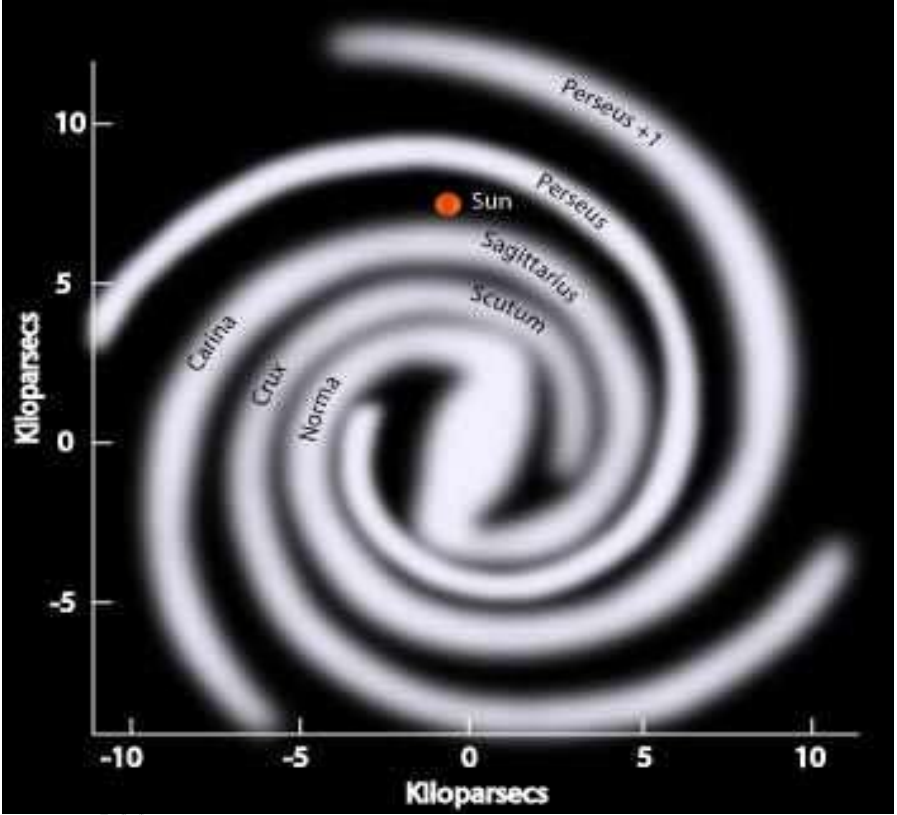
লক্ষ করুন, সূর্যটির অবস্থান স্যাজিটারিয়াস হাতের একটু বাইরে অবস্থিত। ছবিতে দূরত্বের একক 'কিলোপার্সেক' দেখানো হয়েছে। এক কিলোপার্সেক = ১০০০ পার্সেক। আর ১ পার্সেক = ৩.২৬ আলোক বছর।

সূর্য

কাল্পনিক ভ্রমণের শুরু আমাদের নিকটতম তারা সূর্য থেকে। সুতরাং আমাদের এই নিজস্ব এবং পৃথিবীর নিকটতম তারাটি সম্পর্কে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা [উপরে বর্ণিত বিভিন্ন যন্ত্রাদি ও উপায়-উপকরণের সাহায্যে] যাকিছু জানতে পেরেছেন সেসব তথ্যাদির উল্লেখযোগ্য কিছু এখানে বর্ণনা করা বাঞ্ছনীয়। সূর্য মূলত বিরাট আয়তনের একটি জ্বলন্ত গ্যাসীয় বস্তু। এর শক্তিশালী মহাকর্ষ হেতু পৃথিবীসহ সৌরজগতের সবকিছু আটকে আছে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণমান অবস্থায় তারই নিকটে। সূর্যের তাপ ও আলো দ্বারা সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। এই আলো ও তাপ ছাড়া পৃথিবীর উপর প্রাণীজগৎ বেঁচে থাকতো পারতো না।

সূর্য একটি মধ্যম বয়সের তারা। ধারণা করা হয় এর বয়স ৪.৫ বিলিয়ন বছর হবে। তবে এটা এখনও নওজোয়ান- কারণ, এতে যে বিরাট পরিমাণ জ্বালানি [অর্থাৎ হাইড্রোজেন] আছে তা শেষ হতে আরোও ৫ থেকে ৭ বিলিয়ন বছর অতিবাহিত হবে। সুতরাং চিন্তার কারণ নেই! সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় ১০৯ গুণ বেশী। এর মধ্যে বস্তুর পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় ৩,৩০,০০০ গুণ। আমাদের এই তারা সম্পর্কে জানা অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলো।

পৃথিবী থেকে দূরত্ব: সর্বনিম্ন- ১৪৭,১০০,০০০ কিমি; সর্বোচ্চ- ১৫২,১০০,০০০ কিমি; গড়- ১৫০,০০০,০০০ [৯৩,০০০,০০০ মাইল]।

স্পেকট্রেল টাইপ [তারার ধরন]: জি২।

তাপমাত্রা: কেন্দ্রে- ১৬,০০০,০০০ কেলভিন [২৯,০০০,০০০ ফারেনহাইট]; বাইরের উপরিভাগে- ৫৮০০ কে [৯৩০০ ফা]; সূর্যকলঙ্কে- ৪৫০০ কে [৮১০০ ফা]; বাইরের করোনায়- ১,০০০,০০০ কেলভিন [১,৮০০০,০০০ ফা]।

আয়তন: ব্যাসার্ধ - ৬৯৬,০০০ কিমি [৪৩২,৪০০ মাইল]।

ভর [ম্যাস]: ১.৯৯ x ১০৩০ কিগ্রা।

রসায়নিক পদার্থ: হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও অত্যল্প অন্যান্য পদার্থ।

পৃথিবী থেকে বিরাট দূরত্বের ফলে সূর্যকে আমাদের চোখে অনেকটা ছোট্ট মনে হয়। আলোকের গতি ৩ লক্ষ কিলোমিটার [১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল] প্রতি সেকেন্ড। এই উচ্চ গতিতে সূর্য থেকে আলো আমাদের পৃথিবীতে আসতে ৮ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। অথচ নিকটতম অপর তারা প্রক্সিমা সেন্টোরি থেকে আলো আসতে দীর্ঘ ৪.৩ বছর অতিবাহিত হয়। এতে বুঝাই যাচ্ছে আমাদের এই গ্যালাক্সিটাই কতো বিরাট! তবে ভাবার ব্যাপার যে আমাদের গ্যালাক্সি মহাবিশ্বের শত কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে একটি মাত্র!

পৃথিবীর সেবায় সূর্য

পুরো সৌরজগতের মধ্যে একটি নীল গ্রহ এই পৃথিবী। জীবনের স্পন্দনে পরিপূর্ণ এই গ্রহটিকে এমন এক অপূর্ব ডিজাইনে তৈরী করা হয়েছে যে, তা তলিয়ে দেখলে সত্যিই আবেগ-আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না। আমরা অবশ্য সৌরমণ্ডল ভ্রমণের অংশ হিসাবে পৃথিবী সম্পর্কে জানা এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল তথ্যাদি তুলে ধরবো। তবে এখানে আমাদের 'মাদার-আর্থকে' সূর্য কিভাবে সেবা করে যাচ্ছে তার বর্ণনা একান্ত জরুরী মনে করছি।

সূর্যের এনার্জি ছাড়া জীবন বলতে যা বুঝায় তা কখনো এই গ্রহের উপর ঠিকে থাকতে পারতো না। জীবন্ত যা কিছুই থাকুন না কেনো বেঁচে থাকতে মৌলিক কিছু

উপাদান তার পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান থাকা চাই। আর এই মৌলিক উপাদানের মূল সূত্র হলো আমাদের সূর্য। সে অবিরাম জ্বলন্ত থেকে আমাদের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে জীবনের জন্য জরুরী দু'টি এনার্জি-সূত্র- আলো এবং তাপ। সূর্যালোক আমাদের দিনগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলে এবং তাপ সৃষ্টি করে উষ্ণতা। সবুজ বৃক্ষরাজি সূর্যের আলো থেকে তৈরী করে নিজেদের খাদ্য এবং বর্জ্য হিসাবে আমাদের বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান- অক্সিজেন গ্যাস, ছেড়ে দেয় বায়ুমণ্ডলে।

সূর্য আমাদেরকে সরাসরি ও নেপথ্যে যাবতীয় খনিজ সম্পদও উপহার দিয়ে থাকে। এগুলো দ্বারা আমরা আধুনিক যুগে এনার্জির চাহিদা পূরণ করছি। আদি যুগে পুরো বিশ্বব্যাপী প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন আজো থেকে অনেক বেশী প্রাণচঞ্চল এবং বহুমাত্রায় বিস্তৃত ছিলো। সূর্যের এনার্জি না থাকলে এগুলো বেঁচে থাকতে পারতো না। এরপর যখন এগুলোর মৃত্যু ঘটলো তখন কালের প্রতিক্রিয়ায় মাটির নীচে খনিজ সম্পদে পরিণত হলো। আমরা তাই আজ কূপ খননের মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসতে পারছি মানবজাতির এনার্জির চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে মওজুদ থাকা পেট্রোলিয়াম, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। এই তিনটি এনার্জির সূত্র মূলত অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন। পৃথিবীর মাটিতে অস্তিত্বশীল ভবিষ্যৎ বুদ্ধিসম্পন্ন সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী মানুষের জন্য সুদূর অতীত থেকেই মহাপরিকল্পনা! ভাবার ব্যাপার নয় কি?

পানির অপর নাম জীবন। কথাটি সবার জানা। কিন্তু সূর্য না থাকলে যে এই 'জীবন' থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতাম তা ভেবে দেখার ব্যাপার। সূর্যের এনার্জিই বায়ুমণ্ডলে বাতাস ও পানি চলাফেরার জন্য দায়ী। পানির এই চলনকে বলে পানিচক্র। সূর্যের তাপের ফলেই পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায় এবং আবার তা বৃষ্টি হয়ে পতিত হয়- জ্যান্ত করে তুলে মরা জমিনকে। পানি চলে মহাসাগরের দিকে, তৈরী করে নদী-নালা। পাতালপুরে গিয়ে জমা হয়ে ফোয়ারা, জলপ্রপাত, কূয়া ও গভীর-অগভীর নলকূপের মাধ্যমে আবার বেরিয়ে আসে মানুষের সেবায়। পানির চলন ক্ষমতাকে আমরা কাজে লাগাই বাঁধ বেধে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করে। সূর্যের আলোকেও সরাসরি কাজে লাগানো হচ্ছে- যাকে আমরা

সৌরবিদ্যুৎ বলি। বাস্তবে সূর্যের দ্বারা আমরা ও আমাদের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা যে কি পরিমাণ উপকৃত হচ্ছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

সৌরজগতে সূর্যের দায়িত্ব

সূর্যের দায়িত্ব বলতে এটুকু পর্যন্ত বলা যায়- সূর্যই মূলত সৌরজগৎ। কারণ, পুরো সৌরজগৎ মূলত সূর্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু,

গ্রহাণুপুঞ্জ [এ্যাস্টারোইড] ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুর উপর পূর্ণ খবরদারি সূর্যের। সে তার বিরাট শক্তিশালী মহাকার্ষিক প্রভাব দ্বারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। দৃশ্যমান আলো

ও তাপ ছাড়াও সূর্য তার অত্যন্ত পাতলা বিরাট বায়ুমণ্ডল দ্বারাও সৌরজগতের সবকিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইলেকট্রিক্যালী চার্জকরা পরমাণুকণা পুরো সৌরজগতব্যাপী চলন্ত আছে। এই চলনকে বলে সোলার উইন্ড বা বাতাস। আমরা বলতে পারি সৌরবাতাস। যেসব এলাকায় এই সৌরবাতাস বিদ্যমান একে বলে হিলিওস্ফিয়ার। হিলিওস্ফিয়ার একটি বিরাট এলাকা যার ভেতর সকল গ্রহ-উপগ্রহ অবস্থান করে। অধিকাংশ মতে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের ১০০ গুণ দূরত্ব পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। সূর্য থেকে সৌরবাতাস জন্ম নিয়ে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। যে এলাকায় পৌঁছার পর এই বাতাসের প্রভাব আর অবশিষ্ট নেই, সেই এলাকাকে বলে হিলিওপোজ। এই এলাকাই হচ্ছে সৌরজগতের বাইরের সীমা। সৌরবাতাসের ফলেই পৃথিবীর উভয় মেরুর উপরে বায়ুমণ্ডলে ‘অরোরা’ নামক আলোকোজ্জ্বল রঙ্গিন প্রদর্শনীর উদ্ভব ঘটে যা দেখতে সত্যিই মনোমুগ্ধকর।

বিভিন্ন অরোরার চিত্র

সূর্যের ধরন

ইতোমধ্যে আমরা সূর্যের ধরন সম্পর্কে একটি তথ্য তুলে ধরেছি। মহাবিশ্বে অসংখ্য তারা আছে। তবে সবগুলো অবশ্যই একই ধরনের নয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সনাক্তকরণের একটি পথ বের করেছেন। তারার কয়েকটি মৌলিক গুণাবলীর উপর নির্ভর করে এটা কোন্ ধরনের। সার্বিকভাবে গুণাবলী-নির্ভর ধরনের নামকরণ করা হয়েছে, স্প্রেকট্রেল টাইপ [Spectral Type]। নিশ্চয় সবার মনে আছে ‘স্প্রেকট্রাম’ অর্থ কি। তারা থেকে প্রাপ্ত আলোকের ইলেকট্রমেগনেটিক স্প্রেকট্রাম গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা কোন্ ধরনের তারা তা

নির্ধারণ করে থাকেন। স্প্রেকট্রেল টাইপ ইংরেজী বিভিন্ন অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলো: ঙ [নীল তারা- তাপমাত্রা- ২৫,০০০ ডিগ্রী কেলভিন], ই [সাদা-নীল তারা, তাপমাত্রা- ১১,০০০-২৫,০০০ ডিগ্রী কেলভিন], অ [সাদা তারা-তাপমাত্রা- ৭,৫০০-১১,০০০ ডিগ্রী কেলভিন], ঋ [হলুদ-নীল তারা- তাপমাত্রা-৬,০০০-৭,৫০০ ডিগ্রী কেলভিন], এ [হলুদ [সূর্যের মতো] তারা- তাপমাত্রা-৫,০০০-৬,০০০ ডিগ্রী কেলভিন], ক [কমলা-হলুদ তারা- তাপমাত্রা- ৩,৫০০-৫০০০ ডিগ্রী কেলভিন] এবং গ [লাল তারা- তাপমাত্রা- ৩,৫০০ ডিগ্রী কেলভিন]। সূর্য এই তালিকা অনুযায়ী এ টাইপের তারা। স্পেকট্রেল টাইপ শুধুমাত্র তাপমাত্রা এবং রঙের উপর নির্ভর করে না অবশ্যই। আরো অনেক তথ্যাদিও আছে যেমন, সূর্যের ক্ষেত্রে এতে কেলসিয়াম ¯েপকট্রেল লাইন বেশী, হাইড্রোজেন লাইন তেমন শক্তিশালী নয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ধাতুর লাইন আছে যেমন লোহা। সুতরাং একটি তারার স্পেকট্রেল টাইপ থেকে আমরা অনেক তথ্য জেনে নিতে পারি।

সূর্যকে বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় প্রজন্মের তারা হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। এর অর্থ হলো এটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির সাথে সাথে জন্ম নেয় নি। বরং সে সময় সৃষ্ট স্বল্প-বয়সী তারারা যখন বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়- তখন তাদের রেখে যাওয়া বস্তু থেকে সূর্য ও এরূপ অসংখ্য তারার জন্ম হয়। এ কারণেই বিশ্বের বয়স ১৪-১৫ বিলিয়ন বছর হলেও সূর্যের বয়স ৪.৫ বিলিয়ন বছর- কারণ এটা দ্বিতীয় জেনারেশনের তারা। প্রথম প্রজন্মের তারাদের মধ্যে দু'টি মাত্র পদার্থ বিদ্যমান। এগুলো হলো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের তারাদের মধ্যে এই দু'টি মূল পদার্থ ছাড়াও অন্যান্য ভারী পদার্থও এগুলোতে আছে বলে প্রমাণ মিলেছে। এসব পদার্থের মধ্যে কার্বন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন অন্যতম।

সূর্যের জন্ম-মৃত্যু

সূর্য ও সৌরজগতের জন্ম কিভাবে হয়েছিল তা শুধুমাত্র 'মতবাদ' বা থিওরি দ্বারা বুঝানো সম্ভব। আজকের বিজ্ঞান আমাদেরকে একটি থিওরির প্রতি বেশী আস্থাশীল করেছে। এই থিওরি মুতাবিক, আজ থেকে ৪.৫ কিংবা ৪.৬ বিলিয়ন [বা ৪,৫০০ বা ৪,৬০০ কোটি বছর] পূর্বে ঘূর্ণনরত আন্তঃতারা গ্যাস-ক্লাউড থেকে

আমাদের সূর্য ও তার সকল পরিবারবর্গের জন্ম হয়। এই বিরাট মাত্রার গ্যাসীয় বস্তু আসলো কোত্থেকে সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশের মতে অপর এক বা একাধিক তারার বিস্ফোরণ থেকে এই বস্তু এসেছে। গ্যাসখণ্ড তার নিজস্ব মহাকর্ষের প্রভাবে জড়ো হতে থাকে। এই ঘূর্ণনরত গ্যাসের মধ্যখানে সূর্য আত্মপ্রকাশ করে এবং বাইর দিকে ছোট ছোট খণ্ড জড়ো হয়ে গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম দেয়। সূর্যের মধ্যে জড়ের মাত্রা অত্যধিক থাকায় এর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে কেন্দ্রের মধ্যে শুরু হয় আনবিক ফিউশন প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া আজো অব্যাহত আছে এবং এরই ফলে সূর্য থেকে নির্গত হয় উজ্জ্বল আলো ও তাপ।

জন্ম নিলে মৃত্যু হবে-এটাই নিয়ম। সূর্যের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। সে অনন্তকাল জ্বলন্ত থাকতে পারবে না। একদিন তার অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়ার জ্বালানি ‘হাইড্রোজেন’ শেষ হয়ে যাবে। এ পর্যন্ত ৪.৫ বিলিয়ন বছর প্রতিক্রিয়া

অব্যাহত রাখতে যেয়ে এই জ্বালানির ৩৭% ব্যয় হয়েছে। সূর্য ফিউশন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা আজ থেকে ৭ বিলিয়ন বছর পরে সম্পূর্ণ হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিবর্তিত হবে- তখন সূর্য মৃত্যুর পথযাত্রী হয়ে পড়বে। কিভাবে আমাদের এই তারার মৃত্যু ঘটবে? যে উপায়ে তা হবে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন সে বর্ণনা শোনলে সত্যিই শরীরে শিহরণ জেগে উঠে।

সূর্যের ঔজ্জ্বল্যতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তার কেন্দ্রে হিলিয়ামের মাত্রা বেড়ে ওঠবে। হাইড্রোজেন সাপ্লাইয়ের পরিমাণ কমতে থাকলেও সূর্যকে নিজের মধ্যে কলাপ্স হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে কেন্দ্রের চাপ যথেষ্ট রেখে যেতে হবে। একমাত্র তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটা সম্ভব। সুতরাং এই বৃদ্ধিকরণের ফলে আনবিক প্রতিক্রিয়ার রেইটও বাড়বে যার ফলে সূর্যটি আরোও উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। আজ থেকে ৩ বিলিয়ন বছর পর সূর্য এতোই গরম হবে যে পৃথিবীর সকল মহাসাগরের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে। এর আরোও ৪ বিলিয়ন বছর পর সূর্যের যাবতীয় জ্বালানি শেষ হবে। এসময় আয়তন এতোই বৃদ্ধি পাবে যে, প্রথম গ্রহ বুধ সূর্যের অভ্যন্তরে চলে যাবে। এই অবস্থাকে বলে 'রেড জায়ান্ট' স্টেজ [পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন]। এই স্টেজে পোঁছার পর সূর্যের ঔজ্জ্বল্যতা আজ থেকে ২ হাজার গুণ বেশী হবে। অবশ্য শুধু ঔজ্জ্বল্যতা নয় তাপমাত্রাও প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর মধ্যস্থিত পাথর পর্যন্ত এই তাপে গলে যাবে। এসময় বাইর সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ অনেকটা বেশী গরম হয়ে ওঠবে।

জায়ান্ট তারা হিসাবে অবশ্য স্থায়ী থাকবে না আমাদের সূর্যটি- জ্বালানি শেষ হওয়ার পর নিজস্ব ভরকে আর অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রাখতে সক্ষম হবে না। সূর্য তখন দ্রুত ছোট্ট হওয়া শুরু কবরে এবং অবশেষে ক্ষুদ্র একটি তারায় পরিণত হবে যার নাম হলো 'হুয়াইট ডোর্ফ' বা সাদা বামন তারা। সূর্যের ব্যাস তখন পৃথিবীর ব্যাস থেকে বেশী হবে না। তবে তার ভর বা ম্যাস হবে অনেক গুণ। ৮ বিলিয়ন বছর পর 'সাদা বামনে' রূপান্তরিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে সূর্য তার এনার্জি হারিয়ে একদা নিভে যাবে। তখন সূর্য হবে একটি মৃত তারা। [আগের পৃষ্ঠার 'তারাজীবন' চিত্রটি দেখুন]

বুধ

আমাদের ভ্রমণের শুরু হয়েছিল সূর্যের নিকটে। এখন আমরা প্রথম গ্রহ বুধের কাছে এসে পৌঁছেছি। এটি সৌরজগতের চার 'টেরেসট্রিয়াল' [Terrestrial] বা শক্ত মাটিসম্পন্ন গ্রহের একটি। বাকীগুলো হলো শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল। বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সে সূর্য থেকে গড়ে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ [৫৮ মিলিয়ন] কিমি বা ৩ কোটি ৬০ লক্ষ [৩৬ মিলিয়ন] মাইল দূরে থেকে প্রদক্ষিণরত আছে। গ্রহটির ব্যাস ৪৮৭৯ কিমি [৩০৩২ মা]। পৃথিবীর ভর ও ভলিয়মের তুলনায় বুধ মাত্র ১৮ ভাগের ১ ভাগ। বুধ অতি ছোট্ট একটি গ্রহ তবে তার মধ্যস্থ বস্তুর ঘনত্ব পৃথিবীর সমপরিমাণ যা অন্যান্য সকল গ্রহের তুলনায় বেশী। তার উপরে মহাকর্ষের মাত্রা পৃথিবীর তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। সূর্যের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসতে বুধের ৮৮ দিন সময় লাগে- অর্থাৎ বুধের 'বছর' ৮৮ দিনে। তবে তার একদিন আমাদের তুলনায় ৫৮.৭ দিন। এর অর্থ সে তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ৫৮.৭ দিনে একবার ঘুরে। সুতরাং গ্রহের তিন দিনে অতিবাহিত হয় তার দুই বছর! এর ফলে যেদিকটি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, দীর্ঘদিন থাকার পর তা খুব বেশী গরম হয়ে ওঠে। অপরদিকে অন্ধকার বা রাতের দিকও অনুরূপ কারণে থাকে খুব ঠাণ্ডা।

পৃষ্ঠদেশ

মারিনার-১০ মহাকাশযান ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে গ্রহটির কাছে যেয়ে কিছু তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এ থেকে জানা যায় বুধের উপর চন্দ্রের মতো অসংখ্য পতন-গর্ত [বা ইমপেক্ট ক্রেটার] আছে। দিবাভাগের তাপমাত্রা ৪৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং রাতের দিকের তাপমাত্রা -১৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপরে ওঠে না। মাটির রঙ অনেকটা অনুজ্জ্বল থাকায় বুধের উপর সূর্যালোক পতিত হয়ে খুব একটা প্রতিবিম্ব হয় না। যে কোনো গ্রহের পৃষ্ঠদেশে পতিত হওয়ার পর যেটুকু আলো প্রতিবিম্ব হয়ে আবার মহাকাশে ফিরে যায় এই মাত্রাকে
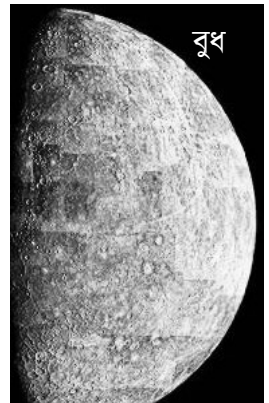
বলে 'আলবেদো' [Albedo]। বুধের বেলা এই সংখ্যাটি হলো মাত্র ১২%। পৃথিবীর আলবেদো ৩৭% আর শুক্রগ্রহের আলবেদো ৬৫% যা সকলের তুলনায় বেশী। এ কারণেই শুক্র হলো চন্দ্র পরে রাতের আকাশে সর্বাপেক্ষা আলোকোজ্জ্বল বস্তু।

অধিকাংশ রেডিও স্পেকট্রোস্কোপি গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুধের একটি পাতলা বায়ুমণ্ডল আছে যা মূলত সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের তৈরী। বুধের অধিকাংশ বস্তু লোহা। এর কেন্দ্র মূলত গলিত লোহার তৈরী। পৃথিবীর পরে বুধই একমাত্র শক্ত মাটির গ্রহ যার চতুর্দিকে একটি দুর্বল মেগনেটিক ফিল্ড বিদ্যমান। পৃথিবীর তুলনায় এর শক্তি মাত্র ১%। এই ফিল্ড থাকার কারণ হলো বুধের মধ্যস্থ লৌহজাত দ্রব্যের আধিক্য। কেন্দ্রের গলিত লোহার চলন থেকেই মেগনেটিক ফিল্ডের জন্ম। বুধে কোনদিন প্রাণী ছিলো এমন কোনো ইঙ্গিত মিলে নি। আর বর্তমানে গ্রহটি সত্যিই প্রাণীদের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী। সূর্যের নিকটতম গ্রহ হিসাবে তার উপর একদিকের তাপমাত্রা এতো বেশী যে এক বালতি পানি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়ে যাবে। অপরদিকে রাতের সাইডে তাপমাত্রা এতোই কমে আসে যে, ঐ বালতিতে রাখা পানি ক্ষণকালের মধ্যেই শক্ত বরফে পরিণত হবে। এবার চিন্তা করুন, এরূপ পারিপার্শ্বিকতায় বসবাস করা কেমন হবে?

শুক্র

সূর্য থেকে দূরত্বে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত শুক্রগ্রহকে পৃথিবীর সহোদরা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকদিক থেকে গ্রহটি আমাদেরটির মতো হলেও শুক্রগ্রহ মোটেই পৃথিবীর মতো প্রাণীদের জন্য বাসোপযোগী নয়। রাতের আকাশে সূর্য ও চন্দ্র বাদে এমন উজ্জ্বল আর কোনো বস্তু নেই। শুক্রকে 'ভোরের তারা' [morning star] ও 'সন্ধ্যাতারা' [evening star] বলেও সম্বোধন করা হয়। বাস্তবে শুক্রের কক্ষপথের অবস্থান হেতু পৃথিবী থেকে একে সূর্যোদয়ের ৩ ঘণ্টা পূর্বে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের ৩ ঘণ্টা পরে পশ্চিমাকাশে দেখা যায় মাত্র। এবার বুঝাই যাচ্ছে শুক্রকে কেনো ভোরের ও সন্ধ্যা তারা বলা হয়। শুক্র তার কক্ষপথে চলার সময় প্রত্যেক শত বৎসরে দু'বার সূর্যের সামন দিয়ে ভ্রমণ করে। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান এই ভ্রমণকে

বলে শুক্রের ট্রানজিট। বাস্তবে ঐ ট্রানজিট জোড়ায় জোড়ায় হয়- অর্থাৎ প্রত্যেক শত বছর পর কয়েক বছরের ব্যবধানে দু'বার ট্রানজিট পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থ যদি লিখার কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশ পায়- আর আমি তা-ই আশা করছি তাহলে, এই শতকের দ্বিতীয় ট্রানজিটটি পাঠকরা ২০১২ সালে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। তবে প্রথমটি গত হয়ে গেছে, তা ছিলো ২০০৪ সালে।

বৈশিষ্ট্য

শুক্রগ্রহের মধ্যে একটি ঘন বায়ুমণ্ডল আছে। ফলে একে ছবির সাহায্যে গবেষণা করা কঠিন। সুতরাং যাকিছু জানা গেছে তা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। মারিনার-২ মহাকাশযান সর্বপ্রথম ১৯৬২ সালে শুক্র গ্রহের নিকট দিয়ে উড়ে যায়। এরপর মারিনার-৫ ১৯৬৭ সালে এবং মারিনার-১০ ১৯৭৪ সালে গ্রহের কাছে গিয়ে বেশ কিছু ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। মারিনার মহাকাশযান আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। এদিকে প্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভেনেরা' নামক এক সিরিজ মহাকাশযান শুক্রে প্রেরণ করে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী এই শুক্র গবেষণায় রাশিয়া মোট ১৬টি ভেনেরা মহাকাশযান প্রেরণ করে। এদের বেশিরভাগ শুক্রের চতুর্দিকে কক্ষপথে ঘূর্ণমান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। এরূপ মহাকাশযানকে বলে 'অরবিটার' [Orbiter]। তবে এক দু'টো ''Entry Probe' বা প্রবেশযানও ছিলো। শুক্রের বায়ুমণ্ডল খুব ঘন হওয়ায় 'গ্রীনহাউস এফেক্ট' [Greenhouse Effect] হেতু এর উপরিভাগের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী। ফলে কৃত্রিম উপগ্রহের যন্ত্রপাতি বেশিক্ষণ কর্মঠ থাকতে পারে না- তাপের দরুন অকেজো হয়ে পড়ে।

বায়ুমণ্ডল

শুক্রের বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত বিষাক্ত কার্বন-ডাইওক্সাইড দ্বারা পরিপূর্ণ [৯৭%]। পৃথিবীর তুলনায় বায়ুমণ্ডল অনেকগুণ ঘনও বটে। এর ফলে গ্রহের উপরিভাগে বায়ুমণ্ডলের চাপ বিরাট- পৃথিবীর তুলনায় ৯৭ গুণ বেশী। ভারী ঘন কার্বন-ডাইওক্সাইড-সর্বস্ব বায়ুমণ্ডল থাকার ফলে গ্রীনহাউস এফেক্টের কারণে গ্রহের

তাপমাত্রা ৪৬২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের খুব একটা নীচে নেমে আসে না। উল্লেখ্য, মানুষের শ্বাস-নিঃশ্বাসের অনুপযোগী সিও-২ গ্যাস আমাদের পৃথিবীতে বিরাট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত এই গ্যাস চুনা পাথর হিসাবে অস্তিত্বশীল থাকায় আমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। অপরদিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ৭৮% গ্যাস হলো নাইট্রোজেন। শুক্র গ্রহের বায়ুমণ্ডলে এর মাত্রা ৩% মাত্র।

আমরা সৌরজগতের এই ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ করার পূর্বে গ্রহগুলোর উপর তথ্যসম্মৃদ্ধ একটি টেবিল তুলে ধরবো। সেখানে পাঠকরা সকল গ্রহের আয়তন, সূর্য

থেকে দূরত্ব ইত্যাদি জেনে নিতে পারবেন। এখন শুক্র গ্রহ সম্পর্কে আর যা কিছু বলার তাহলো, গ্রহের স্থলভাগের স্বরূপ। মেজেলান নামক একটি মহাকাশযান শুক্রের নিকট-কক্ষপথে ঘূর্ণমান থেকে রাডার সিগনালের মাধ্যমে পুরো গ্রহের ম্যাপ তৈরী করে। এতে দেখা যায় গ্রহের মধ্যে বিরাট আয়তনের আগ্নেয়গিরি আছে। এছাড়া চন্দ্রের উপরের মতো বহু 'মিটিওরাইট ক্রেটারও' [Metorite crater - মহাকাশ থেকে আগত ছোটবড় প্রস্তরখণ্ড পতনের ফলে যে গর্তের সৃষ্টি হয়] বিদ্যমান। এরূপ একটি বিরাট আকারের গর্ত আছে যা ৩০০ কি.মি পর্যন্ত বিস্তৃত।

পৃথিবী

আশারাখি এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, আমাদের নীল এ পৃথিবীটি সৌরজগতের ন'টি গ্রহের একটি এবং এটি সবার মতো মহাকাশে ভাসমান আছে। এছাড়া এটাও সবার জানা যে, গ্রহ-পৃথিবী তার নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রতি ৩৬৫ দিন ও এর কিছু বেশী সময়ে।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মহাকাশে ভাসমান পৃথিবীর অর্ধগোলক

পৃথিবীটা শুধু সৌরজগৎ নয় পুরো মহাবিশ্বে একটি একক চিত্তাকর্ষক গ্রহ হিসাবে বিদ্যমান আছে। এখানেই সৃষ্টির সেরা জাতি মানুষের বসবাস। আর এই বসবাসের জন্য সবদিক থেকে যোগ্যতার অধিকারী আমাদের জানা একমাত্র গ্রহ এই পৃথিবী।

প্রথমতঃ গ্রহটি সূর্য থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থান করছে। কিছুটা নিকটে হলে তাপমাত্রা অতি বেশী হয়ে যেতো এবং বেশী দূরে থাকলে তা হতো অতি বেশী ঠাণ্ডা। এই উভয় অবস্থায় মানুষসহ প্রাণীদের বেঁচে থাকা কঠিন কিংবা অসম্ভব হতো। যেমন আমরা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছি, শুক্রগ্রহ সবদিক থেকে পৃথিবীর মতো হয়েও সেখানে কোনো প্রাণীদের বসবাস সম্ভব হয় নি- এর একটি বিশিষ্ট কারণ হলো সূর্য থেকে দূরত্ব। মনে করুন গ্রহটি যদি পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতো তাহলে এটা হয়তো থাকার উপযোগী হয়ে ওঠতো।

দ্বিতীয়তঃ গ্রহের ভর [ম্যাস] সঠিক হওয়ার কারণে পর্যাপ্ত মহাকর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর চতুর্দিকে একটি বায়ুমণ্ডল বিদ্যমান আছে যা প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত। যদি মহাকর্ষ কম হতো তাহলে বায়ুমণ্ডল থাকতো না বা বেশী পাতলা হতো। অপরদিকে বেশী হলে অধিক বায়ুমণ্ডলের ফলে গ্রহের আবহাওয়া সিস্টেম অন্যরকম হতো এবং প্রাণীদের বেঁচে থাকতে বাধার সৃষ্টি করতো। এভাবে আরো অনেক ফেক্টর আছে যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সঠিক হওয়ায় এই নীল গ্রহ সবদিক থেকে মহাবিশ্বে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে। এবার আসুন আমাদের ‘মাদার আর্থ’ সম্পর্কে জানা তথ্যাদির উপর আলোচনা করি।

সৌরজগতে পৃথিবী

আমাদের পৃথিবী স্থলভূমিসম্পন্ন চারটি গ্রহের একটি। অন্যগুলো হলো বুধ, শুক্র ও মঙ্গল। পৃথিবী সৌরজগতে সূর্য থেকে দূরত্বের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। গড় দূরত্ব হলো ১৫০ মিলিয়ন কিমি [৯৩ মিলিয়ন মাইল]। পৃথিবী

তার প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘণ্টায় ১,০৭,৮০০ কিমি [৬৭,০০০ মাইল] বেগে ছুটন্ত আছে। একটি ছাড়া সবগুলো গ্রহই একই প্লেইনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।
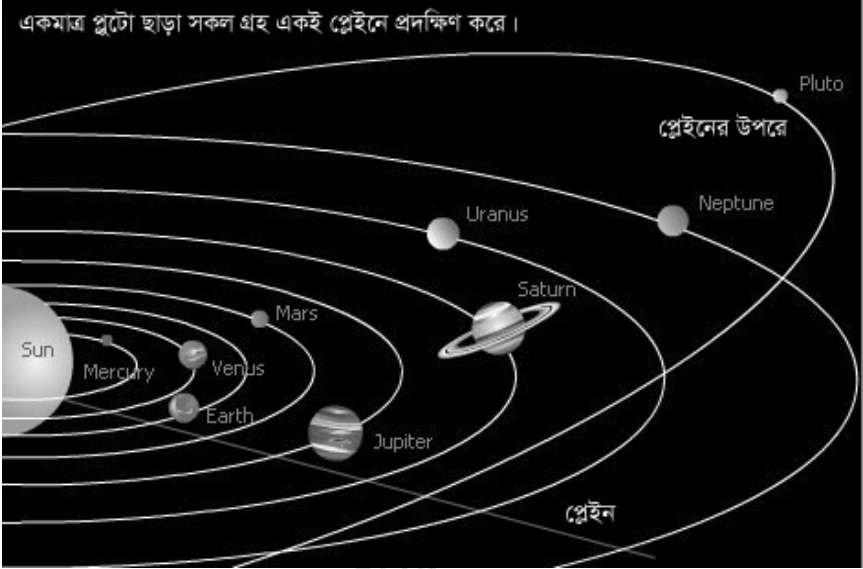
মনে করুন সূর্যের কেন্দ্র থেকে একটি কাল্পনিক সরল রেখা টেনে যদি সৌরজগতের বাইর পর্যন্ত নেওয়া হয় তাহলে এই লাইনের উপর সবগুলো গ্রহই অবস্থান করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে- কিন্তু একমাত্র সর্বশেষ গ্রহ প্লুটো ছাড়া। তার কক্ষপথ অস্বাভাবিক। সে এই প্লেইন থেকে কয়েক ডিগ্রী উপরে অবস্থান করে প্রদক্ষিণরত আছে। [দেখুন উপরের চিত্রটি]

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা প্লুটোকে 'বামন গ্রহ' [dwarf planet] হিসাবে ঘোণষা দিয়েছেন। এটি ঠিক গ্রহ নয়। এখন নয়টি না বলে, বলতে হবে সৌরজগতে গ্রহের সংখ্যা ৮টি। প্লুটোর ছোট্ট আয়তন ও কক্ষপথ ভিন্ন হওয়ায় একে 'বামন গ্রহ' হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আগেই বলেছি পৃথিবীর কক্ষপথ অনেকটা বৃত্তাকার, কিন্তু সম্পূর্ণটা নয়- এর অর্থ হলো বছরের একটি সময় সে সূর্য থেকে কিছুটা বেশী এবং অন্য সময় কাছে অবস্থান করে। কক্ষপথের সর্বোচ্চ দূরত্ব হলো ১৫২ মিলিয়ন কিমি এবং সর্বনিম্ন দূরত্ব হলো ১৪৭ মিলিয়ন কিমি। তবে একই দূরত্বে সর্বদা অবস্থান করলে পৃথিবীর কক্ষপথ হতো সত্যিকার অর্থে বৃত্তাকার। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবী সৌরজগতের পঞ্চম গ্রহের স্থান অধিকার করে রেখেছে। ইক্যুয়েটর বা বিষুবরেখার উপর মাপ নিয়ে এর ব্যাস ১২,৭৫৬ কিমি [৭,৯২৬ মা] সাব্যস্ত হয়েছে। এটা আসলে নিষ্কলুষ একটি গোলক নয়- উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে কিছুটা চাপা। সুতরাং আমরা যদি উভয় মেরুর উপর রেখা টেনে ব্যাস মাপি তাহলে তা বিষুবরেখার ব্যাসের চেয়ে কিছুটা কম হবে।

পৃথিবী ভেতর সৌরজগতের চারটি গ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো। কিন্তু বিরাট আয়তনের অন্য চারটি গ্রহ যথা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনের তুলনায় সত্যিই অত্যন্ত ছোট্ট। সৌরজগতে সর্ববৃহৎ গ্রহ হলো বৃহস্পতি যার বিষুবরেখার ব্যাস ১,৪৩,০০০ কিমি [৮৯,০০০ মা]। এটা পৃথিবীর ব্যাস থেকে ১১ গুণ বেশী। বৃহস্পতির প্রখ্যাত ‘লাল চিহ্ন’ এতোই বড়ো যে এর ভেতর তিনটি পৃথিবী পাশাপাশি রাখা যাবে।

আমাদের পৃথিবীর একটি অকৃত্রিম উপগ্রহ আছে যাকে আমরা চন্দ্র বলি। ডিম্বাকৃতির একটি কক্ষপথে চন্দ্র পৃথিবীকে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১.৫ সেকেন্ডে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। এই ঘূর্ণনের কারণ অবশ্য পৃথিবী কর্তৃক চন্দ্রের উপর মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব। তবে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই শক্তি বিদ্যমান- তাই চাঁদ নিজেও তার মহাকর্ষ দ্বারা পৃথিবীকে প্রভাবিত করে। মহাসাগরের মধ্যে যে ঢেউ সৃষ্টি হয় তা মূলত চন্দ্রের মহাকর্ষের টানে হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, চন্দ্র পৃথিবীরই অংশ। সুদূর অতীতে [প্রায় ৪ হাজার মিলিয়ন বছর পূর্বে] একটি ছোট্ট গ্রহ কিংবা গ্রহাণুপুঞ্জ পৃথিবীতে পতিত হওয়ার ফলে বেশ কিছু বস্তু মহাকাশে যেয়ে ছিটকে পড়ে। এই বস্তু থেকেই চন্দ্রের জন্ম হয়েছে।
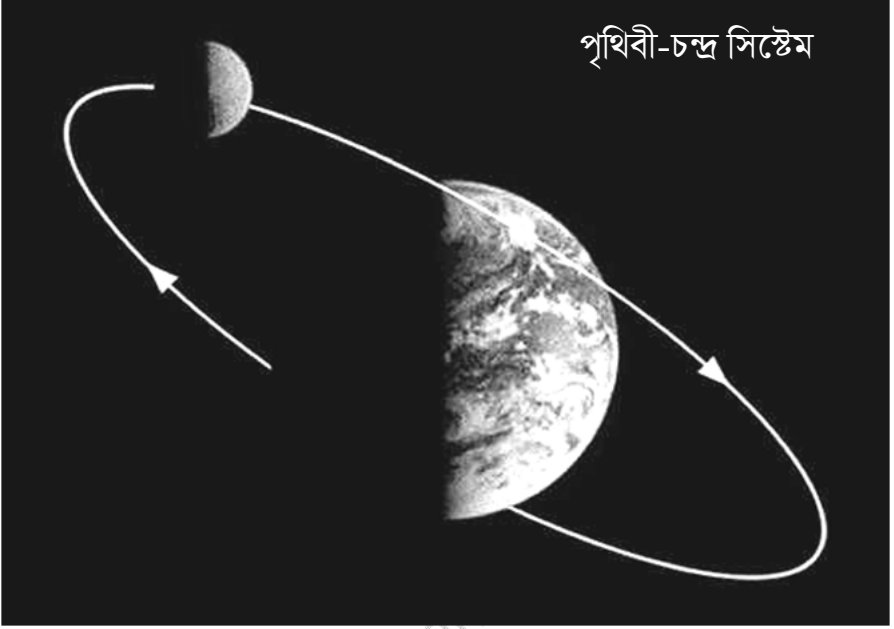
পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে কক্ষপথে ঘূর্ণনের সাথে সাথে সে তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে লাটিমের মতোও ঘুরে যাকে বলে 'স্পিন'। এই স্পিন বা দৈনিক [কিংবা আহ্নিক] গতিই হলো আমাদের ভাষায় 'এক দিন'। পৃথিবীর এক দিন সমান ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.১ সেকেন্ড। সুতরাং ঠিক ২৪ ঘণ্টায় এক দিন হয় না। অপরদিকে বার্ষিক কক্ষপথে ঘুরে আসা সময় যাকে বলে 'বছর'- তাহলো ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড। সুতরাং এক বছরও আসলে ঠিক ৩৬৫ দিনে নয়।

এ পর্যন্ত আমরা মহাকাশে পৃথিবীর দু'টি গতির কথা উল্লেখ করেছি। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। আরো একাধিক গতি আছে আমাদের এই বসুন্ধরার। সূর্য ও সৌরজগৎ একটি বিরাট তারকাজগতের সদস্য। এই জগতের নাম ছায়াপথ বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে ভিত্তি করে পুরো সৌরজগৎ এক অকল্পনীয় গতিতে কক্ষপথে ঘূর্ণমান আছে। কেন্দ্র থেকে আমাদের দূরত্ব ২৮,০০০

আলোক বছর। সৌরজগতের এই গতি ২৪০ কিমি প্রতি সেকেন্ড [১৪৯ মাইল প্রতি সেকেন্ড]। এরপরও একবার ছায়াপথের চতুর্দিকে ঘুরে আসতে ২৫০ মিলিয়ন বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং পৃথিবীর ৩টি গতির কথা আমরা এ পর্যন্ত উল্লেখ করলাম। এখানেই শেষ নয়! পুরো ছায়াপথও আমাদের 'লকেল গ্রুপ' নামক একটি বিরাট গ্যালাক্সি গ্রুপের কেন্দ্রের উপর ভিত্তি করে ঘূর্ণমান আছে। এই লকেল গ্রুপে মোট ৩০টি গ্যালাক্সি আছে। এর মধ্যে একটি হলো আমাদের ছায়াপথ। যা হোক আমরা গ্যালাক্সির উপর আলোচনাকালে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন গতি বুঝাতে যেয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে দু'চারটে কথা বলা হলো।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল

আগেই বলেছি আমাদের জীবনরক্ষার্থে পৃথিবীর চতুর্দিকে যে বায়ুমণ্ডল বিদ্যমান আছে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কয়েকটি আলাদা স্তরে এই বায়ুমণ্ডল বিভক্ত। এই স্তরগুলো হলো: ১. ট্রপোস্ফিয়ার [Troposphere -মাটি থেকে ১০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত]; ২. স্ট্রাটোসস্ফিয়ার [Ozone Layer -১০ থেকে ৩০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত]; ৩. অজোন লেয়ার [Ozone Layer -১২ থেকে ৩০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত]; ৪. মেজোস্ফিয়ার [Mesosphere - ৩০ থেকে ৬০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত]; ৫. থার্মোস্ফিয়ার [Thermosphere -৬০ থেকে ৯০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত] এবং ৬. শেষোক্ত স্তরের শুরু থেকে ৬০০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত আরেকটি বিশেষ স্তর আছে যাকে বলা হয় 'আয়োনোস্ফিয়ার' [Ionosphere]।

১. ট্রপোস্ফিয়ার

সাগর লেবেল থেকে প্রত্যেক ১,০০০ মিটার ঊর্ধ্বদিকে গেলে আমরা লক্ষ্য করি তাপমাত্রা ৫.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড করে কমে আসে। ট্রপোস্ফিয়ারের মধ্যেই যাবতীয় মেঘমালা ভেসে বেড়ায়। পৃথিবীর সর্বনিম্নস্তরের বায়ুমণ্ডল এটাই। এই স্তরেই যাবতীয় আবহাওয়া-জনিত ক্রিয়া-কলাপ সংঘটিত হয়। এই স্তরের উপরে ট্রপোপজ [tropopause] নামক একটি অংশ আছে- এখানেই স্তরের শেষ। ট্রপোস্ফিয়ারের আয়তন সর্বত্র এক নয়। বিষুবরেখায় এর উচ্চতা ১০ মাইল পর্যন্ত হয় কিন্তু উভয় মেরুতে তা মাত্র ৫ মাইল। স্তরের ট্রপোপজে তাপমাত্রা -৮০ থেকে

আমাদের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের নাম ও তাপমাত্রা
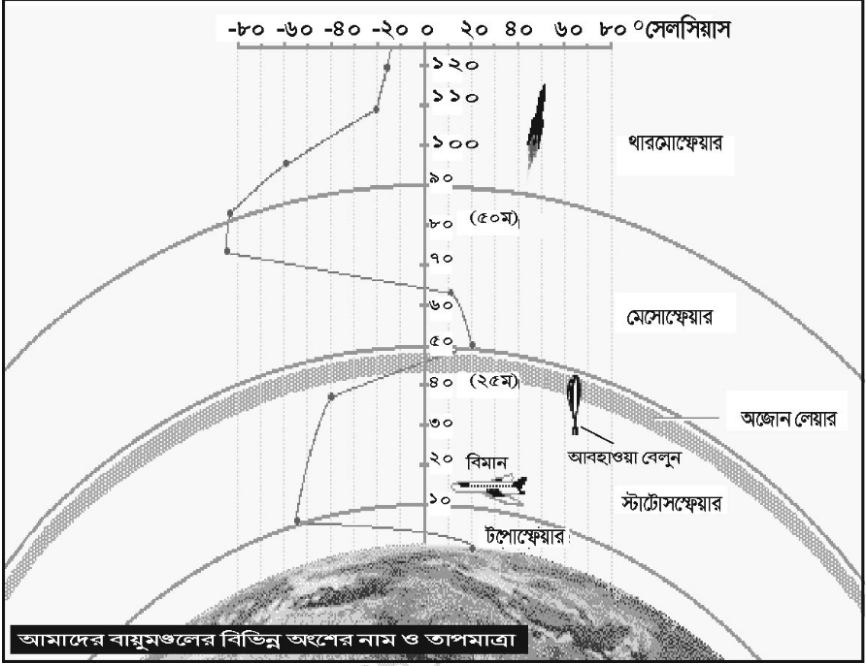
-৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। পুরো বায়ুমণ্ডলের ভর বা ম্যাসের ৭৫% এই ট্রপোস্ফিয়ারে বিদ্যমান। আর যে বস্তুর দ্বারা এটা তৈরী তা মূলত জলীয় বাষ্প। যেসব গ্যাস ট্রপোস্ফিয়ারের বাসিন্দা তার মধ্যে নাইট্রোজেন [৭৮%] ও অক্সিজেন [২১%] উল্লেখযোগ্য। আরগন [০.৯%], হাইড্রোজেন, অজোন, মিথেইন, কার্বন ডাইওক্সাইড ইত্যাদি মিলে বাকী ১% হয়েছে।

সূর্য কর্তৃক ট্রপোস্ফিয়ারের গ্যাস বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন রেইটে উত্তপ্ত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় পৃথিবীর বিষুবরেখার উপর সূর্যের তাপমাত্রা মেরু অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী। বায়ুর মধ্যে তাপমাত্রার এই তারতম্য থাকায় সৃষ্টি হয় বাতাসের। এই ক্রিয়াকে বলে ‘হিট ট্রান্সফার’ [Heat Transfer] বা তাপ-স্থানান্তর। আমাদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এই ক্রিয়াটিও একান্ত জরুরী। তাপ-স্থানান্তরের ফলেই মূলত বায়ুমণ্ডলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে- মেঘমালা এক

স্থান থেকে অপর স্থানে যায় ও বৃষ্টি আকারে নেমে আসে। মূলত পৃথিবীর পানিচক্র এই তাপ-স্থানান্তরের কারণেই বিদ্যমান আছে।

পানিচক্র

পৃথিবী ও ট্রপোস্ফিয়ারের মধ্যে যে পানির লেনদেন প্রতিনিয়ত ঘটছে এটাকেই বলে 'ওয়াটার সাইকেল' [Water Cycle] বা পানিচক্র। সূর্যের তাপে বিরাট অঙ্কের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে উড়ে যাওয়ার মাধ্যমে এই চক্রের শুরু হয়। বাতাস তখন এই জলীয় বাষ্পকে উপরের দিকে তুলে, এতে এর তাপমাত্রা কমে আসে। ফলে জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকার ধারণ করে আবার পৃথিবীতে নেমে আসে। এরপর আবার এই চক্রের সূচনা হয়। তবে বৃষ্টির ফোটা ছাড়াও এই পানি বরফ, তুষারপাত ও শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি হিসাবে পতিত হতে পারে।

২. স্ট্রাটোসস্ফিয়ার

ঊর্ধ্বদিকে ট্রপোস্ফিয়ারের শেষ থেকেই স্ট্রাটোসস্ফিয়ারের শুরু। ১০ মাইল থেকে শুরু হয়ে ৪৫ মাইল উঁচু পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এই স্তরের নিম্নভাগে তাপমাত্রা অনেকটা অপরিবর্তন অবস্থায় থাকলেও উপরিভাবে তা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এর কারণ হলো অজোন স্তর কর্তৃক সূর্যের আলো চুষে নেওয়া। স্ট্রাটোসস্ফিয়ার কোনো আবহওয়াজনিত ক্রিয়া থেকে প্রায় পুরোপুরি মুক্ত এবং সেখানে কোনো মেঘমালাও নেই।

৩. অজোন স্তর

স্ট্রাটোসস্ফিয়ারের অভ্যন্তরেই একটি উপস্তর আছে যাকে অজোন লেয়ার বলে। ১২ থেকে ৩০ মাইলের ভেতর এই স্তরের অবস্থান। এখানে এক মিলিয়নের এক দশমাংশ পরিমাণ বস্তু হলো অজোন [Ozone] নামক বিষাক্ত গ্যাস। অক্সিজেনের উপর সূর্যের আলো পতিত হয়ে এই অজোনের সৃষ্টি হয়। কোটি কোটি বছর যাবৎ এই ক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও বায়ুমণ্ডলের অকৃত্রিম নাইট্রোজেন এই অজোনকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এই গ্যাস যদি নীচে নেমে আসে তাহলে শ্বাস-নিঃশ্বাসের সময় তা

আমাদের ফুসফুসে ঢুকে বিরাট ক্ষতি করবে। অপরদিকে ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে এই অজোন থাকার পেছনেও বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে। অজোন আমাদের জন্য যেটুকু ক্ষতিকর তারচেয়ে আরো মারাত্মক আরেকটি উপাদান হলো আলট্রা-ভাইলোট রেডিয়েশন [Ultra Violet Radiation] যা সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীপানে প্রতিনিয়ত ধেয়ে আসে। এই তেজষ্ক্রিয়া থেকে ক্যান্সারের জন্ম হয়। অজোন না থাকলে তা সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসতো। অজোন আলট্রা-ভাইলোট রেডিয়েশনকে পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে বাধাদান করে। এ কারণেই গেল শতকের সত্তুর দশকে যখন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন [chlorofluorocarbon - CFC] নামক একটি রসায়নিক দ্রব্য এই অজোন লেয়ারের জন্য মারাত্মক তখন পৃথিবীব্যাপী একটি ক্যাম্পেইন শুরু হয়। উল্লেখ্য এ্যারোসল ও ফ্রিজারে এই ‘সিএফসি’ গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাস চলে যাওয়ার পর সূর্যালোক একে ভেঙ্গে ফেলে। এতে আছে বিষাক্ত ক্লোরিন- যা অজোনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে অজোনকে ধ্বংস করে দেয়। অজোন লেয়ার ধ্বংসের ফলে চামড়ার ক্যান্সার বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কিছু শস্যাদির ক্ষতি ও কার্বন ডাইওক্সাইড বৃদ্ধি করে, ফলে পুরো পৃথিবীব্যাপী বৃক্ষরাজির ফলনে হ্রাস হয়।

ইতোমধ্যে অজোনকে আমরা কতটুকু ধ্বংস করে ফেলেছি তার প্রমাণ গত শতকের আশির দশকে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ্যান্টারক্টিকা মহাদেশে পরীক্ষা চালানোকালে ঊর্ধ্ব আকাশে ‘অজোন হোল’ [ozone hole] আবিষ্কার করেন। অপরদিকে আরক্টিট এলাকায়ও অনুরূপ আরেকটি ছিদ্র দেখা গেছে। সুখের বিষয় যে, পুরো পৃথিবীব্যাপী ক্যাম্পেইনের ফলে এখন সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বিজ্ঞানীদের গভীর গবেষণা ও ওয়ার্নিংয়ের ফলে আপাতত আমরা অজোন লেয়ারের ধ্বংস থেকে বেঁচে গেছি।
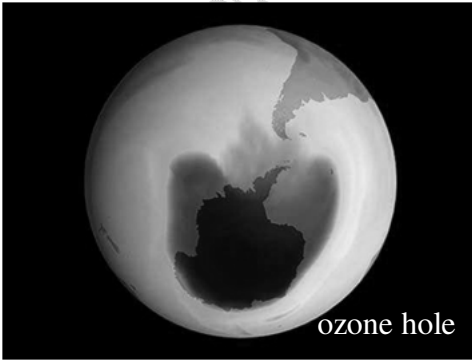
৪. মেজোস্ফিয়ার

এই স্তরের শুরু ৫০ মাইল ঊর্ধ্বে এবং আরও ৪০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। মেজোস্ফিয়ারের বৈশিষ্ট্য হলো তাপমাত্রার দ্রুত অধঃপতন। তবে এর পরের স্তরের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৬. থার্মোস্ফিয়ার

এই স্তরটির শুরু পৃথিবী থেকে ৬০ মাইল ঊর্ধ্বে। এই স্তরটির নামকরণ থেকেই বুঝা যায় এখানে তাপমাত্রা খুব বেশী। কোনো কোনো সময় এর মাত্রা ১২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে।
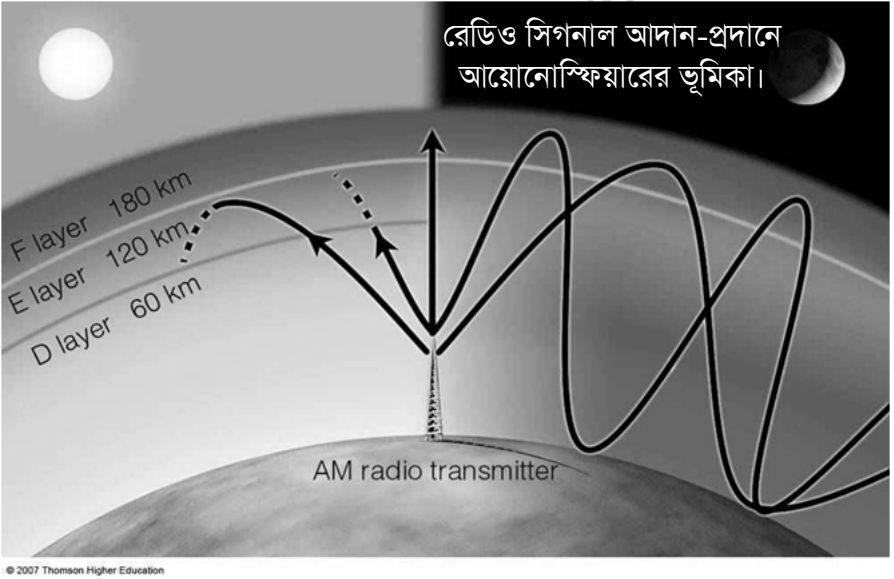
৭. আয়োনোস্ফিয়ার

থার্মোস্ফিয়ারের শুরু থেকে ৬০০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত একটি বিশেষ স্তর আছে যাকে বলা হয় আয়োনোস্ফিয়ার। এতো ঊর্ধ্বে বাতাসের ভর বা ম্যাস খুব অল্প। তবে এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ‘আনোনাইজড্’ [Ionized] বস্তু বিদ্যমান।

আইয়োনাইজেশনের অর্থ হলো, বৈদ্যুতিকভাবে মলিকিউল বা পরমাণু 'চার্জ' হওয়া। সাধারণভাবে পরমাণু বা মলিকিউল চার্জশূন্য তথা নিউট্রেল অবস্থায় থাকে। তবে চার্জ [নেগিটিভ বা পজিটিভ] হলে এই ব্যালান্স থাকে না। আয়োনোস্ফিয়ারে মলিকিউল ও পরমাণু চার্জ হয় সূর্য থেকে আগত আলট্রাভাইলোট রশ্মি দ্বারা। এই স্তরের গুরুত্ব রেডিও সিগনালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ট্রান্সমিটার যন্ত্র থেকে সিগনাল আয়োনোস্ফিয়ারে যেয়ে পৃথিবীপানে আবার ফিরে আসে। সেখানকার বাতাসে আয়োনাইজড্ কণা না থাকলে এরূপ হতো না। এই স্তরকে পৃথিবী গোলকের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে রেডিও সিগনাল প্রেরণে ব্যবহার করা হয়।

পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ ও অভ্যন্তর

পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ হলো গ্রহের বহির্ভাগস্থ স্তর। এতে আছে হাইড্রোস্ফিয়ার [hydrosphere], ক্রাস্ট [crust] ও বায়োস্ফিয়ার [biosphere]। নিম্নের দিকে আরো বেশ ক'টি আলাদা স্তর আছে। নীচের [পরের পৃষ্ঠার] চিত্রে আমরা এসব স্তরের দৃশ্য তুলে ধরেছি। অভ্যন্তরের স্তরগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে প্রথমে ভূপৃষ্ঠের স্বরূপ কি তা জেনে নিলে ভালো হয়।

হাইড্রোস্ফিয়ার

এই নাম থেকেই আমরা বুঝতে পারছি যে, পৃথিবীর উপর পানি কি পরিমাণ আছে তা-ই হলো হাইড্রোস্ফিয়ার। গ্রহের পুরো ভূপৃষ্ঠের ৭১% পানি দ্বারা আবৃত। এর প্রায় সবই মহাসাগরে বিদ্যমান। বাস্তবে ৯৭% পানি সাগর-মহাসাগরে লবণাক্ত অবস্থায় আছে। বাকী ৩% হাওর, বিল, লেক, নদী, নালা, মেঘ এবং উভয় মেরুতে কঠিন বরফ আকারে মিঠা পানি হিসাবে চলমান। এই তিন শতাংশের ২ শতাংশ উভয় মেরুতে এবং ০.৬ শতাংশ মাটির নীচে বিদ্যমান। মাত্র ০.০১৭ শতাংশ মিঠা পানি নদী, নালা, হ্রদ, জলাশয়, হাওর-বিল ও মেঘ আকারে আছে। তবে এই মিঠা পানি পানের যোগ্য হলেও সাগর-মহাসাগরের পানিতে ৩.৫% লবণ থাকায় তা পান করা অসম্ভব। আজকাল অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে সাগরের পানিকে লবণমুক্ত করে পানের যোগ্য করা সম্ভব।

ক্রাস্ট

পৃথিবীর কঠিন উপরিভাগকে ক্রাস্ট বলে। সকল স্থলভূমি ও সাগরতলের মাটি এই ক্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত। শুষ্ক স্থলভূমিকে বলে কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট [continental crust] যা ১৫ থেকে ৭৫ কিমি [৯ থেকে ৪৭ মা] পর্যন্ত ঘন। স্বভাবতই মহাসাগরের তলদেশের ক্রাস্ট শুষ্ক স্থলভূমি থেকে কম ঘন। এর গড় ঘনত্ব ৫ থেকে ১০ কিমি [৩ থেকে ৬ মা] এর অধিক নয়। ক্রাস্টের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, একে বলে মোহো। এই সীমারেখা ক্রাস্ট ও নীচের ম্যান্টল স্তরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। মহাসাগরের তলদেশের ক্রাস্ট ও মহাদেশের ক্রাস্টের মধ্যে শিলাবস্তুর দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পুরো ক্রাস্ট মূলত তিন ধরনের শিলা দ্বারা ঘটিত: ১. ইগনিয়াস [igneous] [আগ্নেয়], ২. সেডিমেন্টারি [sedimentary] [পাললিক] ও ৩. মেটামোরফিক [metamorphic] [রূপান্তরিত]।
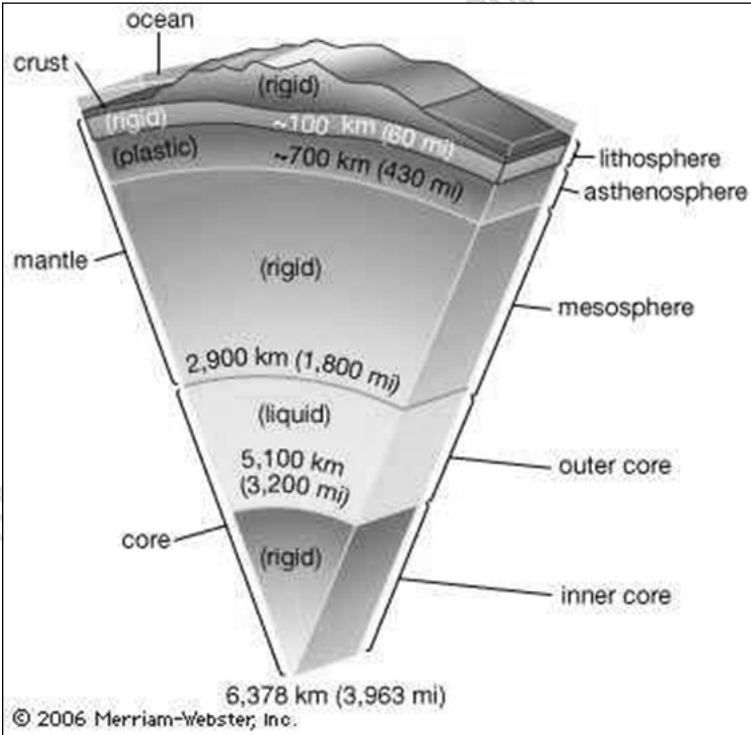
বায়োস্ফিয়ার

পৃথিবীর জীবন-সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত মণ্ডলকে বলে বায়োস্ফিয়ার [biosphere]। উপরে ৬ মাইল থেকে নিম্নে গভীর সাগরতল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। মূলত পৃথিবীর যেসব জায়গায় জীবাণুসহ যে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে সক্ষম তা সবই বায়োস্ফিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত মনে করা হয় সূর্যের আলো ও এনার্জি ছাড়া কোনো প্রাণীই জ্যান্ত থাকতে পারে না। বায়োস্ফিয়ারের মৌলিক ক্রিয়াদি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর যাবৎ অব্যাহত আছে। তবে প্রাণীদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে মণ্ডলের মধ্যে ভিন্নতা বিদ্যমান। এই বড় মাত্রার ভিন্নতাকে বুঝানোর জন্য বিজ্ঞানীরা বায়োস্ফিয়ারকে একাধিক অংশে বিভক্ত করেছেন যার নাম বায়োমি।

মঙ্গল গ্রহ

সূর্য থেকে বাইর দিকে চতুর্থ স্থানে অবস্থান করছে মাটির তৈরী লাল গ্রহ মঙ্গল। আদি কাল থেকেই মঙ্গলের লাল রং ও দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে দৃশ্যমান রেখা ইত্যাদি ভাবুক মানুষকে গ্রহটি রোমাঞ্চকর করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক ঔপন্যাসিক এইচ জি ওয়েলস ১৮৯৮ সালে 'দ্যা ওয়ার অব দ্যা ওয়ার্লডস্' নামক
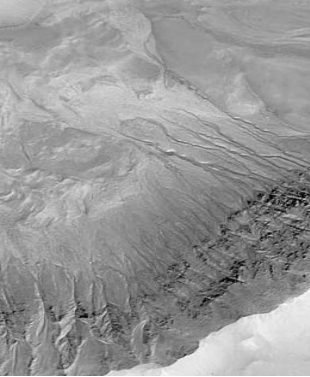
বিজ্ঞানীদের ধারণা মঙ্গলের একটি গর্তের দেওয়ালের এসব চ্যানেল অতীতে গড়িয়ে পড়া পানির স্রোতে সৃষ্টি হয়েছে। পুরো এলাকায় মিটিওর পতনের ফলে সৃষ্ট গর্তের অনুপস্থিতি এবং স্পষ্টতা থেকে এটাও মনে করা হয় যে, এসব নালা তুলনামূলকভাবে গ্রহের নিকট-অতীতের ঘটনা। অনেকে মনে করেন, মঙ্গলের অভ্যন্তরে হয়তো এখনও তরল অবস্থায় পানি বিদ্যমান আছে।

উপন্যাস লিখে মঙ্গলকে আরোও রোমাঞ্চকর করে তুলেন। কাল্পনিক এই উপন্যাসে লেখক পৃথিবীর উপর মঙ্গলবাসীদের আক্রমণ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য পৃথিবীর মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যারপরনেই চেষ্টা চালিয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের বায়ুমণ্ডল আক্রমণকারীদের জন্য মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো এবং আমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে এরূপ কাহিনী রোমাঞ্চকর ও চিত্তাকর্ষক হলেও বাস্তবে মঙ্গল একটি প্রাণীশূন্য লাল মাটির তৈরী ঠাণ্ডা গ্রহ বৈ নয়। নিম্নে মঙ্গলের উপর জানা তথ্যাদি তুলে ধরা হলো।

মঙ্গল সূর্য থেকে গড়ে ২২৮ মিলিয়ন কিমি [১৪১ মিলিয়ন মা] দূরত্বে থেকে প্রদক্ষিণরত আছে। মঙ্গলের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। এর বিষুবরেখার ব্যাসার্ধ ৩৩৯৬ কিমি। ম্যাস বা ভর হলো ৬.৪২ x ১০২৩ কিগ্রা এবং গড় ঘনাঙ্ক ৩.৯ গ্রা/কিউবিক মিটার। মঙ্গল তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে প্রতি ১.০৩ দিনে একবার ঘুরে আসে। মঙ্গলের একদিন তাই আমাদের একদিনের প্রায় সমান। তবে এর বছর ১৮৪১ দিনে হয়। অর্থাৎ সূর্যকে একবার কক্ষপথে ঘুরে প্রদক্ষিণ করতে এটুকু সময় অতিবাহিত হয়। ডিমোস এবং ফোবোস নামক গ্রহের নিজস্ব দু’টি অকৃত্রিম উপগ্রহ তথা চন্দ্র আছে।

ফবোস থেকে মঙ্গল: মঙ্গলের দূ’টি চাঁদের একটি হলো ফবোস। এই চাঁদ থেকে মঙ্গলকে কিরূপ দেখা যাবে তার একটি কল্পিত দৃশ্য।

পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব সর্বনিম্ন ৫৬ মিলিয়ন কিমি [৩৫ মিলিয়ন মাইল] এবং সর্বোচ্চ ৩৭৫ মিলিয়ন কিমি [২৩৩ মিলিয়ন মাইল] পর্যন্ত হয়ে থাকে। উভয় গ্রহ অনেক দিন পরপর নিকটতম স্থানে অবস্থান করে। গত ২০০৩ সালের আগস্টে পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে দূরত্ব ছিলো সর্বনিম্নে। পরবর্তী ক্লোজ এনকাউন্টার ২২৮৭ ঈসায়ীর পূর্বে আর হবে না।

মঙ্গলের স্থলভূমি

আমাদের জন্য বেঁচে থাকা মঙ্গলের উপর সম্ভব হবে না- হলেও, বেশ কঠিন তো অবশ্যই হবে। অথচ গ্রহের স্থলভূমি অনেকটা পৃথিবীর কিছু কিছু অঞ্চলের মতো। কিন্তু ব্যাপার হলো, সূর্য থেকে বেশী দূরত্বে অবস্থান করার ফলে গ্রহের মাটির উপরস্থ তাপমাত্রা কোনো সময়ই আমাদের মেরুদ্বয় থেকে বেশী হয় না। গড় তাপমাত্রা কোনমতে -৫৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়। অবশ্যই স্থলভূমি সম্পূর্ণ শুষ্ক- পানি বা পানীয় জাতীয় কোনো কিছু নেই। তবে অনেকের ধারণা অতীতে মঙ্গলে বড় বড় নদী নালা ছিলো যেগুলোর শুষ্ক নিম্নভূমি এখনও দৃশ্যমান আছে। উভয় মেরুতে কিন্তু অনেক হিমায়িত বরফ বিদ্যমান- অনেকটা আমাদের পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের মতো।

মঙ্গলভূমি: বাস্তব ছবি

অলিম্পাস মন্স

নীচের (পরের পৃষ্ঠার) চিত্রটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি সৌরগতের মধ্যে এ পর্যন্ত জানা সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি। অলিম্পাস মন্স নামক এই আগ্নেয়গিরি উচ্চতায় ২৬ কিমি [১৬ মাইল] যা এভারেস্টের দ্বিগুণ থেকে বেশী এবং এর বেইজের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের দূরত্ব ৬০০ কিমি [৩৭৫ মাইল]।

অলিম্পাস মন্স, সৌরজগতের আগ্নেয়গিরি-সৃষ্ট সর্বোচ্চ পর্বত।

অলিম্পাস মন্সের নিকটে আরো তিনটি বিরাট আগ্নেয়গিরি দেখতে পাওযা যায়। এগুলোর নাম হলো আরসিয়া মন্স, পাবোনিজ মন্স এবং আসক্রিউস মন্স। এপর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা গেছে মঙ্গলের কোনো আগ্নেয়গিরিই বর্তমানে সক্রিয় নয়- সবগুলো নীরব।

অনেকের মতে অতীতে মঙ্গলে পানির চলাচল ছিলো। প্রমাণস্বরূপ **১২১** পৃষ্ঠার ছবিটির কথা বলা হয়ে থাকে। ছবিতে সুদূর অতীতে পানি গড়িয়ে পড়ার দাগ দেখাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এসব দাগ অন্য কারণেও সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভাইকিং নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গলে প্রেরণ করা হয়েছিল এর মাটির ছবি তোলার জন্য। উপগ্রহটি দীর্ঘদিন মঙ্গলের চতুর্দিকে কক্ষপথে ঘূর্ণমান থেকে প্রায় ৫০,০০০ ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এসব ছবির উপর গবেষণা চালিয়েই আমরা গ্রহের মাটি, আবহাওয়া, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি সম্পর্কে

অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। বিশেষ করে উভয় মেরুতে যে বরফ আকারে পানি বিদ্যমান তা নিশ্চিত হওয়া গেছে।

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত পাতলা। এতে আছে ৯৫% কার্বন ডাইওক্সাইড। বাকী ৫% এর মধ্যে ৩% নাইট্রোজেন, প্রায় ২% আরগন এবং অতি অল্প মাত্রায় অক্সিজেন ও কার্বন মনোক্সাইড। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় মঙ্গলে মাত্র ১ শতাংশ চাপ বিদ্যমান। মঙ্গলের উপর শীত মৌসুমে অত্যল্প তাপমাত্রার কারণে সৃষ্টি হয় এক মিটার পর্যন্ত ঘন কার্বন ডাইওক্সাইডের তৈরী শুষ্ক বরফের কার্পেট। তবে গ্রীষ্মকালে তা আবার গলে বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে অত্যল্প মাত্রায় মেঘমালারও জন্ম হয়। এছাড়া ধুলোঝড় প্রায়ই হয়ে থাকে।

মঙ্গলে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ

পৃথিবী থেকে মাহাকাশ পাড়ি দিয়ে এতো দূরে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু এরপরও মানুষ থেমে নেই- এ পর্যন্ত বেশ ককেকটি মহাকাশযান ওখানে প্রেরণ করে অনেক তথ্য সংগ্রহিত হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত মোট ৩৭টি কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। প্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা এসব উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। তবে এদের মধ্যে মাত্র ১৭টি উৎক্ষেপণ পর্যায় পেরিয়ে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে সক্ষম হয়। ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২টি মহাকাশযান প্রেরিত হলেও মাত্র ৬টি লক্ষ্যর্জনে সক্ষম হয়ে আমাদেরকে মঙ্গল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য দিয়েছে। মঙ্গল মিশনের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে বিরাট দূরত্ব। কয়েক শতাব্দির ব্যবধানে গ্রহটি পৃথিবীর নিকটে আসে- অর্থাৎ অধিকাংশ সময় দূরবর্তী স্থানেই তা থেকে যায়। সাধারণত বর্তমানে মঙ্গলে আলোকের গতিতে প্রেরিত রেডিও সিগনাল পৌঁছতে ২০ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। সুতরাং ওখানকার মহাকাশে প্রদক্ষিণরত মহাকাশযানে কোনো সিগনাল প্রেরণ করে তা ফেরৎ পেতে অন্তত ৪০ মিনিট সময় অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থাকে টাইম-লাগ [time-lag] বলে। সৌরজগতের আরো দূরবর্তী গ্রহগুলোয় মহাকাশযান প্রেরণ করে এই টাইম-লাগ হেতু বেশ বেগ পেতে হয়। যা হোক, সকল

প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে মানুষ মহাকাশ ও সৌরজগতের উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে- ভবিষ্যতেও চালাবে।

মারিনার ও ভাইকিং মিশন

আমেরিকার মাহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা [নেশন্যাল এ্যারোনেটিক্স এন্ড স্পেইস এডমিনিস্ট্রেশন] ১৯৬৪ সালে সর্বপ্রথম মারিনার-৩ ও মারিনার-৪ কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপণ করে। মারিনার-৪ সফলভাবে গ্রহের নিকট-মহাকাশে পৌঁছে ১৯৬৫ সালে। এই ফ্লাইবাই প্রোগ্রাম থেকে বেশ ক'টি ছবি সংগ্রহিত হয়। ফ্লাইবাই যখন সংগঠিত হচ্ছিলো তখন পৃথিবীর মানুষ অধীর অপেক্ষায় দিন গুণছিল আর ভাবছিলো, না জানি মঙ্গলে কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের সন্ধান মিলে কি না। কিন্তু এই ক্লোজ-এনকাউন্টার থেকে স্পষ্ট হলো যে, মঙ্গলে আসলে বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক লেখকদের কর্তৃক কল্পিত কোনো উচ্চ-বুদ্ধিসম্পন্ন সভ্যতার অস্তিত্ব নেই।
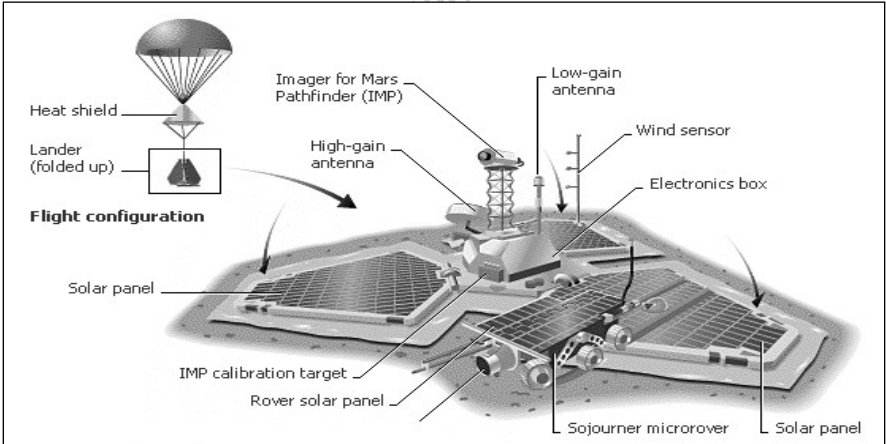
ঐতিহাসিক পাথফাইন্ডার মিশন: ১. উপরের প্রথম ছবিতে আমরা পাথফাইন্ডার মহাকাশযানের একটি অঙ্কিত চিত্র দেখতে পাচ্ছি। ১৯৭৭ সালে আমেরিকা এই

মিশন মঙ্গলে প্রেরণ করে। এই মিশনের মূল অংশ হিসাবে ক্যামেরা ও বায়ুমণ্ডল পরীক্ষার যন্ত্রাদিসহ একটি জটিল ল্যান্ডার [অবতরণযান] ছিলো। ল্যান্ডার অবতরণ করে চতুর্দিকে তার বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে দেয় যাতে করে ভেতরের অত্যাধুনিক রবোট রোভার বেরিয়ে এসে মঙ্গলের মাটি ও বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা শুরু করতে পারে। ২. নচিরে দ্বিতীয় ছবিটি আসলে মঙ্গলের উপর অবতরণ শেষে মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ ক্যামেরা থেকে তুলে প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ল্যান্ডারের সফলতা স্পষ্ট হয়েছে।
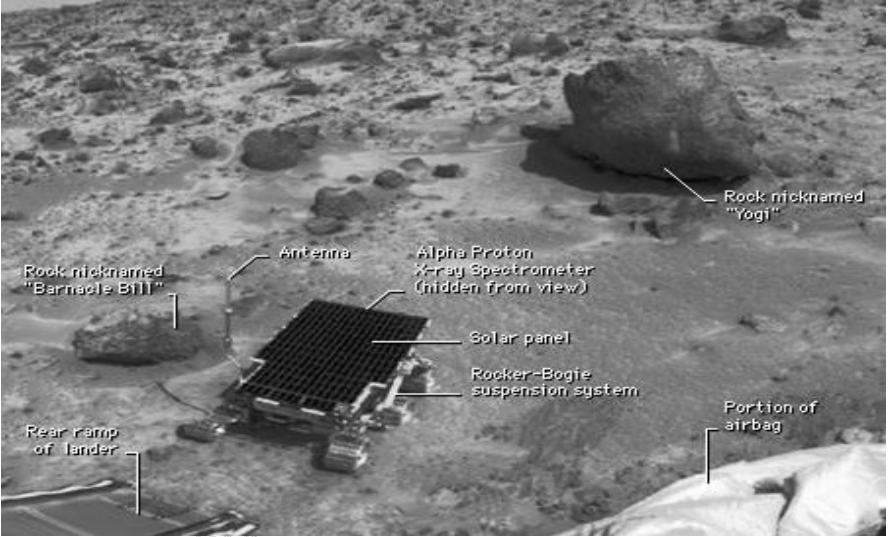
এরপর মারিনার-৬ ও মারিনার-৭ ১৯৬৯ সালে ফ্লাইবাই করাকালে আরো অনেক স্পষ্ট ছবি প্রেরণ করে। উভয় মহাকাশযান কর্তৃক গ্রহের গবেষণা থেকে আমরা আরও জানতে পারলাম মহাকর্ষ ফিল্ড ও বায়ুমণ্ডলের উপর অনেক তথ্যাদি। তবে এসব প্রাথমিক মিশন থেকে স্বয়ং লাল এ গ্রহের উপর তথ্যাদি অত্যল্পই পাওয়া যায়। পরে নাসা ১৯৭৫ সালে আরো দু'টি মাহাকাশযান মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। এগুলোর নাম ছিলো ভাইকিং-১ ও ভাইকিং-২। উভয় যান অত্যন্ত পরিষ্কার কিছু ছবি প্রেরণ করে- এতে আমরা গ্রহের স্থলভূমি ও বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে অনেক সূক্ষ্ম তথ্যাদি জানতে পারি। ভাইকিং মহাকাশযানের সঙ্গে ছিলো অরবিটার

বা প্রদক্ষিণযান। এগুলো স্থায়ীভাবে মঙ্গলের মহাকাশ কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে পুরো গ্রহের উপর সার্ভে করতে থাকে। এ থেকে গোলকের একটি ম্যাপ তৈরী হয়। তবে ভাইকিং মিশনের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক দিক ছিলো প্রথম সফল কৃত্রিম মহাকাশযানের অবতরণ।
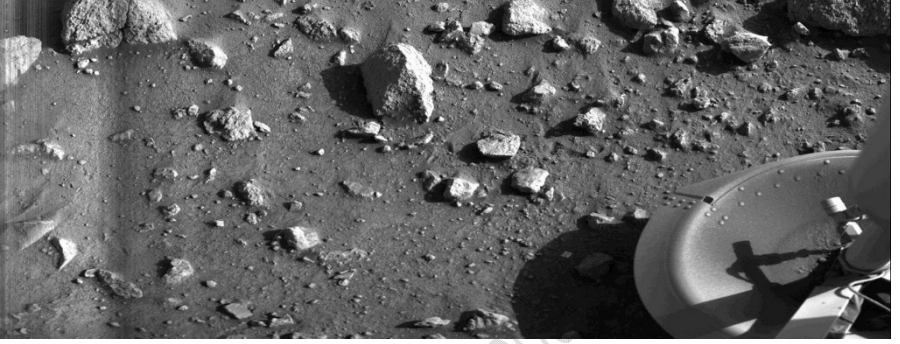
অন্য গ্রহে মানবসৃষ্ট প্রথম কৃত্রিম মাহাকাশযান ভাইকিং-১ জুলাই ২০, ১৯৭৬ সালে অবতরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করে। অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই মঙ্গলের মাটির একটি ছবি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। উপরে এই ঐতিহাসিক ছবিটি দেখা যাচ্ছে।[16] এ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে মঙ্গলের মাটি সত্যিই ঈষৎ লাল বর্ণের। এরপর একই সালের ৩ সেপ্টেম্বর ভাইকিং-২ ভাইকিং-১ এর অবতরণস্থল থেকে ৪০১৪ মাইল দূরত্বে অবতরণ করে। উভয় মহাকাশযানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী কিছু যন্ত্রপাতি ছিলো। ওসব যন্ত্রের মাধ্যমে মঙ্গলের মাটি ও বায়ুমণ্ডল সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা শেষে ফলাফল রেডিও সিগনালের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মঙ্গলের মাটি সম্পূর্ণ প্রাণীশূন্য। মূলত গ্রহের মধ্যে প্রাণী বেঁচে থাকার মতো মৌলিক ব্যবস্থাপনাই নেই।

[16] সূত্র: https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/

অন্যান্য মঙ্গল মিশন

মঙ্গলে ভাইকিং মিশন শেষে গ্রহের উপর আগ্রহ অনেকটা কমে যায়। এর মূল কারণ ছিলো জীবন্ত কোনো জীবাণু পর্যায়ের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীও সেখানে না পাওয়ার হতাশা। কারণ, অনেকেই মনে করেছিলেন মঙ্গল গ্রহই হবে বিংশ শতকের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক আবিষ্কারের ক্ষেত্র- অর্থাৎ অন্য গ্রহে প্রাণী থাকার প্রমাণ। কিন্তু তা হলো না- এই হতাশা হেতু নাসাসহ পৃথিবীর সকল মহাকাশ অনুসন্ধান সংস্থায় মঙ্গলাগ্রহে ভাটা পড়ে যায়। এছাড়া সংলিশ্লষ্ট সরকারগুলো থেকেও প্রয়োজনীয় মোটা অঙ্কের বাজেট মিলে নি। মনে রাখা দরকার একেকটি মঙ্গল মিশনে বিরাট অঙ্কের পাউন্ড-ডলার ব্যয় হয়। যা হোক, দীর্ঘ ১৭ বছর পর ১৯৯২ সালে নাসা পুনরায় মার্স অবজারভার নামক একটি মিশন শুরু করে।

মার্স অবজারভার মিশন কিন্তু নস্যাৎ হয়ে যায়। মঙ্গলে পৌঁছার মাত্র ৩ দিন পূর্বে এর সঙ্গে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং আরোও চার বছর পর ১৯৯৬ সালে মার্স গ্লোবেল সার্ভেয়ার নামকরণে একটি মিশন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এক বছর পর মহাকাশযান সফলভাবে মঙ্গলের কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছে। এরপর ১৯৯৭ সালে মার্স পাথফাইন্ডার মহাকাশযান সফলভাবে মঙ্গলে অবতরণ করে। পাথফাইন্ডার দীর্ঘ ৮৩ মঙ্গল-দিন তার পরীক্ষা-নিরীক্ষণ অব্যাহত রেখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এরপর মার্স ক্লাইমেট অরবিটার ও মার্স পোলার ল্যান্ডার নামক দু'টি মহাকাশযান যথাক্রমে ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উভয় যান মঙ্গলে অবতরণকালে ধ্বংস হয়ে যায়। তবে মঙ্গল মিশন থেমে নেই। ২০০১ সালে মার্স অডিসি নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গলের কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছে। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিলো পুরো গ্রহের ম্যাপ করা। মিশনটি সফল হয়েছে। আমেরিকার নাসা কর্তৃক লেইটেস্ট মঙ্গল মিশনের নাম ছিলো 'মার্স এক্সপ্লোরেশন রোভার মিশন'। সফল এই মিশনের মূল অংশ হিসাবে স্পিরিট ও অপোর্চুনিটি নামক দু'টি ল্যান্ডার মহাকাশযান মঙ্গলে অবতরণ করে চিত্তাকর্ষক ছবি ও বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রেরণ করে।

আমেরিকার নাসা ছাড়াও অন্যান্য দেশের মহাকাশ সংস্থা মঙ্গল মিশনে জড়িত ছিলো। প্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে মোট ১২টি

যান মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। এগুলো কোনটিই সম্পূর্ণ সফল হয় নি। এরপর ১৯৭৩ সালে মার্স-৪, ৫ ও ৬ মিশন সফলভাবে সম্পাদিত হয়। ১৯৮৮ সালে প্রেরিত পরবর্তী মিশনের নামকরণ ছিলো ফোবোস। মঙ্গলের দু'টি চন্দ্রের একটির নাম ফোবোস। এই চন্দ্রটির উপর গবেষণার উদ্দেশ্যে ফোবোস মিশন প্রেরিত হয়। মিশনে মোট দু'টি আলাদা মহাকাশযান ছিলো। ফোবোস-১ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ফোবোস-২ সফলভাবে গন্তব্যে পৌঁছে চন্দ্র ও মঙ্গলের অনেক তথ্যাদি প্রেরণ করে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর মঙ্গল মিশনের প্রতি রাশিয়ার আগ্রহ অনেকটা কমে যায়- তবে ১৯৯৬ সালে একটি মিশন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণকালে মার্স-৯৬ নামক কৃত্রিম উপগ্রহটি দুর্ঘটনার স্বীকার হয়ে পৃথিবীতেই আবার ভূপাতিত হয়ে যায়।

ইউরোপিয়ান স্পেইস এজেন্সি [ইএসএ] এবং জাপান কর্তৃকও মঙ্গল মিশন হয়েছে। ২০০৩ সালে ইএসএ মার্স এক্সপ্রেস নামক মহাকাশযান মঙ্গলের কক্ষপথে সফলভাবে স্থাপিত করেছে। তবে মিশনের মূল উদ্দেশ্য সফলতার আলো দেখে নি। বিগল-২ নামক একটি ল্যান্ডার এক্সপ্রেস থেকে আলাদা হয়ে মাটির উপর অবতরণকালে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এটির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। জাপানও একটি ব্যর্থ মিশন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিল। নজোমি নামক এই মহাকাশযান ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে সফলভাবে পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণ শেষে সূর্যের চতুর্দিকে কক্ষপথে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মঙ্গলের দিকে প্রেরণের 'ট্রাজেকটোরি' [trajectory] বা বঙ্কিমপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যানটি অনেকদূর অন্যদিকে ছুটে পড়ে- ফলে এটাকে সঠিক পথে আনয়ন করা আর সম্ভব হয় নি।

মঙ্গলের উপর আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক দু'টো কথা বাকী আছে। মাটির মানুষ যদিও পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্রের উপর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু অপর কোনো গ্রহে পদার্পণ করতে সক্ষম হয় নি। সৌরজগতের মধ্যে নিকট ভবিষ্যতে একমাত্র মঙ্গল ছাড়া অপর কোনো গ্রহে মানুষ অবতরণ করতে পারবে বলে মনে হয় না। সুতরাং মঙ্গলে মানুষ প্রেরণের আকাক্সক্ষা অনেকের। এ ক্ষেত্রে আমেরিকার নাসা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। তারা ঘোষণা দিয়েছে ২০১৫ সাল নাগাদ চন্দ্রের উপর একটি 'এ্যাস্ট্রনাট বেইজ' সম্পন্ন

করা হবে। এরপর এই বেইজ থেকেই একুশ শতকের মাঝামাঝির দিকে মঙ্গলে মানুষ প্রেরণ করা হবে। সুতরাং ২০ থেকে ৩০ কিংবা ৪০ বছরের মধ্যেই হয়তো সর্বপ্রথম মানুষ মঙ্গলে পদার্পণ করে বলবেন, "একটি ছোট্ট পদক্ষেপ ছোট্ট একটি মানুষের জন্য, কিন্তু এক বিরাট বিরাট উঁচু লাফ সমগ্র মানবজাতির জন্য!"।

গ্রহাণুপুঞ্জ বেল্ট

আমরা এবার মঙ্গলের মহাকাশ ছেড়ে দ্রুত পরবর্তী গ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো। তবে এর পূর্বে পথিমধ্যে এক বিরাট এলাকা জুড়ে অসংখ্য এ্যাস্টারোইড বা গ্রহাণুপুঞ্জের অবস্থান থাকায় এগুলো সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা জানা গেছে তা একটু তলিয়ে দেখা যাক। বিজ্ঞানীরা আলুর মতো এই ক্ষুদ্র থেকে বেশ বড় আয়তনের বস্তুকে এ্যাস্টারোইড বলেন। যেখানে এ্যাস্ট্ররোইড অবস্থান করে সূর্যের কক্ষপথে ঘূর্ণমান আছে ঐ এলাকাটির নাম এ্যাস্টারোইড বেল্ট। সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতি ও ইতোমধ্যে আলোচিত মঙ্গল গ্রহের মধ্যখানে এসব গ্রহাণুপুঞ্জের
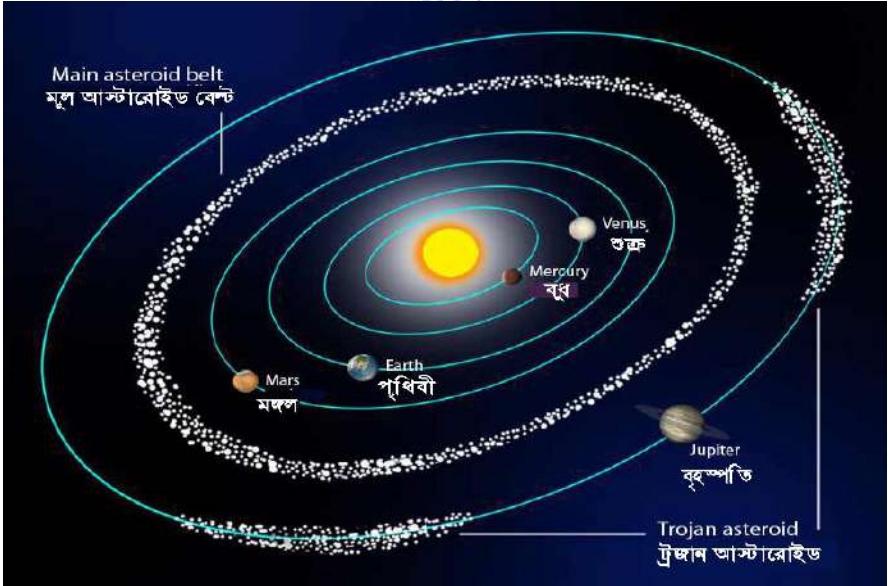
অবস্থান। অনেকের মতে সুদূর অতীতে কোনো একটি বৃহৎ গ্রহ বিস্ফোরিত হয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর এসব বস্তু এ্যাস্টারোইড হিসাবে অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

এ্যাস্টারোইড সাধারণত খুব একটা বড়ো হয় না। সর্ববৃহৎ এ্যাস্টারোইডের ব্যাস ১০০৩ কিমি [৬২৩ মাইল]। একে 'সেরেস' নামে সম্বোধন করা হয়। ব্যাসের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে আছে 'পালাস' এবং তৃতীয় স্থানে 'ভেস্টা' [উভয়ের ব্যাস প্রায় ৫৫০ কিমি [৩৪০ মাইল]।

এ পর্যন্ত আমরা বেশ ক'টি এ্যাস্টারোইডের নাম উল্লেখ করেছি। তবে কে এসব নামকরণ করে? ইন্টারনেশন্যাল এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিয়ন [আইএইউ] নামক একটি আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা আছে। মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু যেমন ধূমকেতু, এ্যাস্টারোইড, নতুনভাবে আবিষ্কৃত তারা, গ্যালাক্সি ইত্যাদির নামকরণ এই সংস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। অজানা কোনো বস্তুকে কেউ আবিষ্কার করার পর এই সংস্থার নিকট তার সংবাদ প্রেরণ করেন। আইএইউ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যদি মনে করে উক্ত আবিষ্কারক সত্যিই সর্বপ্রথম এটা পর্যবেক্ষণ করেছেন তাহলে প্রথমেই বস্তুটিকে বিশেষ সংখ্যা দ্বারা ক্যাটালগ করা হবে। এরপর উক্ত আবিষ্কারককে নামকরণের ইখতিয়ার দেওয়া হয়। এভাবেই মহাকাশে আবিষ্কৃত বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ করা হয়ে থাকে।
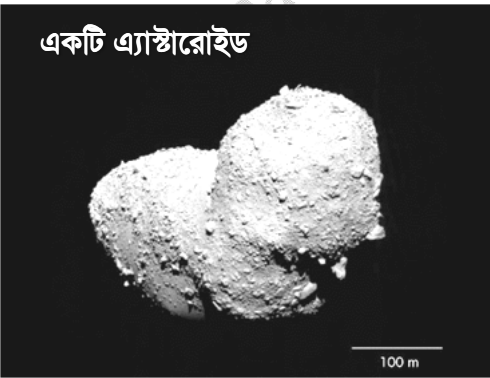
এ পর্যন্ত জানা প্রায় ২০০ এ্যাস্টারোইড আছে যাদের ব্যাস ৯৭ কিমি [৬০ মাইল] বা তারচেয়ে বেশী। আর এরচেয়ে কম ব্যসবিশিষ্ট বিভিন্ন আকার ও আয়তনের হাজার হাজার এ্যাস্টারোইড আছে বলে মনে করা হয়। সবগুলো এ্যাস্টারোইড মিলিয়ে যে ভর বা ম্যাস হবে তা আমাদের চন্দ্রের তুলনায়ও কম। অধিকাংশ এ্যাস্টারোইড তাদের নিজস্ব

মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ৫ থেকে ২০ ঘণ্টার মধ্যে একবার ঘুরে আসে। এছাড়া সবগুলোর তো বাৎসরিক কক্ষপথে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণন গতি আছেই। তবে এটা জানা কথা যে, এ্যাস্টারোইড সময় সময় নিজেদের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। অনেকের ধারণা সূর্যের তাপ এদের উপর ভিন্ন স্থানে ভিন্নভাবে পতিত হওয়ার ফলে এই বিচ্যুতি ঘটে। কারণ সূর্যের তাপে এ্যাস্টারোইডের দেহে তাপ তারতম্য অধিক হয়ে যায়। ফলে কক্ষপথ থেকে খুব ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, নিকটস্থ বিরাট আয়তনের শক্তিশালী গ্রহ বৃহস্পতির মহাকর্ষের প্রভাবে এই বিচ্যুতি ঘটে। যে কারণেই ঘটুক না কেনো এ্যাস্টারোইড আমাদের জন্য বিরাট হুমকি- একথা অবাস্তব নয়। ছোট্ট থেকে মাঝারি আয়তনের কোনো এ্যাস্টারোইড যদি কক্ষচ্যুত হয়ে আল্লাহ না করুন পৃথিবীতে এসে পতিত হয় তাহলে কিয়ামত কা- ঘটে যাবে! এরূপ একটি ইমপেক্টের ফলেই সুদূর অতীতে ডাইনোসর নামক বিরাটকায় জন্তু চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায় বলে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা।
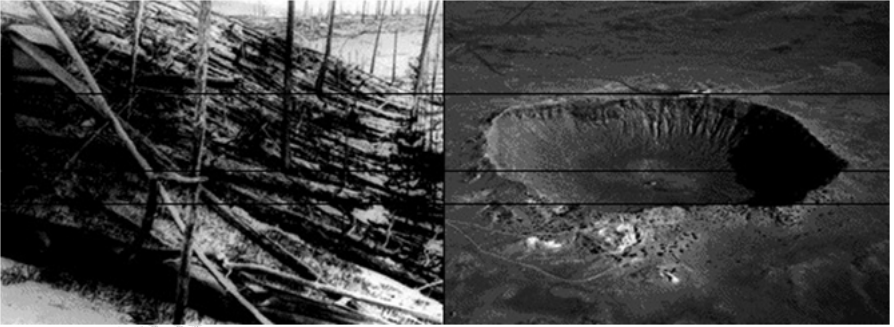
এ্যাস্টারোইড পৃথিবীতে ভূপাতিত হওয়ার ফলে কি হতে পারে তার প্রমাণ উপরের ছবি দু'টো। বায়ের ছবিটি রাশিয়ার সাইবেরিয়ার টুঙ্গুসকা নামক এলাকার। এখানে ১৯০৮ সালে ছোট্ট উল্কা কিংবা এ্যাস্টারোইড পৃথিবীর মাত্র ৪ মাইল উর্ধ্বে থাকাকালে বিরাট শক্তির মাধ্যমে বিস্ফোরিত হয়। ফলে ১০০০ স্কোয়ার কিমি [৪০০ বর্গমাইল] এলাকাব্যাপী বনভূমির গাছপালা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে কাত করে দেয়। এই বস্তুটির ব্যাস ছিলো মাত্র ৪০ মিটার [বা ১৩০ ফুট]। ডানের ছবিতে আমেরিকার আরিজোনা মরুভূমিতে সৃষ্ট প্রখ্যাত মিটিওর ক্রেটার দেখাচ্ছে। এই গর্তটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ১.১৩ কিমি [প্রায় ০.৭ মাইল]। আজ

থেকে ৫০,০০০ বছর পূর্বে ৫০ মিটার [১৫০ ফুট] ব্যসবিশিষ্ট একটি ধাতুর তৈরী এ্যাস্টারোইড ভূপাতিত হয়ে এটি সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য এরূপ অসংখ্য ক্রেটার আমাদের গ্রহের একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্রের উপর দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেছেন, সুদূর অতীতে চন্দ্রকে অসংখ্য এ্যাস্টারোইড 'বম্বার্ড' করার ফলে এরূপ হয়েছে। আর এতো কাছের বস্তুর উপর এতো বেশী এ্যাস্টারোইড ভূপাতিত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পৃথিবীও সুদূর অতীতে অনুরূপ বোম্বার্ডমেন্টের স্বীকার হয়েছিল। তবে পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ যেহেতু মহাসাগর তাই অধিকাংশ পতন ঐসব সাগর-মহাসাগরেই হয়ে থাকবে- ফলে আমরা চন্দ্রের মতো এতো বেশী গর্তের সন্ধান পাচ্ছি না।

পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে এ্যাস্টারোইড প্রবেশের মুহূর্ত।

বৃহস্পতি

আমাদের সৌরজগতের ন'টি গ্রহের মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রহের নাম হলো জুপিটার বা বৃহস্পতি। সূর্য থেকে বাইরের দিকে যেতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, এ্যাস্টারোইড বেল্ট পরেই বৃহস্পতি গ্রহের স্থান। সৌরজগতের চারটি গ্রহের মধ্যে শুষ্ক স্থলভূমি আছে। এগুলোকে বলে টেরেস্ট্রিয়্যাল গ্রহ [terrestrial planet]। এই গ্রহ চতুষ্টয় হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল। বাকী সবক'টি গ্রহই মূলত গ্যাসের তৈরী। আর

বৃহস্পতি হলো এদের মধ্যে অন্যতম। রাতের আকাশে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারার নাম হলো সিরিয়াস। বৃহস্পতির ঔজ্জ্বল্যতা এই তারা থেকেও ৩ গুণ বেশী।

গড়ে ৭৮০ মিলিয়ন কিমি [৪৮০ মিলিয়ন মাইল] দূরত্বে থেকে বৃহস্পতি **১১.৯** বৎসরে একবার সূর্যের চতুর্দিকে তার কক্ষপথে ঘুরে আসে। গ্রহের আহ্নিক বা দৈনিক গতি খুব বেশী, ফলে এটা মাত্র ৯.৯ ঘণ্টায় তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে একবার ঘুরে আসে।

বৃহস্পতি ও তার চার উপগ্রহ (চন্দ্র)

বৃহস্পতি সিস্টেম বাস্তবে একটি ছোট্ট সৌরজগৎ। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তার উপগ্রহের সংখ্যা ৬১-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এদের অধিকাংশের উপর বেশ কিছু গবেষণা হয় নি। ১৬টি চন্দ্রের ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু তথ্যা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে চারটি প্রসিদ্ধ হলো: আয়ো [Io], গ্যানিমিড [Ganymede], ইউরোপা [Europa] এবং ক্যালিস্টো [Callisto]। এই চারটি চন্দ্র অন্যগুলোর তুলনায় বেশ বড়ো। ১৬১০ সালে বিজ্ঞানী গ্যালিলেও [১৫৬৪-১৬৪২] এগুলো আবিষ্কার করেছিলেন তাই তারই স্মরণে এগুলোকে ‘গ্যালিলিয়ান মুন্স” বলা হয়। আমরা একটু পরই বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোর উপর আলোচনায় যাচ্ছি। প্রথমে গ্রহের ব্যাপারে আরো কিছু জানা তথ্যাদি তুলে ধরছি।

আগেই বলেছি বৃহস্পতি মূলত গ্যাসের তৈরী একটি বৃহৎ গ্রহ। তার উপর কোনো শক্ত মাটি নেই। তবে অনেকের ধারণা গ্রহের কেন্দ্র শিলার তৈরী। কিন্তু কেন্দ্রে মোট ভরের বা ম্যাসের মাত্র ৫% আছে। বৃহস্পতির সর্বোচ্চ মেঘমালায়ও মহাকর্ষের মাত্রা পৃথিবীর তুলনায় ২.৫ গুণ বেশী। গ্রহের উচ্চ দৈনিক গতির ফলে

গ্যাস ও মেঘমালা খুব দ্রুত চলাচল করে। বৃহস্পতির বিষুবরেখার ব্যাস হলো ১,৪৩,০০০ কিমি [৮৯,০০০ মাইল]- অর্থাৎ এর ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় ১১.২ গুণ বেশী। এর ভলিউম পৃথিবীর তুলনায় ১,৩০০ গুণ বেশী। অপরদিকে গ্যাসীয় এই গ্রহের ভর [ম্যাস] পৃথিবী থেকে ৩১৮ গুণ বেশী- যা তুলনামূলকভাবে অনেকটা কম। গ্যাস হওয়ার ফলে তার ডেনসিটি বা ঘনাঙ্ক আসলে পৃথিবীর ঘনাঙ্ক থেকে কম। পৃথিবীর ঘনাঙ্ক যেখানে ৫.৫২ গ্রাম / কিউবিক মিটার সেখানে বৃহস্পতির মান হলো মাত্র ১.৩৩ গ্রাম / কিউবিক মিটার। এ থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বৃহস্পতি মূলত পাতলা গ্যাস হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দ্বারা গঠিত।

বায়ুমণ্ডল

আমাদের সৌরজগতে সবকিছুর মৌলিক এনার্জি-সূত্র হলো সূর্য। তবে যে যতো কাছে, সে পায় ততো বেশী এনার্জি। সূর্যের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে দূরবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছে। কিন্তু ইতোমধ্যে আলোর মধ্যস্থ শক্তিসমূহ অনেকটা হ্রাস পায়। সূর্য থেকে পৃথিবী যেটুকু দূরত্বে অবস্থান করছে তার থেকে ৫ গুণ বেশী দূরে অবস্থান করে বৃহস্পতি। সুতরাং অঙ্ক কষে দেখা গেছে পৃথিবীতে পতিত আলোকরশ্মির ক্ষমতার তুলনায় বৃহস্পতিতে পতিত আলোকরশ্মির ক্ষমতা ২৫ গুণ কম। মোটকথা সোলার এনার্জির ভাগ বৃহস্পতিসহ দূরবর্তী গ্রহগুলো অনেক কম পায়। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহ থেকে নির্গত ইনফ্রারেড তেজস্ক্রিয়া [বা তাপসৃষ্ট এনার্জি] পরীক্ষা করে দেখা গেছে সূর্য থেকে যেটুকু এনার্জি সে পায় তার ১.৬৭ গুণ এনার্জি সে আবার বাইরের দিকে নিক্ষেপ করে। এই অতিরিক্ত এনার্জির সূত্র মূলত গ্রহের অভ্যন্তর। সুতরাং এর বায়ুমণ্ডলে তাপ এনার্জির তারতম্য হেতু তা খুবই

ক্রিয়াশীল। কোনো কোন মেঘখণ্ডের মধ্যে সৃষ্টি হয় ৬০০ কিমি/ঘণ্টা [৩৭০ মাইল প্রতি ঘণ্টা] বেগবান গতি। ফলে পুরো গ্রহে সৃষ্টি হয় রঙ্গিন মেঘের ব্যান্ড যা পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান। এছাড়া সময় সময় সৃষ্টি হয় বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ঘূর্ণিঝড়। এরূপ একটি ঝড়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে বৃহস্পতির প্রখ্যাত ‘লাল স্পট’।

বৃহস্পতির উপগ্রহসমূহ

আগেই বলেছি বৃহস্পতির চতুর্দিকে এ পর্যন্ত জানা ৬১টি উপগ্রহ বা চন্দ্র ঘূর্ণমান আছে।

১৯৭৯ সালে ভয়েজার নামক কৃত্রিম উপগ্রহ বৃহস্পতির নিকটে যেয়ে অনেক ছবি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এ থেকে গ্রহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত রিং এবং তিনটি নতুন উপগ্রহের সন্ধান মিলে। এই তিনটি উপগ্রহের নামকরণ করা হয়েছে মেটিস, এ্যাড্রাসটিয়া এবং থিবি। এ তিনটি ও চতুর্থ আমালথিয়া মিলে বৃহস্পতির ভেতর-উপগ্রহ গ্রুপ হয়েছে।

বৃহস্পতি গ্রহের প্রধান ক’টি উপগ্রহ

প্রথম ভেতর-গ্রুপ পরে বাইরের দিকে চারটি প্রখ্যাত গ্যালিলিয়ান উপগ্রহের অবস্থান। এই গ্রুপের ব্যাপারে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। উপগ্রহ চতুষ্টয়ের মধ্যে আয়ো ও ইউরোপা অনেকটা সৌরজগতের চারটি টেরেস্ট্রিয়াল গ্রহের মতো। অর্থাৎ এ দু'টো মূলত শক্ত মাটির তৈরী। তবে গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টো অনেকটা ভিন্ন। এ দু'টো মূলত বরফ জাতীয় বস্তুর তৈরী। আয়ো এবং ইউরোপার উপর অনেক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান।

এ পর্যন্ত আমরা ৮টি চন্দ্রের উপর আলোচনা করেছি। বাকী ৮টি বৃহস্পতি থেকে বেশ দূরে বাইরের দিকে অবস্থান করে। এই গ্রুপে আছে লিদা, হিমালিয়া, লিসিথিয়া, ইলারা, আনানকি, র্কাম, প্যাসিফাই এবং সিনোপ। প্রথম চারটি সেসাথে গ্যালিলিয়ান ও ভেতরের গ্রুপ মিলে মোট এই ১২টি চন্দ্র বৃহস্পতির নিজস্ব আহ্নিক গতি যেদিকে সেদিকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু শেষোক্ত চারটি বিপরীত দিকে প্রদক্ষিণ করে।

বৃহস্পতিতে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ

সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির উপর ব্যাপক গবেষণা মূলত আমেরিকার নাসা কর্তৃক প্রেরিত পাইওনিয়ার-১০ মহাকাশযান দ্বারা শুরু হয়। ১৯৭২ সালের মার্চে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এরপর পরবর্তী বৎসরের এপ্রিলে পাইওনিয়ার-১১ বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। এই উভয় মহাকার্শযানে ছিলো বিশেষ যন্ত্রপাতি যদ্বারা বৃহৎ এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল ও মহাকর্ষের উপর গবেষণা করা সম্ভব হয়। বৃহস্পতির উপর পরবর্তী নাসা কর্তৃক মিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২ মহাকাশযান। ১৯৭৯ সালে এই মিশন শুরু হয়। এই উভয় যানে বেশ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ছিলো। মহাকাশে এগুলোকে বিশেষ অবস্থান ও গতিপথে নিয়ন্ত্রণ করা হতো যাতে যানে স্থাপিত ক্যামেরা দ্বারা বৃহস্পতিকে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ম্যাপ করা সম্ভব হয়। সাধারণ দৃশ্যমান আলো ছাড়াও পাইওনিয়ার মহাকাশযান আলট্রাভাইলোট ও ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্যে গ্রহের ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। সাধারণ ছবি থেকে আমরা গ্রহের বায়ুমণ্ডলের স্বরূপ জানতে পেরেছি; ইউভি [আলট্রাভাইলোট] ছবি থেকে সৌরবাতাসের সঙ্গে কিভাবে গ্রহের চুম্বকীয় ফিল্ড ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে তা জানা গেছে; এবং আইআর [ইনফ্রারেড] ছবি থেকে বৃহস্পতির উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের তাপ ও বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এরপর সূর্যের মেরুর উপর দিয়ে প্রদক্ষিণরত একটি মহাকাশযান ১৯৯০ সালে আমেরিকার নাসা কর্তৃক স্পেইস শাটল থেকে প্রেরিত হয়। উলিসিস নামক এই মহাকাশযানকে তার গন্তব্যস্থলে স্থাপনে একটি চিত্তাকর্ষক উপায় বের করা হয়েছিল। প্রথমে যানটিকে বৃহস্পতির নিকট নিয়ে যাওয়া হয় ও দু'বার ঘুরানোর মাধ্যমে গ্রহের শক্তিশালী মহাকর্ষকে কাজে লাগিয়ে উলিসিসকে তার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। তবে গ্রহের নিকটে থাকাকালে উলিসিস এর ম্যাগনিটোস্ফিয়ার [Magnetosphere - গ্রহের চুম্বকীয় প্রভাব যে পর্যন্ত ব্যাপ্ত] ও মহাকার্ষিক ফিল্ডের [Gravitational Field] মাপজোখ পৃথিবীতে প্রেরণ করে।

উলিসিস উৎক্ষেপণের আগে নাসা অত্যন্ত সফল গ্যালিলিও মহাকাশযান ১৯৮৯ সালে প্রেরণ করে। দীর্ঘ ৬ বছর ভ্রমণশেষে এটি বৃহস্পতির নিকটে যেয়ে পৌঁছে। এ পর্যন্ত প্রেরিত সকল ক্রাফ্টই ছিলো 'ফ্লাই-বাই' [Fly-by] মহাকাশযান।

অর্থাৎ এগুলো গ্রহের কাছে যেয়ে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু গ্যালিলিও মিশন ছিলো ভিন্ন। এই মহাকাশযানকে সেখানে প্রেরণ করা হয় কক্ষপথে ঘূর্ণমান একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে। এর ফলে এটি গ্রহকে দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা করতে সক্ষম হয়। ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত গ্যালিলিও তার মিশন অব্যাহত রাখে। এরপর বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের ভেতর ঢুকার পর পৃথিবীর তুলনায় ২০ গুণ বেশী চাপের মুখে এটির মূল প্রেরকযন্ত্র [ট্রান্সমিটার] নষ্ট হয়ে যায়। গ্যালিলিওকে ইচ্ছে করে গ্রহের অভ্যন্তরে দ্রুত প্রেরণ করার সময় তা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বৃহস্পতির পরবর্তী গ্রহের নাম শনি। কাসিনি/হাইজিন্স নামক একটি মহাকাশযান শনির উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে বৃহস্পতির নিকটে আসে। এই মহাকাশযানও আরো কিছু তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করে।

শনি

সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থানরত সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহৎ গ্রহের নাম হলো শনি। গ্রহের চতুর্দিকে অসংখ্য বিরাট আয়তনের রিং সিস্টেম থাকায় শনিকে বেশ সুন্দর দেখায়। ইতালীর বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৬১০ সালে এই রিং সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণ করেন। প্রাথমিকভাবে রিংগুলোকে ৭টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। আধুনিক কালে মহাকাশযান মিশনের মাধ্যমে দেখা গেছে শনির রিং সিস্টেম মূলত লক্ষাধিক আলাদা রিংয়ের সমষ্টি। এসব রিং উপগ্রহের মতো শনিকে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে।

শনিগ্রহের উপর গবেষণা

পৃথিবী থেকে শনিকে একটি উজ্জ্বল ঈষৎ হলুদ বর্ণের তারা হিসাবে দেখায়। তবে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তাকালে শনির রিং সিস্টেম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে শনির চতুর্দিকে ঘূর্ণনরত ৯টি উপগ্রহ বা চন্দ্রও দেখা যায়। আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত তিনটি মহাকাশ মিশন থেকে আমরা শনি সম্পর্কে অনেক ব্যাপার অবগত হয়েছি।

শনি ও কাসিনি/হাইজিন্স: শনিগ্রহের নিকটে মহাকাশযান কাসিনি/হাইজিন্স।

১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাইওনিয়ার-১১ মহাকাশযান শনির কাছ দিয়ে উড়ে যায়। এরপর ভয়েজার-১ ১৯৮০ সালের নভেম্বরে এবং ভয়েজার-২ ১৯৮১ সালের আগস্টে শনির নিকট যেয়ে পৌঁছে। এসব ক্রাফটের মধ্যে ছিলো বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরা ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ যন্ত্রপাতি। নাসা ১৯৯৭ সালের অক্টোবরে কাসিনি মহাকাশযান শনির দিকে প্রেরণ করে। এটি ২০০৪ সালে শনির নিকট যেয়ে পৌঁছে। এই ক্রাফটের সঙ্গে ছিলো হাইজিন নামক একটি ছোট্ট যান- এটি টাইটান নামক শনির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ চন্দ্রের বায়ুমণ্ডল পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

শনি সম্পর্কে জানা তথ্যাদি

গ্যাসের তৈরী দ্বিতীয় বৃহৎ গ্রহ শনির বিষুবরেখার ব্যাসার্ধ হলো ৬০,২৭০ কিলোমিটার [৩৭,৪৫০ মাইল]। গ্রহটির ভর বা ম্যাস হলো ৫.৯৬x ১০^{২৬} কেজি। এর গড় ঘনাঙ্ক বা ডেনসিটি ০.৬৯ গ্রা/কিউবিক মিটার। শনির দৈনিক গতি আমাদের

দিনের হিসাবে ০.৪৪৫ দিন মাত্র- অর্থাৎ ১০.৫৬৫ ঘণ্টা। তবে তার এক বছর আমাদের তুলনায় ২৯.৪৬ বছর। সূর্যকে সে গড়ে ১,৪৩৫ বিলিয়ন কিমি [৮৯২ বিলিয়ন মাইল] দূরত্বে থেকে প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। বৃহস্পতি গ্রহের মতো শনিও একটি ছোট্ট সৌরজগৎ। কারণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত শনির চন্দ্রের সংখ্যা ৫৬টিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবী থেকে বিরাট দূরত্ব সেসাথে অত্যল্প মহাকাশ মিশন হেতু শনির অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও কিসব বস্তু দ্বারা এটি গঠিত এবং অন্যান্য তথ্যাদি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো সীমিত। এরপরও যাকিছু জানা গেছে তা থেকে নিশ্চিত বলা যায় শনিগ্রহ মূলত হাইড্রোজেন গ্যাসের তৈরী। এর ঘনাঙ্ক পৃথিবীর তুলনায় মাত্র এক-অষ্টমাংশ। তবে গ্রহের বায়ুমণ্ডল থেকে শুরু করে ভেতরের দিকে ক্রমান্বয়ে ভর বা ম্যাস বৃদ্ধি পাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে বিরাট শক্তিশালী চাপ। এতে কেন্দ্রের দিকের হাইড্রোজেন গ্যাস তরল আকারে বিদ্যমান আছে। আর কেন্দ্রস্থলে যেয়ে এই গ্যাস ধাতুর আকার ধারণ করেছে। হাইড্রোজেন গ্যাস যখন চাপের ফলে ধাতু অবস্থায় পরিবর্তন হয় তখন এটা বৈদ্যুতিক কন্ডাকটার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আর এই বিদ্যুৎ চলাচল থেকেই সৃষ্টি হয়েছে গ্রহের চুম্বকীয় ফিল্ড। কেন্দ্রের চাপ শুধু বিরাট নয় সেখানকার তাপমাত্রাও অন্তত ১৫,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের [বা ২৭,০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের] কাছাকাছি হবে। বৃহস্পতির মতো শনিও সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত এনার্জির তুলনায় অধিক এনার্জি মহাকাশে নির্গত করে। সূর্যের পতিত এনার্জির ৩ গুণ বেশী শনিগ্রহ থেকে চতুর্দিকের মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বায়ুমণ্ডল

শনির বায়ুমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন [৮৮%], হিলিয়াম [১১%], মিথেইন, এমোনিয়া এবং অন্যান্য গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে মেঘের তাপমাত্রা -১৭৬ ডিগ্রী সেন্টি. [-২৮৫ ডিগ্রী ফা.] এর অধিক হয় না। গ্রহের মেরুর নিকটে বায়ুমণ্ডল প্রত্যেক ১০ ঘণ্টা ১১ মিনিটে একবার ঘুরে আসে। পুরো গ্রহ ও তার মেগনেটোস্ফিয়ার ১০ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ডে একবার ঘুরে আসে- এটাই শনির দৈনিক বা আহ্নিক গতি। এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে মেরুর সঙ্গে ২৮.৫ মিনিটের ঘূর্ণন গতির ব্যবধান

বিষুবরেখার উপরস্থ বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে বিদ্যমান। এই তথ্য থেকেই বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন যে, গ্রহের উত্তর মেরুর উপরস্থ বায়ুমণ্ডলে এক অদ্ভুত ব্যাপার বিরাজ করছে; একটি তরঙ্গ-পেটার্ন যা পুরো গ্রহের চতুর্দিকে ৬ বার সৃষ্টি হয়েছে ও এতে দৃশ্যমান একটি বিরাট স্থায়ী হেক্সাগোন দৃশ্যমান হয়।

শনির প্রখ্যাত রিং সিস্টেম

শনির চিত্তাকর্ষক রিং সিস্টেমের উপর বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। সুদৃশ্য এই রিং শনির কেন্দ্র থেকে ১,৩৬,২০০ কিমি [৮৪,৬৫০ মা] দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। রঙ্গিন এই রিং কোনো কোন স্থানে ৫ মিটার [১৬.৪ ফু] পর্যন্ত গভীর। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতামত হলো এগুলো মূলত হিমায়িত গ্যাস, ছোটবড় ঠাণ্ডা শিলা, জলীয় বরফ ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। আয়তনে ০.০০০৫ সেমি [০.০০০২ ইঞ্চি] থেকে ১০ মিটার [৩৩ ফু] পর্যন্ত ভাসমান এসব বস্তু খুব দ্রুত শনির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত আছে। ভয়েজার মহাকাশযানে স্থাপিত একটি যন্ত্র শনির রিংয়ের সংখ্যা লক্ষাধিক বলে নির্ণিত করেছে।
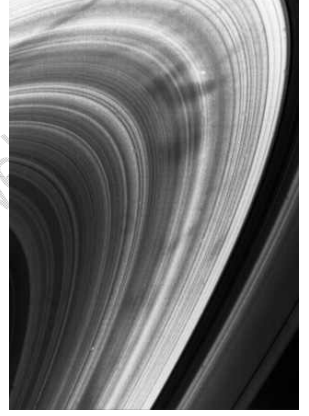
শনির চন্দ্রসমূহ

এ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, শনির ১৮টি চন্দ্র আছে। তবে আরোও ১৪টি থাকার ব্যাপারে আভাস পাওয়া যায়। চন্দ্রগুলোর ব্যাস ৫ থেকে ৫,১৫০ কিমি [১২ থেকে ৩,২০০ মাই] পর্যন্ত নির্ণিত হয়েছ। অধিকাংশ উপগ্রহ পাতলা বরফ-জাতীয় বস্তুর তৈরী। অভ্যন্তরীণ পাঁচটি উপগ্রহ হলো: মায়মাস, এনসেলেডাস, টিতিস, ডাইওনি এবং রিয়া। এগুলো দেখতে গোলকের মতো এবং জলীয় বরফের তৈরী। আমাদের চন্দ্রের মতো এদের গায়ে অসংখ্য মিটিওর ক্রেটার [মিটিওর পতনের ফলে সৃষ্ট গর্ত] বিদ্যমান।

শনির বড় ক'টি চন্দ্র: আয়তনের ধারণার জন্য ডানে আমাদের চন্দ্র দেখা যাচ্ছে।

বাইরের আরো দু'টি উপগ্রহ হাইপ্যারিওন ও আয়াপেটাস জলীয় বরফ দ্বারা গঠিত। ফিয়েবি নামক শনি থেকে দূরতম উপগ্রহ মূলত মহাকর্ষ দ্বারা গ্রেফতারকৃত কোনো ধূমকেতু হবে। এটি অন্যান্য সকল উপগ্রহের তুলনায় উল্টো দিকে শনিকে প্রদক্ষিণ করে।

শনি ও তার চন্দ্রসমূহ: ডানের চিত্রে প্রতিটি চন্দ্রের কক্ষপথ দেখা যাচ্ছে।
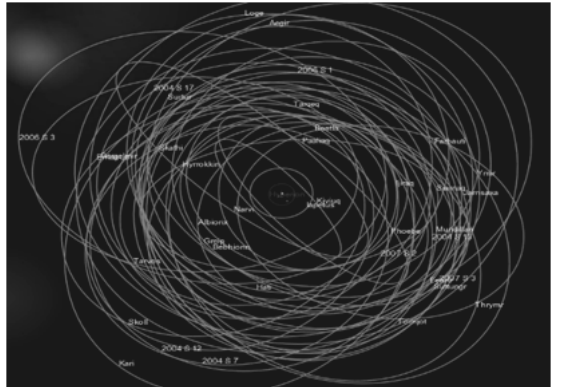
শনির সর্বাপেক্ষা বড় চন্দ্রের নাম টাইটান (ডানের চিত্র)। এটি অভ্যন্তরীণ ও বাইরের উপগ্রহসমূহের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। ৫ হাজারেরও অধিক কিমি ব্যাসবিশিষ্ট এই উপগ্রহের উপর বিজ্ঞানীদের আগ্রহ খুব বেশী। সূর্যের নিকটস্থ প্রথম গ্রহ বুধের চেয়েও এটি আয়তনে বড়ো। টাইটানের চতুর্দিকে ৩০০ কিমি ঘন একটি বায়ুমণ্ডল আছে। এই বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ উপাদান মূলত নাইট্রোজেন গ্যাস। তবে মিথেইন, ইথেইন, এসিটাইলিন, এথিলিন, হাইড্রোজেন সাইনাইড, কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাইওক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসও সামান্য মাত্রায় বিদ্যমান আছে। টাইটানের উপরিস্থ তাপমাত্রা কিন্তু অনেক কম- মাইনাস ১৮২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড [-২৯৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট] এর বেশী হয় না। এছাড়া বিষাক্ত মিথেইন ও ইথেইন গ্যাস হয়তো বৃষ্টি, বরফ, তুষার ও বাষ্প হিসাবে অস্তিত্বশীল আছে। অনেকের ধারণা টাইটানের অভ্যন্তরে আছে শিলা ও জলীয় বরফ। তবে এ পর্যন্ত কোনো মহাকর্ষিক ফিল্ড আছে বলে প্রমাণ মিলে নি। নিম্নের টেবিলে শনিগ্রহের ন'টি উপগ্রহের উপর জানা তথ্যাদি তুলে ধরা হলো।
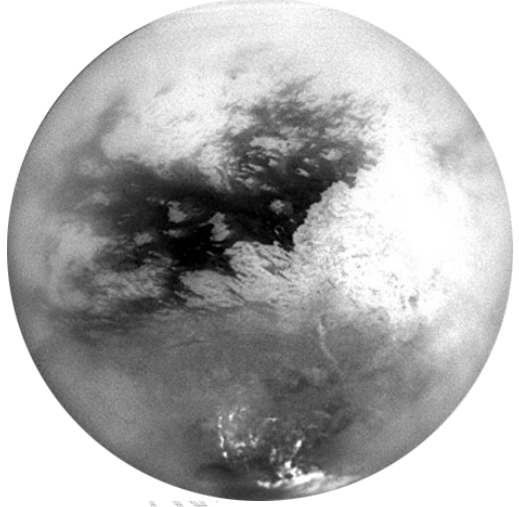
শনির সর্বাধিক বড় চন্দ্র টাইটান

ইউরেনাস

আমাদের সৌরজগতের একটি প্রধান গ্রহের নাম হলো ইউরেনাস। সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে এটি সপ্তম স্থানে আছে। ইতোমধ্যে আলোচিত শনিগ্রহের পরে ও অষ্টম গ্রহ নেপচুনের মধ্যবর্তী স্থানে থেকে ইউরেনাস কক্ষপথে ঘূর্ণমান আছে। ২,৮৫৭ বিলিয়ন কিমি [১৫২৬.১ বিলিয়ন মা] দূরে থেকে এটি সূর্যের চতুর্দিকে

৮৪.০১ বৎসরে একবার ঘুরে আসে। ইউরেনাসের বিষুবরেখার ব্যাস ২৫,৫৬০ কিমি [১৫,৮৮২ মা] এবং এটা পৃথিবীর বিপরীত দিকে মাত্র ০.৭১৮ দিনে [বা ১৭.২৫ ঘণ্টায়] তার মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ঘুরে- যা হলো তার আহ্নিক গতি। ইউরেনাসের ভর [ম্যাস] হলো ৮.৬৮x ১০২৫ কিগ্রা। গ্রহটির গড় ঘনাঙ্ক ১.৩ গ্রাম/কিউবিক সেমি। গ্রহটির উপগ্রহের সংখ্যা ২৭টি। তবে আরোও এক দু'টোর সন্ধান ভবিষ্যতে মিলতে পারে। এছাড়া এই গ্রহেরও ১১টি জানা রিং আছে। পৃথিবীর তুলনায় ইউরেনাসের ভর ১৪.৫ গুণ বেশী আর ভলিউম ৬৭ গুণ। ১ কেজি ওজনের একটি বস্তু ইউরেনাসের উপর ১.১৭ কেজি হবে। বিজ্ঞানীরা চারটি গ্রহকে ‘জবিয়ান’ বা বৃহস্পতির মতো বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই গ্রহ চতুষ্টয়ের একটি হলো ইউরেনাস। বৃহস্পতি ছাড়া অপর দু'টো হলো শনি ও নেপচুন। আমরা অবশ্য একটু পরই নেপচুন সম্পর্কে তথ্যাদি তুলে ধরবো।

পৃথিবী ও মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ

ইউরেনাস পৃথিবীর কক্ষপথের প্লেইনে প্রদক্ষিণ করে তাই একে সর্বদাই রাতের আকাশে একই রেখার উপর ভ্রমণ করতে দৃশ্যমান হয়। বিরাট দূরত্বের ফলে
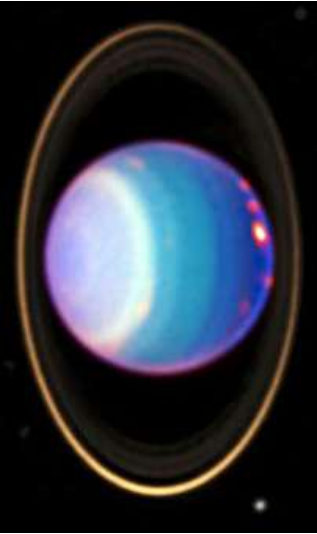
একে অত্যন্ত অনুজ্জ্বল একটি তারার মতো দেখায়। তবে দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে গ্রহটিকে বেশ বড়ো নীল-সবুজ রংয়ের বৃত্তের মতো দেখা যায়। এ পর্যন্ত মাত্র একটি মহাকাশযান ইউরেনাসের নিকটে প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ২০ আগস্ট ভয়েজার-২ নামক একটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি ১৯৭৯ সালে বৃহস্পতি এবং ১৯৮১ সালে শনিগ্রহের নিকট মহাকাশের উপর দিয়ে অতিক্রম করে এবং ১৯৮৬ সালে ইউরেনাসের নিকট যেয়ে পৌঁছে। তবে মজার ব্যাপার হলো ভয়েজার-২ মহাকাশযান বৃহস্পতি পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতির বিরাট মহাকর্ষ দ্বারা একে যখন গতিশীল

করা হলো তখন এটা শনিগ্রহ পর্যন্ত ভ্রমণ করলো এবং শনির মহাকর্ষ দ্বারা গতিশীল করে ভয়েজারকে ইউরেনাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো। এখানেই শেষ নয় ইউরেনাস থেকে মহাকাশযানটিকে নেপচুন পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হলো সফলভাবে। ইতোমধ্যে অবশ্য ক্রাফটের অন-বোর্ড যন্ত্রপাতি চারটি বিরাট গ্রহের ছবিসহ বেশ কিছু তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করে দেয়। আর এ থেকেই ওসব গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকটা বৃদ্ধি পায়।

ভয়েজার-২ ইউরেনাসের অতিরিক্ত ৫টি রিং ও ১০টি অজানা উপগ্রহ আবিষ্কার করে। ইউরেনাসের ১১তম চন্দ্রের নাম মিরানডা। ভয়েজার এটির নিকটবর্তী হয়ে পুরো এই চন্দ্রের ম্যাপ তৈরী করে। এতে দেখা গেছে, মিরানডার স্থলভাগে বেশ কিছু মিটিওর গর্ত ও উপত্যকা বিদ্যমান। অন্যান্য উপগ্রহ ভয়েজার-২ এর ভ্রমণপথ থেকে বেশী দূরে থাকায় অনুরূপ ছবি তুলতে সক্ষম হয় নি।

ইউরেনাসের গতির মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রহের আহ্নিক গতি অন্যান্য গ্রহের তুলনায় বিপরীত দিকে একথা আগেই বলেছি। তবে এটি কক্ষপথ থেকে উভয় মেরুকে ৯৮ ডিগ্রী কাত অবস্থায় রেখেছে। তার দীর্ঘ ৮৪ বছর প্রদক্ষিণ সময়ের অর্ধেক সময় কাটে উত্তর মেরু সূর্যের দিকে রেখে। অর্থাৎ ৪২ বছরব্যাপী উত্তরমেরু সূর্যের দিকে এবং বাকী ৪২ বছর দক্ষিণমেরু সূর্যের দিকে থাকে। সুতরাং ইউরেনাসের সিজন বা মৌসুম এই ৪২ বৎসরে একবার রদবদল হয়। মূলত গ্রহের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে একদিন হয় ৪২ বৎসরে! সূর্যের আলোকরশ্মির অভাবে রাতের দিক দীর্ঘদিন অন্ধকারে পড়ে থাকলেও উভয় গোলার্ধের মধ্যে তাপমাত্রায় তেমন পার্থক্য নেই। গ্রহের উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে গড় তাপমাত্রা হলো -২১২ ডিগ্রী সেন্টি [-৩৫০ ডিগ্রী ফা]। তাপমাত্রায় তারতম্য না থাকায় এটাই বুঝা যায় যে, পুরো গ্রহব্যাপী তাপ সমভাবে বিস্তৃত হয়।

ইউরেনাস মূলত পানি ও শিলার তৈরী গ্রহ। তবে এর ঘন বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামই বেশী। গ্রহের শিলাবৎ কেন্দ্র খুব একটা বড় নয়। এর ব্যাস ২০০০ কিমি কিংবা কম হবে। ইউরেনাসের ভলিউমের অধিকাংশ জলীয় তরল পদার্থের তৈরী মহাসাগর। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই মহাসাগরের অধিকাংশ

বস্তু পানি। তবে সিলিকেট, মেগনেসিয়াম, নাইট্রোজেন, হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি মলিকিউলও এতে মিশ্রিত আছে। তবে এই বিরাট মহাসাগর অত্যন্ত গরম- এর তাপমাত্রা প্রায় ৬৬৫০ ডিগ্রী সেন্টি। প্রশ্ন আসতে

পারে, ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে যেখানে পানি বাষ্পে পরিণত হয় সেখানে এতো উচ্চ তাপমাত্রায়ও পানি তরল অবস্থায় থাকে কি করে? এর জবাব হলো, ইউরেনাসের অভ্যন্তরে চাপ অত্যন্ত বেশী। ফলে উচ্চ তাপসম্পন্ন পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হতে পারছে না।

ইউরেনাসের বায়ুমণ্ডল তার মহাসাগর থেকে ঊর্ধ্বে ৫,০০০ কিমি [৩,১০০ মাইল] পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৮৬ সালে যখন ভয়েজার মহাকাশযান গ্রহের নিকটবর্তী হয়েছিল তখন বায়ুমণ্ডলে খুব একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নি। তবে মহাকাশে স্থাপিত হাবল্ স্পেইস টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত ছবি থেকে জানা যায় বায়ুমণ্ডল একেবারে নীরব নয়- সেখানে কিছুটা ক্রিয়াকলাপ হয়ে থাকে। বেশ কিছু বাতাসের ফলে গ্রহের মধ্যে মেঘের বেল্ট সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ইউরেনাসের চন্দ্রসমূহ

ইউরেনাসের ১১টি রিং গ্রহের বিষুবরেখা থেকে ৩৮,০০০ কিমি [২৪,০০০ মা] ঊর্ধ্বে অবস্থান করে কক্ষপথে ঘুরছে। এসব রিং মূলত ছোট্ট ছোট্ট বরফ ও শিলার তৈরী। ইউরেনাসের মোট চন্দ্রের সংখ্যা ২৭টি। এদের অধিকাংশের ব্যাপারে আমরা এখনো অত্যল্প মাত্র তথ্য জানতে পেরেছি। চন্দ্রগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেকস্পিয়ার ও আলেকজান্ড্রার পোপ এর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের নামানুসারে। যেমন অবেরন, টাইটানিয়া, আমব্রিয়েল, এরিয়েল ও মিরানডা। এই ৫টি চন্দ্র বড় আয়তনের- এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়োটির নাম হলো টাইটানিয়া। এর বিষুবরেখার ব্যাস ১৬০০ কিমি [১০০০ মাইল]। চন্দ্রটি ইউরেনাস থেকে গড়ে ৩,৩৬,০০০ কিমি [২,৬২,০০০ মা] দূরে থেকে কক্ষপথে ঘূর্ণমান আছে। এটির বার্ষিক গতি [বা ইউরেনাসের চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসার সময়] মাত্র ৯ দিন। বাকী চারটির মধ্যে অবেরন প্রায় একই ব্যাসসম্পন্ন- যা হলো, ১৫২০ কিমি

[৯৪০ মা]। এটি ৫,৮৩,০০০ কিমি [৩,৫০,০০০ মা] দূরে থেকে ইউরেনাসকে প্রতি ১৩.৫ দিনে প্রদক্ষিণ করে। উপগ্রহ আমব্রিয়েলের দূরত্ব ২,৬৬,০০০ কিমি [১,৬০,০০০ মা]। এর বিষুবরেখার ব্যাস ১১৭০ কিমি [৭০২ মা]। এর বার্ষিক গতি মাত্র ৪ দিন। এরিয়েল নামক চন্দ্রটির ব্যাস ১১২০ কিমি [৬৯০ মা]। এটি ইউরেনাস থেকে গড়ে ১,৮৫,০০০ মাইল দূরে থেকে ঘূর্ণমান আছে। ইউরেনাসকে সে প্রত্যেক ২.৫ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। মিরানডার ব্যাস ৪৭২ কিমি [২৯০ মা]। ইউরেনাস থেকে এটি ১,৩০,০০০ কিমি দূরত্বে অবস্থান করে। এই চন্দ্রটি ইউরেনাসকে প্রতি ৩৪ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে। বাকী চন্দ্রগুলোর উপর তথ্যাদি পূর্বের পৃষ্ঠার টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে।

নেপচুন

আমাদের সৌরজগতের অষ্টম গ্রহের নাম হলো নেপচুন। এটি চতুর্থতম বৃহৎ গ্রহ যার বিষুবরেখার ব্যাস প্রায় ২৪,৭৬০ কিমি [১৫,৩৮৫ মা]। নেপচুন সূর্য থেকে গড়ে ৪,৪৮৮ বিলিয়ন কিমি [২,৭৮৯ বিলিয়ন মাইল] দূরে থেকে ১৬৪.৮ বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। আয়তনে বেশ বড়ো হলেও গ্রহের ঘনাঙ্ক মাত্র ১.৬ গ্রাম / কিউবিক সেন্টি। নেপচুনের মধ্যে বস্তুর পরিমাণ বা তার ভর হলো ১.০২x ১০২৬ কিগ্রা। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত নেপচুনের চন্দ্র বা উপগ্রহের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩-টিতে। বিশাল দূরত্ব হেতু নেপচুন সম্পর্কে এখনো আমরা অনেক কিছু অবগত হতে পারি নি। তবে ভয়েজার-২ নেপচুনের কাছে যেয়ে কিছু ছবি প্রেরণ করেছে। পাশে ভয়েজারের প্রেরিত নেপচুনের একাংশের একটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি।

নেপচুনের গতিময়তা সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো দূরত্বের দিক থেকে এটি সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ হলেও সে প্রত্যেক ২৪৮ বছর পরপর প্রায় ২০ বৎসরের জন্য সপ্তম গ্রহে পরিণত হয়- অর্থাৎ তার প্রদক্ষিণপথ সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের কক্ষপথের ভেতরে এসে যায়। নেপচুনের কক্ষপথের প্রায় বৃত্তাকার ও সেসাথে সর্বশেষ গ্রহ প্লুটোর কক্ষপথ খুব বেশী ডিম্বাকৃতির হওয়ায় এরূপ হয়ে থাকে। আমরা কিছুক্ষণ পরই প্লুটোর উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো। সর্বশেষ এই অবস্থার সৃষ্টি হয় ১৯৭৯ সালে যখন নেপচুন ইউরেনাসের চেয়েও আমাদের নিকটে ছিলো। দীর্ঘ ২০ বছর স্থায়ী থেকে সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার পর ১৯৯৯ সালে আবার ইউরেনাস থেকেও দূরের গ্রহে রূপান্তরিত হয়।

আগেই বলেছি নেপচুন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা গ্রহটির কেন্দ্র শিলাবৎ, আর বাদ-বাকি সবই বিরাট একটি মহাসাগর। গ্রহের বাষ্পীয় বায়ুমণ্ডল মূলত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং সামান্য পরিমাণ মিথেইন গ্যাসে পরিপূর্ণ। নেপচুনেরও ৪টি রিং আছে এবং এ পর্যন্ত জানা উপগ্রহের সংখ্যা ১১টি। আয়তনে গ্রহটি পৃথিবীর তুলনায় ৭২ গুণ হলেও এর ভর বা ম্যাস মাত্র ১৭ গুণ বেশী। গ্রহটি বৃহস্পতির মতো হওয়ায় এটিকে ‘জবিয়ান’ গ্রহ হিসাবে ধরা হয়। নেপচুন আবিষ্কারের পেছনে গাণিতিক থিওরি কাজ করে। ১৮৪৫ সালে গাণিতিকরা অঙ্ক কষে বলেন, অষ্টম আরেকটি গ্রহ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তখনও তার সন্ধান মিলে নি। এরপর বছর খানেক পরই গাণিতিকদের দ্বারা চিহ্নিত দূরত্বে ও স্থানে নেপচুন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে।

পৃথিবী ও মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ

নেপচুনের অরবিট্যাল প্লেইন বা কক্ষপথের অবস্থান পৃথিবী ও অধিকাংশ গ্রহের মতো। এ কারণে নেপচুনকে প্রত্যহ আকাশের একটি নির্দিষ্ট রেখায় চলে যেতে দেখা যায়। বিরাট দূরত্বের ফলে এটিকে খালি চোখে একটি মিটুমিটু তারার মতো দেখায় মাত্র। বড়ো দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে নেপচুনকে পৃথিবী থেকে একটি ঈষৎ সবুজ বৃত্ত হিসাবে দেখা যায়। আমরা ইতোমধ্যে বলেছি, একমাত্র ভয়েজার-২ মহাকাশযান নেপচুনকে কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে। মহাকাশে পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপণের

দীর্ঘ ১০ বছর পর ১৯৮৯ সালে নেপচুনের কাছে যেয়ে ক্রাফ্টি পৌঁছে। তা-ও ছিলো চান্স মাত্র। কারণ সেখান পর্যন্ত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভয়েজার-২ মহাকাশযানকে প্রেরণ করা হয় নি। বৃহস্পতি, শনি ও ইউরেনাসের মহাকর্ষ শক্তি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা কৌশলে এটিকে নেপচুন পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হোন।

ভয়েজার-২ নেপচুনের নিকট-মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার সময় বিভিন্ন উপগ্রহসহ অনেক ছবি পাঠিয়ে দেয়। এ থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা নেপচুনের ৪টি রিং ও আগে অজানা ৫টি নতুন চন্দ্র আবিষ্কার করেন। এর চারটি নেপচুনের নিকটতম উপগ্রহ। নেপচুনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার ঋতু অনেকটা পৃথিবীর মতো। আমাদের পৃথিবীতে ৪ থেকে ৬টি ঋতু হওয়ার কারণ হলো কক্ষপথের তুলনায় মধ্যশলাকার ঘূর্ণনের অবস্থান। একে বলে এক্সিস অব রটেশন। প্রতিটি গ্রহই নিজেদের এক্সিস বা মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে দৈনিক একবার ঘুরে আসে। তবে এই মধ্যশলাকা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সূর্যের চতুর্দিকে কক্ষপথ থেকে সোজা ৯০ ডিগ্রী খাড়াভাবে স্থাপিত নয়। সবগুলোর মধ্যেই সামান্য থেকে বিরাট টিল্ট বা কাত হওয়ার অবস্থা বিদ্যমান। কে কতটুকু কাত আছে এবং আহ্নিক গতি কি পরিমাণ, তার উপর নির্ভর করে গ্রহের মৌসুম বা ঋতুর পরিবর্তন। আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হলো ২৩.৫ ডিগ্রী কাত। নেপচুনের ক্ষেত্রেও তা কাছাকাছি- ২৯.৬ ডিগ্রী। সুতরাং উভয় গ্রহের মধ্যে সৃষ্টি হয় তুলনামূলক ঋতু।

আগের [১৪৮ পৃষ্ঠার] ছবিটি ১৯৮৯ সালে ভয়েজার-২ প্রেরণ করে। এটি মূলত কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃষ্ট ফল্স রঙ্গিণ ছবি। এ ছবি থেকেই মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গ্রহের বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্থ বিভিন্ন গ্যাসের মাত্রা অনুমান করেছেন। নেপচুনে যেটুকু আলোক এনার্জি সূর্য থেকে যেয়ে পতিত হয় তার ২.৭ গুণ এনার্জি সে নির্গত করে। এতে বুঝাই যায় নেপচুনের অভ্যন্তর অতি গরম। এর কেন্দ্রের তাপমাত্রা ৫,১৪৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। নেপচুনের বায়ুমণ্ডল খুব ক্রিয়াশীল। কোনো কোন সময় বাতাসের গতি ২,০০০ কিমি/ঘণ্টা [১,২০০ মাই] হয়ে থাকে যা সমগ্র সৌরজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। মহাকাশে স্থাপিত হাব্ল টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত ছবি থেকে জানা গেছে, গ্রহের বায়ুমণ্ডলে সময় সময় হাজার হাজার কিলোমিটার ব্যাপ্ত ঘূর্ণিঝড়ের আবির্ভাব ঘটে।

নেপচুনের চন্দ্রসমূহ

নেপচুনের চতুর্দিকে চারটি রিং ছাড়াও **১৩টি** জানা উপগ্রহ [চন্দ্র] আছে। এর মধ্যে ৮টির উপর নিশ্চিত কিছু তথ্যাদি এখানে তুলে ধরা হলো।

নেপচুনের অবশ্য মেগনেটিক ফিল্ড আছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কেন্দ্র থেকে ধীর গতিতে তাপ নির্গত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিদ্যুৎ যা থেকে এই চুম্বকীয় ফিল্ডের জন্ম। এই মেগনেটিক ফিল্ডের প্রভাব ঊর্ধ্বাকাশে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্লুটো

প্লুটোকে আমরা সৌরজগতের সর্বশেষ তথা নবম গ্রহ হিসাবে জানি। তবে ২০০৬ সালে ইন্টারনেশন্যাল এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিয়ন [ওঅট] কর্তৃক প্লুটোকে ‘একটি ডোর্ফ প্লানেট’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য সকল বিজ্ঞানী এই নতুন ক্লাসিফিকেশন মেনে নেন নি- তারা একে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রহ হিসেবেই মনে করেন। তবে কারো কারো ধারণা এটা একটি পথহারা এ্যাস্টারোইড মাত্র। আবার কেউ কেউ পথহারা ধূমকেতুও বলেছেন। প্লুটো যাই হোক, সূর্য থেকে এর বিরাট দূরত্ব এবং সেসাথে ছোট্ট আয়তন হেতু এটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সত্যিই সীমিত। এরপরও গ্রহ হিসাবে যেটুকু জানা আছে তার উপর আমাদের নিম্নোক্ত আলোচনা।

সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্লুটোর ২৪৭.৭ বছর অতিবাহিত হয়। সূর্য থেকে তার গড় দূরত্ব ৫৯১০ মিলিয়ন কিমি [৩৬৭০ মিলিয়ন মা]। প্লুটো তুলনামূলকভাবে একটি ছোট্ট গ্রহ। এর বিষুবরেখার ব্যাস হলো ২,৩৬০ কিমি [১,৪৭৫ মা]- যা আমাদের পৃথিবীর চন্দ্রের তুলনায় দুই তৃতীয়াংশ মাত্র। ১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কৃত হয়।

পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ

ইতোমধ্যে আমরা বলেছি বহু বহু দূরে অবস্থিত প্লুটোয় এখনও কোনো মহাকাশযান প্রেরিত হয় নি। সুতরাং এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি পৃথিবী ও পৃথিবীর মহাকাশে স্থাপিত টেলিস্কোপ দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। আবিষ্কারের কাল থেকে অনেক দিন চলে যাওয়ার পর ১৯৭৮ সালে প্লুটোর একটি চন্দ্র সম্পর্কে মহাকাশবিজ্ঞানীরা অবগত হলেন। তুলনামূলকভাবে বড়ো এই উপগ্রহের নামকরণ করা হলো শারন। ইতোমধ্যে গ্রহের কোনো উপগ্রহ আছে বলে জানা ছিলো না। প্লুটো থেকে এই চন্দ্র মাত্র ১৯,৬০০ কিমি [১২,২০০ মা] দূরত্বে থেকে গ্রহকে ৬.৩৮ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। উপগ্রহটির বিষুবরেখার ব্যাস ১,২০০ কিমি [৭৫০ মা]।

আমাদের সৌরজগতে নিজস্ব গ্রহের তুলনায় এতো বড় চন্দ্র আর কোথাও নেই। শারন আসলে তার গ্রহ প্লুটোর অর্ধেক আয়তন থেকেও কিছুটা বড়ো। এই কারণে প্লুটো ও শারনকে অনেকে জোড়া গ্রহ বলে মনে করেন। উভয়ে একে অন্যের প্রতি একই সাইড সর্বদাই বজায় রেখে ঘূর্ণমান আছে। শারনের ঘনাঙ্ক [ডেনসিটি] ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। তবে ধারণা করা হয় এতে

আছে পানি, বরফ ও শিলার মিশ্রণ। শারন সম্পর্কে আর অতিরিক্ত কিছু না জানলেও এটি আবিষ্কৃত হওয়ায় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে উভয়ের আয়তন সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পেরেছেন।

প্লুটোর কক্ষপথ খুব বেশী ডিম্বাকৃতির হওয়ায় প্রতি ২৪৮ বৎসরে এটা নেপচুনের কক্ষপথের ভেতরে চলে আসে। এ সময় প্লুটো অষ্টম গ্রহে পরিণত হয়। একটা আরেকটার কক্ষপথের মধ্যে এভাবে আসা যাওয়ার পরও প্লুটো ও নেপচুনের মধ্যে কোনো ধরনের সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। এর কারণ হলো, প্লুটোর কক্ষপথ সাধারণ প্লেইন কক্ষপথ থেকে ১৭.২ ডিগ্রী উপরে। আমরা প্রায়ই গ্রহের প্লেইন সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। এবার নিম্নে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

ইকলিপটিক প্লেইন

পৃথিবীসহ অধিকাংশ গ্রহ সূর্য থেকে যে কল্পিত রেখার উপর কক্ষপথে ঘুরে, তাকে মহাকাশ বিজ্ঞানের ভাষায় ইকলিপটিক প্লেইন [Ecliptic Plain] বলে। নীচের চিত্র থেকে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে। আসলে প্রতিটি গ্রহেরই কিছু না কিছু ইনক্লিনেশন (কাত অবস্থা) আছে তবে অধিকাংশের ক্ষেত্রে তা খুব একটা বেশী নয়। একমাত্র প্লুটোর ইনক্লিনেশন সর্বাপেক্ষা বড়ো।

আলহামদুলিল্লাহ! ঈমানী আলোকে সৌরজগৎ ও এ সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনাসহ আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সর্বশেষ গ্রহ প্লুটোর নিকট নিয়ে গেছে। এবার বাইরের দিকে অজানার উদ্দেশ্যে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে। তবে সৌরজগতের সীমারেখা এখনও অনেক দূরে। বলা যায় সূর্যের প্রভাব আরো অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। একাধিক এলাকায় বিভক্ত করে বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের বাইরের বিশাল বিস্তৃত এলাকাকে গবেষণা করে থাকেন। এসব এলাকার বিভিন্ন নামও আছে যথা: কাইপার বেল্ট, অর্ট ক্লাউড এবং হিলিওপোজ। আমরা এসব এলাকার উপর বিস্তারিত তথ্য এখন আলাদাভাবে তুলে ধরবো। এরপর আন্তঃতারা মহাকাশে আমাদের ভ্রমণ শুরু হবে।

কাইপার বেল্ট (Kuiper Belt)[17]

ছোটবড় অনেক হিমায়িত বস্তু দ্বারা এই অঞ্চলটি পরিপূর্ণ। নেপচুনের পর থেকে সর্বশেষ গ্রহ প্লুটোর কক্ষপথ থেকেও অনেকদূর পর্যন্ত কাইপার বেল্টের সীমারেখা। এই অঞ্চলের বড় আয়তনের বস্তুগুলোকে বলে কাইপার বেল্ট অবজেক্টস বা কেবিও। তবে কাইপার বেল্টের ছোটগুলো হলো কমেট বা ধূমকেতু। নীচের চিত্রে আমরা কাইপার বেল্টের অবস্থান দেখতে পাচ্ছি।

কাইপার বেল্টের প্রায় সকল বস্তুর কক্ষপথ মূলত একই প্লেইনে থাকায় মনে হয় পুরো বেল্টটি কম্পিউটারের ডিস্কের মতো। কাইপার নামক মহাকাশ বিজ্ঞানী গেল শতকের মাঝামাঝির দিকে এই বেল্টের অস্তিত্ব আছে বলে ধারণা করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে কোনো বেল্টের নামগন্ধ মিলে নি। এখন বিজ্ঞানীরা ঐ সময় বেল্ট না পাওয়ার কারণ হিসাবে বলছেন, সে যুগের ফটোগ্রাফ করার যন্ত্রাদি কাইপার বেল্ট আবিষ্কারের জন্য যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও প্রযৌক্তিক দিক থেকে উন্নতমানের ছিলো না। বিংশ শতাব্দির শেষের দিকে খুব উন্নতমানের একটি ক্যামেরার মাধ্যমে কাইপার বেল্টের ছবি তুলা সম্ভব হয়। এই নতুন ক্যামেরার নাম

---

[17] এটির আবিষ্কারক হচ্ছেন ডাচ-আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেরার্ড কাইপার [১৯০৫-১৯৭৩] (Kuiper- শব্দের সঠিক উচ্চারণ এটা)।

হলো ‘চার্জড্ কাপল্ড ডিভাইস’ বা সিসিডি। এরূপ একটি অত্যাধুনিক ক্যামেরার মাধ্যমে ১৯৯২ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানী জেইন লু ও ডেভিড জিউইট সর্বপ্রথম কাইপার বেল্টের সন্ধান পান। তারা যে বস্তুটি আবিষ্কার করেছিলেন সেই কেবিও-কে ১৯৯২কিউবি-১ নামে সম্বোধন করা হয়। এটি প্লুটো থেকেও হাজার গুণ কম উজ্জ্বল দেখায়। এখন পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক কেবিও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু কাইপার বেল্টে ৫০ কিমি [৩০ মা] বা ততোর্ধ্ব ব্যাসের কেবিও বস্তুর সংখ্যা অধিকাংশ মহাকাশ বিজ্ঞানীর মতে লক্ষাধিক হবে। সুতরাং এ্যাস্টারোইড বেল্টে যতো বস্তু আছে সে তুলনায় কাইপার বেল্টে বস্তুর সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সকল বস্তুর যৌথ ভর বা ম্যাস পৃথিবীর এক-দশমাংশ পরিমাণ হবে।

বেল্টের যাবতীয় বস্তুর কক্ষপথ দু’টি আলাদা ক্যাটাগরীতে পড়ে। অধিকাংশ কেবিও যাদেরকে ক্লাসিক্যাল কেবিও বলা হয়, ৩০ থেকে ৫০ এইউ [১ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট [এইউ] সমান ১৫,০০০০০০০ বা পনর কোটি কিমি] দূরত্বে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। দ্বিতীয়ত একটি ছোট্ট কেবিও গ্রুপ আছে যারা ৫৫ থেকে ১,০০০ এইউ দূরত্বে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় গ্রুপের সদস্যদেরকে কোনো কেনো সময় স্কাটার্ড ডিস্ক অবজেক্ট [এসডিও] বলা হয়।

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত কেবিও বস্তুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যেটি তার ব্যাস ১৩০০ কিমি [৮০০ মা] এবং সর্বাপেক্ষা ছোট্ট বস্তুর ব্যাস ২০ কিমি [১২ মা] পাওয়া গেছে। কোনো কোন কেবিও এর নিজস্ব চন্দ্রও আছে। ২০০১ ও ২০০২ সালে মোট ৭টি কেবিও আবিষ্কৃত হয় যাদের নিজস্ব উপ-কেবিও আছে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন অন্তত ২ শতাংশ কেবিও বস্তুর চতুর্দিকে তাদের চন্দ্র কক্ষপথে ঘুরে। এছাড়া প্রায় একই ভর ও আয়তন-বিশিষ্ট কিছু কেবিও আছে যারা একে অন্যকে প্রদক্ষিণ করে। এসব জোড়া কেবিও-কে বাইনারি কেবিও বলা হয়।

কাইপার বেল্টের উপর গবেষণা জোরেসুরে চলছে। সৌরজগতের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হচ্ছে কাইপার বেল্ট। বাকী দু’টোর প্রথমটি হলো অভ্যন্তরীণ

সৌরজগৎ আর দ্বিতীয়টি বাইর সৌরজগৎ। অভ্যন্তরীণ সৌরজগতে আছে এ্যাস্টারোইড বেল্টসহ স্থলভূমি বিশিষ্ট শিলাবৎ শক্ত গ্রহ উপগ্রহ। বাইর সৌরজগতে আছে গ্যাসের তৈরী একাধিক গ্রহ। গুরুত্বহ কাইপার বেল্ট এলাকায় নিউ হরাইজন [নতুন দিগন্ত] নামক একটি মহাকাশযান ইতোমধ্যে প্রেরিত হয়েছে। ক্রাফটি ২০১৭ কিংবা ২০১৮ সাল নাগাদ কাইপার বেল্টে যেয়ে পৌঁছার কথা। এই মিশনটি সফল হলে আমরা কাইপার বেল্ট সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানবো বলে আশা করা যায়।

অর্ট ক্লাউড (Oort Cloud)[18]

অর্ট ক্লাউড হলো সৌরজগতের সুদূর বাইরে অবস্থিত একটি বিরাট এলাকা। এই এলাকা সম্পর্কে শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের থিওরি থেকে আমরা কিছুটা জ্ঞানবান হয়েছি। সৌরজগতের শেষ সীমানা হিলিওপোজ ও সূর্যের ঠিক মধ্যখানে এই এলাকার অস্তিত্ব। কোনো কোনো ধূমকেতুর প্রদক্ষিণ সময় এতো বেশী যে তা একবার সূর্যের কাছে আসতে শত শত এমনকি হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়। অর্ট ক্লাউড থাকায়ই এসব কমেট অস্তিত্বশীল আছে। অর্ট ক্লাউড এলাকায় হয়তো একাধিক ধুলোবস্তু কিংবা বরফখণ্ড থাকতে

---

[18] Jan Oort (১৯০০-১৯৯২) - নামক এক আমেরিকান মহাকাশ গবেষক এই অঞ্চল থাকার ব্যাপারে সর্বপ্রথম থিওরি উপস্থাপন করেছিলেন।

পারে। নিকটস্থ কোনো তারার মহাকর্ষের প্রভাবে এগুলো সময় সময় কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এর ফলে ধূমকেতু হিসাবে এসব বস্তু সূর্যের নিকটবর্তী হয়।

অর্ট ক্লাউডের অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে শুধুমাত্র থিওরি হিসাবে থাকার পর ২০০৪ সালে সেখানকার একটি বেশ বড়ো বস্তু আবিষ্কৃত হয়। প্রায় ১৭০০ কিমি [১০০০ মা] ব্যাসসম্পন্ন এই বস্তুর নামকরণ হয়েছে সেডনা। প্রায় ১৩ বিলিয়ন কিমি [৮ বিলিয়ন মা] দূরে থেকে এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তবে অত্যন্ত বেশী ডিম্বাকৃতির প্রদক্ষিণপথ থাকায় সেডনা ১৩০ বিলিয়ন কিমি [৮৪ বিলিয়ন মা] দূরে পর্যন্ত সরে যায়। তখন এটাই হয় এ পর্যন্ত জানা, সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরতম বস্তু।

হিলিওপোজ

সূর্য থেকে বিরাট দূরত্বে এই এলাকাটি অবস্থিত। এখানে আসার পর সূর্যের মেগনেটিক ফিল্ডের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং এখান থেকেই আন্তঃতারা মহাশূন্যের শুরু। বিজ্ঞানীদের ধারণা হিলিওপোজের শুরু সূর্য থেকে ৮৬ কিংবা ১০০ এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট। এ গ্রন্থের ১০০ নং পৃষ্ঠায় হিলিওপোজের একটি কল্পিত ছবি দেওয়া হয়েছে। দেখে নিন।

ধূমকেতু

এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার আমরা ধূমকেতু বা কমেট সম্পর্কে বলেছি। ধূমকেতু মূলত সৌরজগতেরই কিছু ছোট্ট বস্তু । এগুলো সবার মতো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু গ্রহ, উপগ্রহ ও এ্যাস্টারোইড এর মতো নয়। অধিকাংশ ধূমকেতু বরফের তৈরী বলে ধারণা করা হয়। এদেরকে আমাদের দেশে অনেকে ‘লেজ তারা’ বলেন। এর কারণ হলো সূর্যের কাছাকাছি আসলে পরে তাপের ফলে এসব বস্তু থেকে বেরিয়ে আসে কোটি কোটি মাইল পর্যন্ত বিরাট লম্বা উজ্জ্বল লেজ। ধূমকেতু দেখতে সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

ধূমকেতুদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে সূর্য থেকে অনেক অনেক দূরে। নিম্নের চিত্রে আমরা এদের বিভিন্ন কক্ষপথ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সৌরজগতের বৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির কাছাকাছি পর্যন্ত যেসব ধূমকেতুর কক্ষপথ যেয়ে পৌঁছেছে ওগুলো হলো অল্প দূরত্বশীল কক্ষপথের ধূমকেতু। এর বাইরের সবগুলো বিরাট দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত কক্ষপথের, এছাড়া আরো কিছু আছে বিরাট বিরাট দূরত্বের কক্ষপথবিশিষ্ট ধূমকেতু। কোনো কোন উল্কা হয়তো তাদের জীবনে একবার মাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। ১৯৯৬ সালে 'হাইয়াকিউটেক' নামক একটি ধূমকেতু পৃথিবীর নিকট মহাকাশ উজ্জ্বল করে তুলে। এটি আবার ফিরে আসবে আজ থেকে অন্তত ১০,০০০ বছর পরে। অপরদিকে বৃহস্পতির পরিবারভুক্ত প্রায় ৬০টি ধূমকেতু আছে যাদের বার্ষিক গতি ৩.৩ থেকে ৯ বছর মাত্র। প্রখ্যাত হালিজ কমেট প্রত্যেক ৭৬ বছর পরপর পৃথিবীর নিকট মহাকাশে আত্মপ্রকাশ করে। এটার সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৮৬ সালে। এরপর আবার দেখা হবে ২০৬৪ সালে। এই ধূমকেতুটি ঈসায়ী একাদশ শতাব্দি থেকে মানুষ পর্যবেক্ষণ করে আসছে বলে প্রমাণ মিলে।

পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা

১৯৭৪ সালে স্কাইল্যাব নামক আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত প্রথম মহাকাশ স্টেশনে স্থাপিত একটি সৌর দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা 'কোহাউটেক' নামক ধূমকেতুকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর ১৯৮৬ সালে প্রখ্যাত হালিজ কমেট যখন সূর্যের নিকটবর্তী হলো তখন প্রয়াত ইউএসএসআর কর্তৃক ভেগা-১ ও ভেগা-২ নামক দু'টি মহাকাশযান ধূমকেতুর নিকটবর্তী হয়ে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিছু ছবিসহ অনেক তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করে। এছাড়া জিওটো নামক আরেকটি মহাকাশযান সর্বাপেক্ষা নিকটে যেয়ে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেয়। জিওটো ধূমকেতুর কেন্দ্র থেকে মাত্র ৬০০ কিমি [৩৭৫ মা] দূরে অবস্থান করছিলো। আরো দু'টি জাপানী মহাকাশযানও হালিজ কমেটকে বেশ দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করে। জিওটো ও ভেগা থেকে প্রাপ্ত কেন্দ্রের ছবিগুলো থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে ধূমকেতুর কেন্দ্র মূলত খুব বেশী কালো। সম্ভবত এতে হাইড্রোকার্বন থাকায় এরূপ হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রের নমুনা আকারহীন, অনেকটা আলুর মতো দেখায়। ২০০৪ সালে আমেরিকা কর্তৃক প্রেরিত মহাকাশযান 'স্টারডাস্ট' সর্বপ্রথম ভিল্ট নামক ধূমকেতুর কমা [বা মাথার

চতুর্দিকস্থ গ্যাসীয় এলাকা] পর্যন্ত যেয়ে পৌঁছে এবং কিছু ধুলো বস্তু সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। মহাকাশযানটি ধূমকেতুর সাথে সাক্ষাৎ করে যখন ওটা পৃথিবী থেকে ৩৯০ মিলিয়ন কিমি [২৪০ মিলিয়ন মা] দূরে অবস্থান করছিলো।

আন্তঃতারা মহাশূন্য (Intersteller Space)

আমরা এবার তারাদের মধ্যস্থ মহাশূন্যে কি আছে সে সম্পর্কে কিছু তথ্যাদি তুলে ধরবো। আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি বা মিল্কিওয়ে এর যে এলাকায় সূর্যের অবস্থার তার চতুর্দিকস্থ আন্তঃতারা মহাশূন্য বিরাট আয়তনের। অর্থাৎ এই এলাকায় তারাদের সংখ্যা ও ডিস্ট্রিবিউশন তুলনামূলকভাবে পাতলা। আমরা যতো বেশী গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হবো তারাদের সংখ্যা ও ডিস্ট্রিবিউশন ততো ঘন হবে। সূর্যের হিলিওপোজ থেকে আমাদের লকেল এলাকার আন্তঃতারা মহাশূন্যের শুরু। সূর্য থেকে নিকটতম তারাটির দূরত্ব ৩ থেকে ৪ আলোক বছর। অর্থাৎ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল প্রতি সেকেন্ড বেগবান একটি আলোকরশ্মি এই তারায় যেয়ে পৌঁছতে ৩ থেকে ৪ বছর অতিবাহিত হয়। যে সিস্টেমে এই তারাটির অবস্থান তাকে বলে আলফা সেন্টোরী তারা সিস্টেম। এই সিস্টেমে তিনটি তারা আছে: আলফা সেন্টোরী-এ, আলফা সেন্টোরী-বি ও আলফা সেন্টোরী-সি। এ ও বি পৃথিবী থেকে

৪.৩৫ আলোক বছর দূরে অবস্থান করছে। আলফা সেন্টোরী-সি বর্তমানে পৃথিবীর নিকটতম তারা যার দূরত্ব ৪.২ আলোক বছর। এই তারাটিকে প্রক্সিমা সেন্টোরী নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। যা হোক আমরা ওসব তারার নিকটে না যেয়েই অনেক কিছু বলে ফেললাম! আমরা এখনও অন্ধকারে আবৃত আ˜তঃতারা মহাকাশে অবস্থান করছি। এই মহাকাশে কি কোনো বস্তু আছে?

বাস্তবে আন্তঃতারা মহাশূন্য একেবারে বস্তুশূন্য নয়। অধিকাংশ গবেষণা থেকে জানা যায় অত্যন্ত পাতলা গ্যাস ও ধুলোবস্তু এতে বিদ্যমান। গ্যাস মূলত হাইড্রোজেন আর ধুলো মূলত কার্বন মলিকিউল। হাইড্রোজেন সমগ্র মহাবিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বস্তু হিসাবে অস্তিত্বশীল আছে। ধারণা করা হয় বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মেটার বা বস্তু হলো হাইড্রোজেন। এর কারণ হলো সকল তারাই হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে জ্বলন্ত আছে। এই গ্যাসই হলো তারাদের অকৃত্রিম আনবিক চুল্লির জ্বালানি। আন্তঃতারা মহাকাশে সাধারণ হাইড্রোজেন তথা এইচআই [ঐও] ও আয়োনাইজ্ড [চার্জ করা] হাইড্রোজেন তথা এইচআইআই [ঐওও] এই উভয়টি মেঘমালা হিসাবে বা এমনিতেই বিদ্যমান আছে। তবে এইচআই অঞ্চল ভীষণ ঠাণ্ডা হওয়ায় সেসব এলাকা থেকে দৃশ্যমান কোনো রশ্মি নির্গত হয় না। তবে রেডিও তরঙ্গ বেরিয়ে আসে। অপরদিকে এইচআইআই অঞ্চল মূলত খুব উচ্চ তাপসম্পন্ন তারাদের চতুর্দিকে অবস্থান করে। এসব এলাকা থেকে স্পেকট্রামের প্রায় সকল তরঙ্গে বিকিরণ হয়- দৃশ্যমান আলোও এর অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব উজ্জ্বল মেঘমালাযুক্ত এলাকাকেই বলে নেব্যুলা। এরূপ একটি নেব্যুলার নাম হলো গ্রেট অরায়ন নেব্যুলা [নীচে এর একটি ছবি দেওয়া হলো]।

আন্তঃতারা মহাশূন্যে কি পরিমাণ বস্তু আছে তা নির্ভর করে কোন্ ধরনের গ্যালাক্সির মধ্যে এই মহাশূন্য বিদ্যমান। সাধারণত ‘স্পইর্যাল’ গ্যালাক্সি যেমন আমাদের মিল্কিওয়েতে আন্তঃতারা বস্তুর মাত্রা বেশী। অপরদিকে ‘ইলিপটিক্যাল’ বা বৃত্তাকার গ্যালাক্সিতে আন্তঃতারা বস্তু নেই বললেই চলে। আমাদের মিল্কিওয়ের মোট ভর বা ম্যাসের ৩ শতাংশ আন্তঃতারা বস্তু। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আন্তঃতারা বস্তুকে আ˜তঃগ্যালাক্টিক বস্তু থেকে আলাদা করে গবেষণা করেন। আমরা একটু পরই আন্তঃগ্যালাক্টিক বস্তুর উপর আলোচনা করবো।

নব্বুই শতাংশ হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা আন্তঃতারা মহাশূন্য পরিপূর্ণ আছে বলে আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। বাকী ১০ শতাংশের ৯ শতাংশ হিলিয়াম ও ১ শতাংশ অন্যান্য রসায়নিক বস্তু দ্বারা বিস্তৃত। এতো কিছু বলার পরও আর্ন্তঃতারা মহাশূন্যের গ্যাস এতোই পাতলা যে, পৃথিবীর যে কোনো ল্যাবেরটরিতে তা শূন্যস্থান বা ভাকিউম বলেই বিবেচিত হবে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের ধারণা আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি সৃষ্ট হয়েছে এক বিরাট গ্যাস মেঘমালা থেকে। তবে তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্ট হওয়ার পরও কিছু বস্তু অবশিষ্ট থেকে যায়- আর এই থেকে-যাওয়া বস্তুই হলো ইন্টারস্টেলার গ্যাস বা আন্তঃতারা বাষ্প।

নেব্যুলা

অনেক আন্তঃতারা গ্যাস সুদৃশ্য ও চিত্তাকর্ষক নেব্যুলা আকারে মহাকাশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা ইতোমধ্যে প্রখ্যাত অরায়ন নেব্যুলা সম্পর্কে বলেছি ও এর একটি ছবি দেখেছি। পরের পৃষ্ঠায় আরো ৩টি প্রখ্যাত নেব্যুলার ছবি দেওয়া হয়েছে।

বিখ্যাত ওরাইওন নেব্যুলা

ফরাসী মহাকাশ বিজ্ঞানী চার্লস মেসিয়ার সপ্তদশ শতাব্দিতে অনেক নেব্যুলা তালিকাভুক্ত করেছিলেন। নেব্যুলা থেকে উজ্জ্বল আলো নির্গত হওয়ার কারণ দু'টি। প্রথমটি হলো রিফ্লেকশন ও দ্বিতীয়টি এমিশন [বা বিকিরণ]। যেসব নেব্যুলা রিফ্লেকশনের কারণে দৃশ্যমান হয় এগুলো মূলত কোনো উজ্জ্বল তারার নিকটে অবস্থান করে। এগুলো আসলে ধুলোর তৈরী। অপরদিকে এমিশন নেব্যুলা মূলত চার্জ করা হাইড্রোজেনের তৈরী [আয়োনাইজড্]।

নিকটস্থ তারার এনার্জি এই গ্যাসকে উষ্ণ করে তুলে, ফলে এ থেকে লালচে আলো নির্গত হয়। অনেকের মতে ঘন আন্তঃতারা নেব্যুলায় তারাদের জন্ম হয়।

তারকা ও তাদের জীবন

তারার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে এ্যাস্ট্রনোমাররা বলেন, এগুলো হলো বিরাট ওজনবিশিষ্ট উজ্জ্বল গ্যাসের তৈরী গোলক যাদের মধ্য থেকে দৃশ্যমান আলোসহ বিভিন্ন ধরনের এনার্জি নির্গত হয়। তারাদের অভ্যন্তরে আনবিক স্কেলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। সমগ্র মহাবিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটতম তারা হলো আমাদের সূর্য। রাতের আকাশে খালি চোখে দৃশ্যমান সকল তারাই মূলত আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি মিল্কিওয়েের [বা ছায়াপথের] সদস্য। আন্তঃতারা মহাশূন্যের উপর আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। এবার তারাদের জীবন সম্পর্কে জানা দরকার। এ পরিচ্ছেদে আমরা তা-ই বর্ণনা করবো।

আমাদের অনেকের ধারণা অন্ধকার রাতে কোটি কোটি তারা দেখে থাকি। বাস্তবে ৫,০০০ কিংবা এরচেয়ে কিছু বেশী আমাদের খালি চোখে ধরা দেয়। তবে একটি ছোট্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে শত সহস্র তারা দৃশ্যমান হয়। আর বড়ো বড়ো টেলিস্কোপ দ্বারা শুধু প্রায়-গণনাতীত তারা নয় কোটি কোটি গ্যালাক্সি বা তারাজগৎ দৃশ্যমান হয়। এদের প্রতিটিই ১০০ থেকে ২০০ বিলিয়ন[19] তারাদের সমন্বয়ে গঠিত। আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে অবগত করছেন যে, পুরো মহাবিশ্বে অন্তত ১x ১০^{২২} তারা আছে। এই সংখ্যাটি অত্যন্ত বড়ো- ১ এর পরে ২২টি শূন্য দিলে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে লিখিত হবে। তারাদের সংখ্যাই শুধু আশ্চর্যজনকভাবে বেশী নয়, এদের কোনো কোনটি এতোই বড় যে, যদি এরূপ বিরাটকায় একটি এনে সূর্যের স্থানে রাখা হয় তাহলে এর অভ্যন্তরে পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এমনকি শনিগ্রহও ঢুকে পড়বে! অপরদিকে ছোট্ট কিছু তারা আছে যাদেরকে ‘সাদা বামন’ বলে, আয়তনে আমাদের পৃথিবীর সমপরিমাণ হবে। কিন্তু

---

[19] ১ বিলিয়ন = ১ হাজার মিলিয়ন। ১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ, সুতরাং ১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি।

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তারার নাম হলো 'নিউট্রন তারা', এদের ব্যাস মাত্র ২০ কিমি [১২.৫ মা] কিংবা কম।

সকল তারাই ভীষণ গরম আলোকোজ্জ্বল টাইট-ফিট গ্যাসের তৈরী। কোনো কোন তারার বাইরের স্তর এতোই শূন্য যে একে লাল-গরম ভাকিউম বা বস্তুশূন্য বললে অত্যুক্তি হবে না। অপরদিকে কিছু তারা আছে যাদের বাইরের স্তরে এতো বেশী বস্তু আছে যে সেখানে চায়ের চামচে এক চামচ বস্তুর ওজন হবে কয়েক হাজার কিলোগ্রাম। আগেই বলেছি তারারা মূলত হাইড্রোজেন গ্যাসের তৈরী। তবে এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হিলিয়াম গ্যাসও আছে। এছাড়া খুব অত্যল্প মাত্রায় অক্সিজেন, কার্বন, নিওন ও নাইট্রোজেন গ্যাসও তারার মধ্যে পাওয়া যায়।

আমাদের সূর্যটি দেখতে অন্যদের তুলনায় ভিন্ন মনে হওয়ার মূল কারণ হলো এর দূরত্ব। পরবর্তী নিকটতম তারার তুলনায় এটি আমাদের থেকে আড়াই লক্ষ গুণ নিকটে। সূর্যের কাছের তারার নাম প্রক্সিমা সেন্টোরী। এটি ৩০ ট্রিলিয়ন [৩০ হাজার মিলিয়ন] কিলোমিটার [২০ হাজার মিলিয়ন মাইল] দূরে অবস্থিত। সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে ৮ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। মহাবিশ্বের দূরতম তারা বা গ্যালাক্সি থেকে আলো আসতে হাজার হাজার কোটি বছর চলে যায়। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান আমাদের গ্যালাক্সির ২১টি তারার একটি টেবিল নীচে [পরবর্তী পৃষ্ঠায়] দেওয়া হলো। টেবিলে সংশ্লিষ্ট তারার দূরত্বও দেখানো হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে এক আলোক-বছর বলতে আলোকরশ্মি ৩ লক্ষ [১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল] কিলোমিটার প্রত্যেক সেকেন্ড বেগে চলন্ত থেকে এক বৎসরে যে বিরাট দূরত্ব ভ্রমণ করে তাকেই বুঝায়।

প্রতিটি তারার একেক ধরনের রং আছে। সাধারণত গাঢ় লাল থেকে বিভিন্ন ছায়ার কমলা ও হলুদ এবং গাঢ় নীল ও ধবধবে সাদা রংয়ের তারা দেখা যায়। তারার তাপমাত্রার উপরই রং নির্ভর করে। সর্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা তারাদের রং হয় লাল আর গরমগুলোর রং হয় নীল। অধিকাংশ তারাই আনবিক রিয়েকশনের মাধ্যমে আলো সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়াকে বলে ফিউশন। এতে হাইড্রোজেন হিলিয়াম পদার্থে পরিণত হয়। চারটি হাইড্রোজেন এটম একত্রিত হয়ে একটি হিলিয়াম এটমে

রূপান্তর হয় এবং প্রতিক্রিয়ার সময় রিলিজ হয় বিরাট অঙ্কের এনার্জি যার মধ্যে আলো ও তাপ অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান নিকটস্থ প্রথম ২১টি তারা		
তারার বৈজ্ঞানিক নাম	**সাধারণ নাম**	**পৃথিবী থেকে দূরত্ব (আলোক-বছর)**
আলফা কানিস মেজরিস	সিরিয়াস	৯
আলফা কারিনায়ি	কেনোপাস	৯৮
আলফা সেন্টোরী	রিজিল কেন্ট	৪
আলফা বুটিস	আরক্টিউরাস	৩৬
আলফা লেরেই	ভেগা	২৬
আলফা অরিগেই	কাপেলা	৪২
বিটা অরিওনিস	রিগেল	৯১০
আলফা কেনিস মাইনোরিস	প্রকিওন	১১
আলফা এরিডানি	একারনার	৮৫
আলফা অরিওনিস	বিটেলজিউস	৫১০
বিটা সেন্টোরী	হেডার	৪৬০
আলফা একুাইলাই	আলতেয়ার	১৭
আলফা টোরী	আলদিবারান	৬৫
আলফা ক্রুসিস	এ্যাকরাস	৩৬০
আলফা স্করপিয়াই	এ্যানটারিস	৩৩০
আলফা ভারজিনিস	স্পাইকা	২৬০
বিটা জেমিনোরাম	পোলাক্স	৩৬
আলফা পাইসিস অস্ট্রিনি	ফমালহট	২২
আলফা সিগনি	দিনেব	১,৮৩০
বিটা ক্রুসিস	মাইমোসা	৪২০
আলফা লিওনিস	রেগুলাস	৮৫

গেল শতকের নব্বুই দশকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের বাইরে অন্য কিছু তারার চতুর্দিকে গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। দূরত্বের ফলে অন্য সৌরজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন খুব সীমিত। তবে আমাদের পৃথিবীর মতো অনুরূপ একাধিক গ্রহ অন্যত্র থাকতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন।

তারাদের বৈশিষ্ট্য

আজকাল মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারাদের বস্তুগত ও রসায়নিক বৈশিষ্ট্যবলী সম্পর্কে জানতে যেয়ে তারা থেকে নির্গত এনার্জি গবেষণা করে থাকেন। তারকার বায়ুমণ্ডল কিংবা বাইরের গ্যাসীয় স্তর পরীক্ষা করে অনেক ব্যাপার জানা যায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের নিকটতম তারা সূর্যকে গবেষণা করে জগতব্যাপী সূর্যের মতো অসংখ্য তারা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তারাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে আমরা গ্যালাক্সি ও তারা সৃষ্টি ক্রিয়ার ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য পেতে পারি।

তারার বায়ুমণ্ডল

আমাদের দৃষ্টিতে তারাদের যে অংশটি ভেসে আসে তা হলো এর বায়ুমণ্ডল। সূর্য একটি তারা এবং এটা আমাদের অতি নিকটে হওয়ায় একে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে তারা সম্পর্কে অনেক ব্যাপার জানা সম্ভব। সূর্যের বায়ুমণ্ডল অন্তত ৩২০ কিমি [২০০ মা] গাঢ়। এটা অবশ্য সূর্যের আয়তনের তুলনায় অনেক কম। এরপরও যে কোনো তারার বায়ুমণ্ডল গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ঐ তারা সম্পর্কে অনেক ব্যাপার জানতে পারেন।

একটি তারা থেকে নির্গত আলোর মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, মেগনিটিউড বা ঔজ্জ্বল্যতা। এই মাপ দ্বারা তারাটি কতটুকু উজ্জ্বল দেখায় তা নির্ণিত হয়। দ্বিতীয়ত লিউমিনোসিটি হলো যে কোনো তারা থেকে নির্গত মোট আলোকের একটি মাপ। তৃতীয়ত তারার স্পেকট্রাম গবেষণা করে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা একে একটি 'স্পেকট্রেল টাইপ' হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই ক্লাসিফিকেশন দ্বারা তারার তাপমাত্রা ও এটি কোন্ কোন্ রসায়নিক বস্তুর তৈরী তা নির্ণিত হয়। এই হিসাবে আমাদের তারার [বা সূর্যের] মেগনিটিউড হলো ৪.৮, এটা তার এবস্যুলুট মেগনিটিউড। তবে সূর্য তো অতি নিকটে তাই তার দৃশ্যমান মেগনিটিউড খুব বেশী যা হলো, -২৬.৭২। মাইনাস সংকেত দ্বারা ঔজ্জ্বল্যতার তীব্রতা বুঝায়। সুতরাং এবস্যুলুট বা আসল মেগনিটিউড দ্বারা তারার ঔজ্জ্বল্যতার মূল মাত্রা বুঝানো হয়, যা এপারেন্ট বা দৃশ্যমান মেগনিটিউড থেকে ভিন্ন। শেষোক্ত হিসাব নির্ভর করে

তারার দূরত্বের উপর। যখন বলা হবে দূরের একটি তারার এবস্যুলুট মেগনিটিউড -৯ [যা হলো সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারা] তখন বুঝতে হবে এটি সূর্য থেকে অনেকগুণ উজ্জ্বল। অপরদিকে জানা সর্বাপেক্ষা অনুজ্জ্বল তারাদের এবস্যুলুট মেগনিটিউড মাত্র ২০। রাতের আকাশে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারার নাম সিরিয়াস। এর দৃশ্যমান মেগনিটিউড -১.৪৬। তারাটি আসলে সূর্য থেকে প্রায় আড়াই গুণ বড়ো। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান সর্বাপেক্ষা অনুজ্জ্বল তারার এপারেন্ট মেগনিটিউড মাত্র ৬। এখন সূর্যের স্পেকট্রেল টাইপ কী হতে পারে?

আমাদের সূর্যকে জি-২ স্পেকট্রেল টাইপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ক্লাসের তারাদের বৈশিষ্ট্য হলো, স্পেকট্রোগ্রাফে হাইড্রোজেন [এইচ] ও কেলসিয়াম [কে] রেখার প্রাধান্য। এদের অভ্যন্তরে লৌহসহ বিভিন্ন ধাতু থাকে। জি টাইপের অন্যান্য তারাকে বলে 'সোলার স্টার' বা সৌরতারা- কারণ, এগুলো অনেকটা আমাদের সূর্যের মতো।
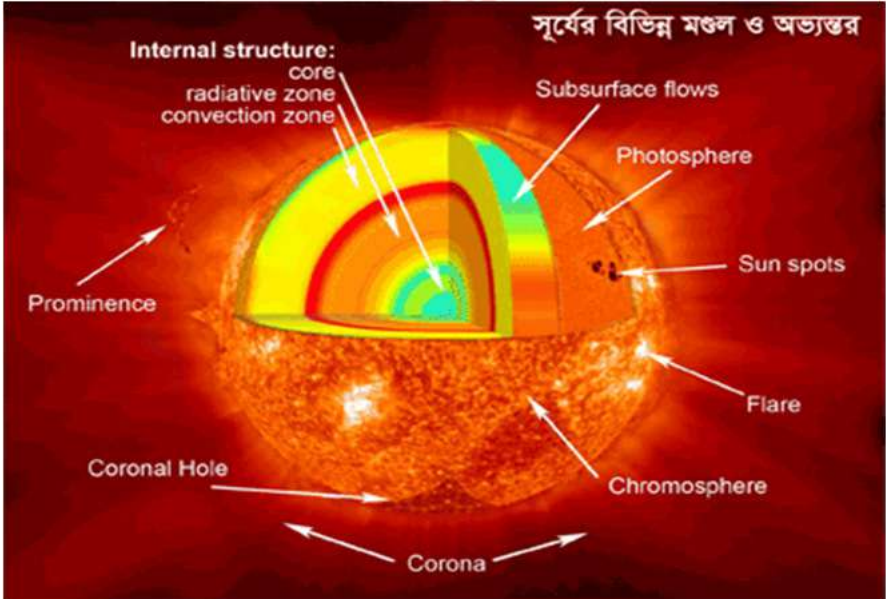
উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যত্রয় তারাদের বায়ুমণ্ডল গবেষণার মাধ্যমে নির্ণিত হয়। আর বায়ুমণ্ডল ছাড়া আমরা আর কী-ই বা পরীক্ষা করতে পারি? আমাদের নিকটস্থ তারার অভ্যন্তরে যাওয়া তো দূরের কথা সর্বাপেক্ষা শক্ত কোনো ধাতুর তৈরী মহাকাশযানও এর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না- অনেক আগেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সুতরাং তারার বায়ুমণ্ডল থেকেই আমাদেরকে যেটুকু সম্ভব জানার চেষ্টা চালাতে হবে। বায়ুমণ্ডল গবেষণার দ্বারা আমরা উপরে বর্ণিত তিনটি বৈশিষ্ট্য তথা মেগনিটিউড, লিউমিনেসিটি ও স্পেকট্রেল টাইপ ছাড়াও আরো যেসব ব্যাপার জানতে পারি তাহলো: ইফেক্টিভ তাপমাত্রা, তারার আয়তন বা ব্যাস ও তারার অভ্যন্তর।

ইফেক্টিভ তাপমাত্রা

প্রত্যেক তারার বায়ুমণ্ডল ও কেন্দ্রের মধ্যে তাপমাত্রার বিরাট তারতম্য থাকে। সাধারণত কেন্দ্রের তাপমাত্রা লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টি [২৭ মিলিয়ন ডিগ্রী ফা]। কিন্তু তার বায়ুমণ্ডলের বাইরের স্তরের তাপমাত্রা মাত্র ৫৮০০ ডিগ্রী সেন্টি [১০,০০০ ডিগ্রী ফা]। বিজ্ঞানীরা তারা থেকে প্রাপ্ত এনার্জির স্পেকট্রাম গবেষণা করে এর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারেন। পারফেক্ট কালো বস্তুতে [ব্ল্যাক বডি] পতিত সকল রেডিয়েশন চুষে যায়- কিছুই প্রতিবিম্ব হয় না। বিজ্ঞানীরা এরূপ কাল্পনিক বস্তুর তাপমাত্রা ও পতিত রেডিয়েশনের মধ্যে সম্পর্ক কি সেটাও জানেন। সুতরাং তারা থেকে প্রাপ্ত বিকিরণের সঙ্গে কালো বস্তুর বিকিরণ নিয়ে পার্থক্য নির্ণয়ের মাধ্যমে তারার তাপমাত্রা বের করা সম্ভব। আর এভাবেই তারার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা নির্ণিত হয়।

তারার আয়তন নির্ণয়

গত শতকের দ্বিতীয় দশকে বিজ্ঞানীরা গোটা ক'টি বিরাট ও বিরাট-বিরাট আয়তনবিশিষ্ট তারার ব্যাস একটি পুরাতন যন্ত্রের মাধ্যমে মেপেছিলেন। এই যন্ত্রটির নাম হলো 'মাইকেলসন স্টেলার ইনটারফেরোমিটার'। পৃথিবীতে দৃশ্যমান তারার

কৌণিক ব্যাস- যা ডিগ্রী এবং আর্কের সেকেন্ড দ্বারা নির্ণিত হয়, মাপার পর তারাটির জানা দূরত্ব থেকে এর ব্যাস অঙ্ক কষে বের করা হতো।

এভাবে মেপে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু তারা আবিষ্কার করেছেন যাদের ব্যাস সূর্যের তুলনায় হাজার গুণ পর্যন্ত বেশী। আর্কটিউরাস নামক একটি তারা আছে যার ব্যাস সূর্য থেকে ২৩ গুণ। আর বিটেলজিউস নামক সুপারজায়ান্ট তারার ব্যাস সূর্য থেকে ১ হাজার গুণ বেশী।

জোড়া তারাদের ব্যাস নির্ণয়ের আরেক পদ্ধতি হলো, যদি উভয় তারা পৃথিবী থেকে একই রেখায় দৃশ্যমান হয় তাহলে একটা আরেকটাকে কিভাবে গ্রহণ করে তা পরীক্ষা করা। গ্রহণের সময় আলোর মাত্রা কি পরিমাণ কমে আসে তা মেপে উভয় তারার আনুপাতিক ব্যাস নির্ণয় সম্ভব। এছাড়া ডপলার ইফেক্ট যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে বাস্তব আয়তন নির্ণয় করা যেতে পারে। ডপলার ইফেক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমরা ইতোমধ্যে বর্ণনা করেছি।

তারার বায়ুমণ্ডল গবেষণার মাধ্যমেও আয়তন বের করা যায়। একটি তারা থেকে কি পরিমাণ এনার্জি প্রত্যেক একক ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসে তা নির্ভর করে তারাটির তাপমাত্রার উপর। সুতরাং যদি দু'টি তারা একই তাপমাত্রায় জ্বলে থাকে তাহলে বড়ো তারাটির সারফেস ক্ষেত্রফল বেশী হবে এবং সে কারণে তার মধ্যে ঔজ্জ্বল্যতার মাত্রাও হবে অধিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা সূর্য ও কাপেলা নামক অপর একটি তারার কথা বলতে পারি। উভয় তারাই জি-টাইপ। উভয়ের ইফেক্টিভ তাপমাত্রা ৫৮০০ ডিগ্রী সে [১০,০০০ ডিগ্রী ফা]। তথাপি বেশী ঔজ্জ্বল্যতা হেতু কাপেলা এইচ-আর ডায়াগ্রামে অনেক উচ্চে অবস্থান করে। সুতরাং মোট সারফেস ক্ষেত্রফল সূর্য থেকে বড় হতেই হবে- আর বাস্তবে কাপেলার ব্যাস সূর্যের তুলনায় ১৬ গুণ বেশী। অপরদিকে এ-টাইপ ও এফ-টাইপ সাদা বামন তারাদের অবস্থান যেহেতু মূল সিক্যুয়েন্সের নীচে তাই তাদের সারফেস ক্ষেত্রফল অনেক কম হওয়ার কথা [বায়ের চিত্র দেখুন]। সুতরাং কিছু কিছু সাদা বামন তারা আছে যাদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস থেকেও কম।

তারাদের অভ্যন্তর

আমাদের নিকটতম তারা সূর্যের অভ্যন্তর গবেষণার মাধ্যমে তারাদের অভ্যন্তর সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেয়ে যাবো। ১৬৬ পৃষ্ঠার ছবিতে সূর্যের অভ্যন্তর ও এর বিভিন্ন স্তর চিত্রিত হয়েছে।

সূর্যের স্তরসমূহের মধ্যে কৌর [কেন্দ্র], রেডিয়েশন জোন [বিকিরণ অঞ্চল], কনভেকশন জোন [পরিচলন অঞ্চল] এবং ফটোস্ফিয়ার [আলোক-গোলক] এখানে উল্লেখযোগ্য। সূর্যের কেন্দ্রে আনবিক ফিউশন রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হচ্ছে। এখানেই সূর্যের এনার্জি-সৃষ্টির কারখানা বিদ্যমান। কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১৬ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টি [২৯ মিলিয়ন ডিগ্রী ফা]। কেন্দ্রের গ্যাসে এতো বেশী চাপ বিরাজ করে যে, সেখানকার সকল বাষ্পীয় বস্তু পানি থেকেও ১৫০ গুণ বেশী ঘন। রেডিয়েশন জোনে তাপমাত্রা অনেকটা কম- প্রায় ২.৫ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টি [৪.৫ মিলিয়ন ডিগ্রী ফা]। এখানে এসে গ্যাস পানির মতো তরল অবস্থা ধারণ করে এবং কেন্দ্রে সৃষ্ট তাপ-এনার্জি বাইরের দিকে ট্রান্সফার হতে থাকে। কনভেকশন জোনে গ্যাসের মধ্যে সৃষ্টি হয় গতি যার মাধ্যমে সূর্যের এনার্জি আরোও বাইরের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এখানকার তাপমাত্রা ২ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টি [৩.৬ মিলিয়ন ডিগ্রী ফা]। গ্যাসের ঘনাঙ্কও অনেকটা কম- পানির তুলনায় এক-দশমাংশ হবে। ফটোস্ফিয়ার আরো বেশী ঠাণ্ডা। এই জোনের তাপমাত্রা ৫৫০০ ডিগ্রী সেন্টি [১০,০০০ ফা] পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখানকার গ্যাসের ঘনাঙ্ক পানির তুলনায় অত্যল্প- পানির ঘনাঙ্কের এক মিলিয়ন ভাগের একভাগ হবে মাত্র। তবে ফটোস্ফিয়ার থেকেই সূর্যের যাবতীয় এনার্জি চতুর্দিকের মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

তারাদের সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে ঔজ্জ্বল্যতা, তাপমাত্রা এবং আয়তন খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও এদের ম্যাস বা ভর ও রসায়নিক দ্রব্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। আমরা ইতোমধ্যে সূর্যের অভ্যন্তরস্থ গ্যাস, এনার্জি, এনার্জি ট্রান্সফার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একটি তারার ভর ও রসায়নিক বস্তুর উপর নির্ভর করে এর কেন্দ্রের তাপমাত্রা- এবং এ মাত্রাই নিয়ন্ত্রণ

করে বাইরের দিকে সৃষ্ট চাপের। অভ্যন্তর তথা কেন্দ্রের দিকে ধাবিত মহাকর্ষের শক্তি যদি এই বাইরের দিকে ধাবিত চাপের তুলনায় কম হয় তাহলে তারাটি আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকবে যতক্ষণ না একটি ব্যালান্সে পৌঁছা যায়।

তারাদের ভর বা ম্যাস

এই হিসাবটি মূলত তারার মধ্যস্থ বস্তুর পরিমাণ। কতটুকু বস্তু বা মেটার আছে এবং কিভাবে এগুলো বিস্তৃত আছে সেটার উপর নির্ভর করে তারার মহাকর্ষের মাত্রা। জোড়া তারা থাকলে এই ভর মাপা অনেকটা সহজ। জোড়া তারারা একে অন্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ গতি, একে অন্য থেকে দূরত্ব ইত্যাদি জানতে পারলে সহজেই উভয় তারার ভর বের করা যায়। কারণ জোড়া তারার কক্ষপথ, একে অন্য থেকে দূরত্ব ও গতি নির্ভর করে মহাকর্ষের উপর। তারার ভর নির্ণয়ে তিন ধরনের বাইনারি বা জোড়া তারা ব্যবহৃত হতে পারে। এর প্রথমটিকে বলে দৃশ্যমান বাইনারি। এ ক্ষেত্রে একটি টেলিস্কোপের মাধ্যমে উভয় তারার গতিবিধি সরাসরি দেখে মাপা হয়। দ্বিতীয় ধরনের বাইনারিকে বলে স্পেকট্রোস্কোপিক বাইনারি। এগুলোর মধ্যস্থ বিভিন্ন গতিবিধি 'ডপলার শিফ্ট' ব্যবহার করে বের করা যায়। তৃতীয় ধরনের বাইনারির নাম হলো 'ইকলিপটিক বাইনারি'। এসব বাইনারির বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবী থেকে একই প্লেইনে থাকার ফলে কক্ষপথে ঘুরার সময় এক তারা অপরটির সামনে এসে সাময়িক গ্রহণ [Eclipse] সৃষ্টি করে।

অন্য আরেক উপায়ে তারার ম্যাস নির্ণয় করা সম্ভব। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই উপায়ের নামকরণ করেছেন, 'ভর-ঔজ্জ্বল্যতা আইন' [Mass-Luminosity Law]। এই আইন আমাদেরকে বলে, মূল সিক্যুয়েন্সের তারা যাদের ম্যাস বেশী তাদের ঔজ্জ্বল্যতা ওসব কম ম্যাসবিশিষ্ট তারাদের তুলনায় বেশী। তারা যতো বেশী ভরসম্পন্ন হবে তার কেন্দ্রের দিকে মহাকর্ষের মাত্রাও ততো শক্তিশালী হবে। আর কেন্দ্রের উপর চাপ বেশী হলে তাতে তাপমাত্রাও বাড়বে। এসব ফিজিক্যাল সম্পর্ক থেকে তারার ভর নির্ণয় করা যায়।

তারাদের গতিবিধি

প্রতি রাতেই একই স্থানে আমরা তারাদের অবস্থান দেখতে পাই। এতে মনে হয় এগুলো সর্বদাই মহাকাশে অনড় অবস্থায় আছে। কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। প্রত্যেকটি তারারই বিভিন্ন গতি আছে। আমাদের নিকটতম তারা সূর্যও এসব গতি থেকে মুক্ত নয়। ইতোমধ্যে আমরা এ সম্পর্কে তথ্যাদি তুলে ধরেছি। তবে তারাদের দূরত্ব বিশাল হওয়ায় আমাদের খালি চোখে এই গতি ধরা দেয় না। সময়ের ব্যবধানে তারাদের অবস্থান পরিবর্তনকে বলে Proper Motion বা বাস্তব গতি। এই গতি এবং প্রত্যহ রাতে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃশ্যমান গতির মধ্যে অবশ্য রাতদিন পার্থক্য বিদ্যমান। দ্বিতীয়টি আমাদের পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণন বা স্পিন গতির ফলে দেখা যায়। পৃথিবী থেকে কোনো তারা যদি দূরে সরে যায় কিংবা কাছে আসতে থাকে তাহলে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এর গতির পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি নির্ণয় করতে পারেন, তারার স্পেকট্রাম গবেষণার মাধ্যমে। কারণ স্পেকট্রামে তারার গতির ফলে লাল কিংবা নীল শিফ্ট ঘটে, যাকে ডপলার শিফ্ট বলে।

তারাদের গতি ছাড়াও দূরত্ব মাপার একটি সুন্দর উপায় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এ উপায়কে বলে 'স্টেলার প্যারালাক্স' [Stellar Parallax]। পৃথিবী যেহেতু সূর্যের চতুর্দিকে তার কক্ষপথে ঘুরে তাই ৬ মাস অন্তর পৃথিবীর অবস্থান বিপরীত দূরত্বে হয়ে থাকে। উভয় অবস্থান থেকে রাতের আকাশে দৃশ্যমান কোনো তারার অবস্থান কতো ডিগ্রী পরিবর্তন হয় তা মাপা যায়। এই দৃশ্যত অবস্থান পরিবর্তন থেকে তারাটির দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব। এর জন্য ত্রিকোণমিতির একটি আইন ব্যবহারই যথেষ্ট। আমরা দু'টি কোণ ও একটি রেখার মাপ যেহেতু জানি তাই অপর দু'টি রেখার মাত্রা সহজে অঙ্ক কষে বের করতে পারি যার একটি তারার দূরত্ব বুঝায়। প্যারালাক্স ও স্পেকট্রাম গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান অধিকাংশ তারার গতিবিধি ও দূরত্ব বের করা হয়েছে। এ থেকে এটাই জানা গেছে যে, সৌরজগতের আশপাশের তারাদের গতি বিভিন্ন দিকে। একে অন্য থেকে এদের গড় গতি ২৪ কিমি/সেকেন্ড [১৫ মাইল প্রতি সেকেন্ড]। আমাদের সূর্যের গতি ২৬ কিমি/সেকেন্ড [১৬ মাইল প্রতি সেকেন্ড] এবং এটা [সমগ্র সৌরজগৎ] হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের নিকটস্থ ভেগা নামক তারার দিকে ছুটে যাচ্ছে।

তারাদের এনার্জি সূত্র

আমরা ইতোমধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করেছি, যে কোনো তারার এনার্জি সূত্র মূলত আনবিক প্রতিক্রিয়া। ফিউশন নামক নিউক্লিয়ার রিয়েকশনের মাধ্যমে তারারা বিরাট অঙ্কের এনার্জি তাদের কেন্দ্রে সৃষ্টি করে। এ থেকেই তারার মধ্য থেকে নির্গত হয় আলো ও তাপসহ বিভিন্ন এনার্জি। এ প্রসঙ্গে আমরা আরো একটু গভীরে যেয়ে এই আনবিক রিয়েকশনের উপর আলোচনা করবো। তারাদের কেন্দ্রে যেভাবে এনার্জি সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মূলত নিকটতম তারা সূর্য থেকেই অর্জিত হয়েছে। তবে সূর্য আসলে মূল সিকুয়েন্সের একটি মধ্যম বয়সী বৈশিষ্ট্যসূচক তারা। বৈশিষ্ট্যসূচক এজন্য বলেছি যে, জগতের অধিকাংশ তারাই এই শ্রেণীভুক্ত কিংবা অনুরূপ। সুতরাং সূর্যকে গবেষণার মাধ্যমে আমরা যেটুকু অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করবো তা দূরবর্তী তারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, অন্তত একই ধরনের তারার ক্ষেত্রে তো তা অবশ্যই সত্য।

নিম্নের (পরের পৃষ্ঠার) ছবিতে আমরা দু'টি মৌলিক আনবিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। প্রথম ছবিতে দেখানো হয়েছে ফিশন [Fission] রিয়েকশন ও দ্বিতীয় ছবিতে অঙ্কিত হয়েছে ফিউশন [Fusion] রিয়েকশনের মৌলিক ক্রিয়া। ফিশন অর্থ কোনো ভারী আনবিক কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াই-কে বিভক্ত করা। আর ফিউশন হলো দু'টি পাতলা কেন্দ্রকে একত্রিত করা। মোট কথা একটি রিয়েকশন অপরটির বিপরীত ক্রিয়া। প্রথমটি দ্বারা ভারী কেন্দ্রকে ভাগ ও দ্বিতীয়টি দ্বারা পাতলা কেন্দ্রকে একত্রিত করে ভারী বানানো। উভয় প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিরাট মাত্রার এনার্জি বা উদ্যম নির্গত হয়। এর কারণ হলো, ফলস্বরূপ যা সৃষ্টি হয় তার মধ্যস্থ বাইন্ডিং [বা একটা আরেকটার মধ্যস্থ আকর্ষণ] শক্তি রিয়েকটেন্ট বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী শক্তি থেকে বেশী। আমরা প্রথম ছবিতে ফিশন রিয়েকশনের ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আনবিক কেন্দ্রে একটি উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন নিউট্রনকে আঘাত
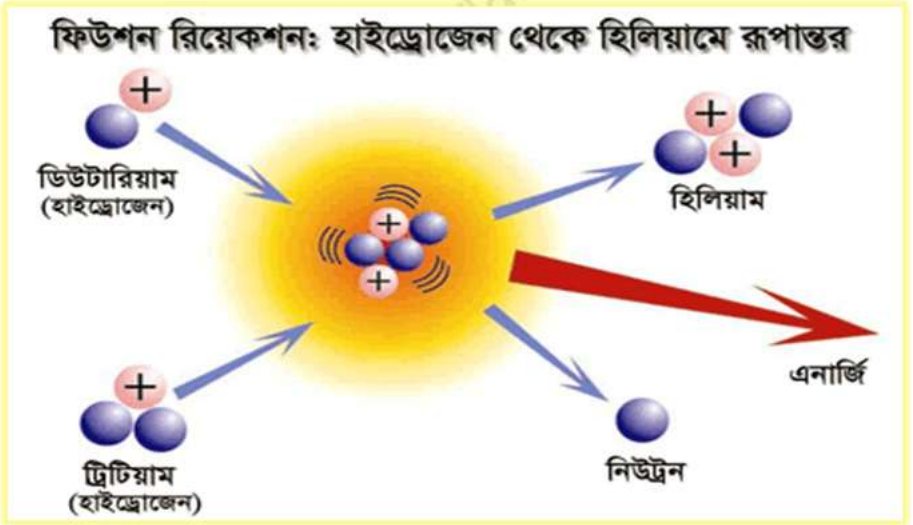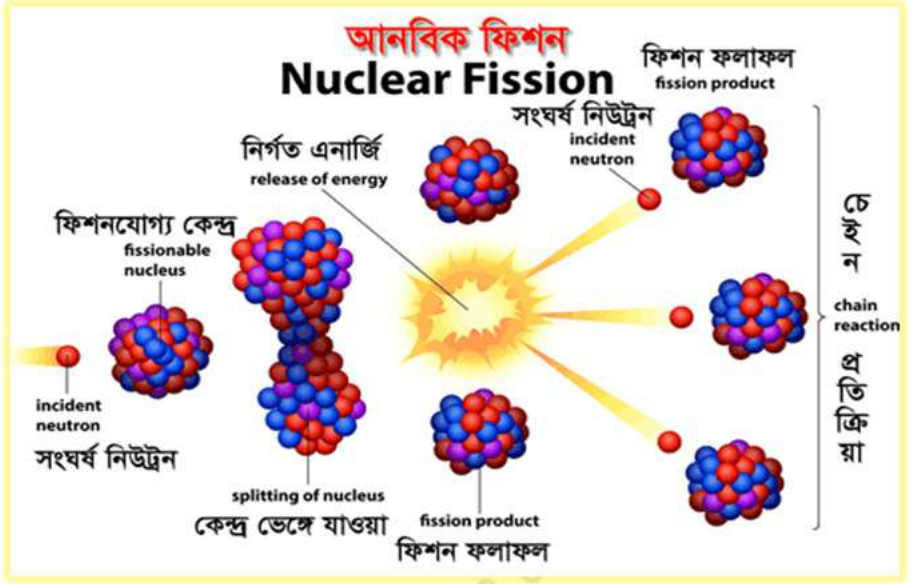
হানতে দেখছি। এর ফলে কেন্দ্র বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সময় বিরাট অঙ্কের এনার্জি বেরিয়ে আসছে। এই রিয়েকশনকেই পৃথিবীর প্রত্যন্ত দেশে স্থাপিত আনবিক চুল্লীতে

ব্যবহার করা হয়। এই রিয়েকশনকে বিভিন্ন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তবে অনিয়ন্ত্রিত থাকলে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে- যেমনটি আমরা আনবিক বোমা তথা এটম বোমা বিস্ফোরণের সময় লক্ষ্য করে থাকি।

ফিউশন রিয়েকশনকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটা কঠিন। আসলে পৃথিবীর উপর এই রিয়েকশন সৃষ্টিই অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। নিয়ন্ত্রণ সমস্যার ফলেই এটা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আমাদের সূর্যসহ তারাদের কেন্দ্রে এই রিয়েকশনই প্রতিনিয়ত ঘটছে। দ্বিতীয় ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেনের এক জোড়া নিউট্রন ও প্রটন একত্রিত হচ্ছে। উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার ফলে এটা সম্ভব হয়। একত্রিত হওয়ার সময় বা ফিউশন মুহূর্তে একটি নিউট্রন এবং একীভুত অবস্থায় দু'টি প্রটন ও একটি নিউট্রন রিলিজ হয়ে আসে- সেসাথে বেশ বড়ো অঙ্কের এনার্জি নির্গত হয়। এই এনার্জি থেকেই তাপ ও আলোসহ বিভিন্ন বিকিরণ তারারা চতুর্দিকের মহাকাশে ছড়িয়ে দেয়।

বস্তু সাধারণত তিনটি অবস্থার যে কোনো একটি ধারণ করে অস্তিত্বশীল থাকে। এই তিনটি মৌলিক অবস্থা হলো: কঠিন, তরল ও বাষ্প। তবে খুব বেশী উচ্চ-তাপসম্পন্ন বস্তু চতুর্থ আরেকটি অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। এই অবস্থাকে বলে প্লাজমা। আমাদের সূর্যের কেন্দ্র মূলত প্লাজমা বস্তুর তৈরী। সেখানকার তাপমাত্রা ১৬ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টি [২৯ মিলিয়ন ডিগ্রী ফা]। এই প্লাজমা অবস্থায় বস্তু অনেকটা গ্যাসের মতো হলেও এটম বা পরমাণু তার ইলেকট্রনকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়- ফলে এটম আয়োন বা চার্জ অবস্থায় বিরাজ করে। সুতরাং উচ্চ তাপমাত্রা, চাপ ও ঘনাঙ্ক হেতু তারাদের কেন্দ্রে আনবিক নিউক্লিয়াই বা কেন্দ্রসমূহ একে অন্যের উপর প্রচণ্ড গতিতে পতিত হতে থাকে। এর ফলে সৃষ্টি হয় তাপ নিয়ন্ত্রিত থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়েকশন তথা ফিউশন। আমাদের সূর্যসহ অসংখ্য তারা মূলত হাইড্রোজেন গ্যাসের দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং ফিউশন রিয়েকশনে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সূর্য জ্বালানি হিসাবে ৪ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন প্রতি সেকেন্ডে ধ্বংস করে প্রডাক্ট হিসাবে এনার্জি ও হিলিয়াম উৎপাদন করে যাচ্ছে। তবে সকল তারা হাইড্রোজেন দ্বারা এনার্জি সৃষ্টি করে না।

কার্বন চক্র

হাইড্রোজেন ফিউশন থেকে ভিন্ন অথচ আরো জটিল একটি আনবিক প্রতিক্রিয়া কোনো কোন তারার কেন্দ্রে ঘটছে। এই রিয়েকশনের ফলাফল প্রায় একই হলেও এতে জড়িত আছে মৌলিক পদার্থ কার্বনের এটম। এটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় কার্বন সাইকেল বা কার্বন চক্র বলে। এটার শুরু কার্বন-১২ ও হাইড্রোজেন দ্বারা এবং শেষ কার্বন-১২ এবং হিলিয়ামে রূপান্তর। এখানে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তর-কালে কার্বন-১২ একটি অনুঘটক [ক্যাটালিস্ট] হিসাবে কাজ করে। তবে কার্বন চক্র আরম্ভ হওয়ার শর্ত হলো ২০ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টি [৪০ মিলিয়ন ডিগ্রী ফা] বা এরচেয়ে বেশী তাপমাত্রা হওয়া। এ কারণে এই প্রতিক্রিয়া একমাত্র ভারী তারাদের কেন্দ্রে শুরু হতে পারে। কার্বন চক্রে পদার্থ কার্বন-১২ হাইড্রোজেন কেন্দ্রগুলোকে হিলিয়ামের কেন্দ্রে পরিণত করতে গতিশীল করে। ফলে এসব তারা তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যেই জ্বলে শেষ হয়ে যায়, সেসাথে এদের কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে অতিরিক্ত এনার্জি।

হিলিয়াম জ্বালানি

যদি কোনো তারার কেন্দ্রে তাপমাত্রা ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টি [২০০ মিলিয়ন ডিগ্রী ফা] কিংবা এরচেয়ে বেশী হয়ে পড়ে তাহলে ইনার্ট বা প্রতিক্রিয়াহীন হিলিয়াম গ্যাসও কিছু আনবিক রিয়েকশনে যোগ দেয়। দু'টি হিলিয়াম কেন্দ্রের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এনার্জি নির্গত হওয়া ও বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াই ঘটিত হতে পারে। তবে বেরিলিয়াম কেন্দ্র মূলত অস্থিতিশীল। কিন্তু সময় সময় অপর আরেকটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এসে স্থিতিশীল থাকাকালে বেরিলিয়াম কেন্দ্রকে আঘাত হানে। এই আঘাতের ফলে একটি প্রতিক্রিয়া হয়- ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয় কার্বন নিউক্লিয়াই। সুতরাং তারাদের কেন্দ্রে এভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদার্থ সৃষ্ট হয়ে থাকে। ঈষৎ নীল ও সাদা রংয়ের কিছু সুপার-জায়ান্ট বিরাট বিরাট তারার কেন্দ্রে এই হিলিয়াম রিয়েকশন ঘটছে। তবে যেসব তারার ম্যাস বা ভর যথেষ্ট নয় ওগুলোর কেন্দ্রে কোনো সময়ই হিলিয়াম প্রতিক্রিয়া হয় না। তবে কোনো কোন তারার কেন্দ্রের তাপমাত্রা আরো বেশী হতে পারে। সেক্ষেত্রে কার্বন ও হিলিয়াম একত্রিত হয়ে অক্সিজেন সৃষ্টি হতে পারে। এই ফিউশন ক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহত

থাকতেও পারে- এতে সৃষ্টি হতে পারে লৌহ পর্যন্ত উচ্চ এটমিক সংখ্যাসম্পন্ন পদার্থ।

একাধিক তারা সিস্টেম

তারারা আসলে কোনো ক্ষেত্রেই একা একা বাস করে না। কোনো না কোনভাবে একাধিক সহোদরা নিয়েই তারাদের বাঁচা। আমাদের সূর্যও একা নয়। সে তার পরিবারের সকলকে নিয়ে একটি বিরাট তারা সিস্টেমের সদস্য হিসাবে বেঁচে আছে। আমরা ইতোমধ্যে এই বিরাট তারা সিস্টেম সম্পর্কে বলেছি- এই সিস্টেমের নাম ছায়াপথ বা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। বাস্তবে জগতের সকল তারাই গ্যালাক্সি কিংবা উপ-গ্যালাক্সির সদস্য। তবে এখানেই শেষ নয়- তারারা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় উপদলের সদস্যও হয়ে থাকে। আসলে তিনটি গ্রুপের যে কোনো একটির সদস্য তারারা অবশ্যই হয়ে থাকে। এই তিন দল হলো: ১. খোলা ক্লাস্টার, ২ গ্লোবুলার ক্লাস্টার এবং ৩. গ্যালাক্সি। সুতরাং এবার আমরা তারাদের এসব গ্রুপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো।

খোলা তারা ক্লাস্টার: এরূপ ক্লাস্টারকে গ্যালাক্টিক ক্লাস্টারও বলে। এদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলো সদস্যদের অনেকেই তুলনামূলকভাবে অল্প বয়স্ক ও একে অন্যের মধ্যে বেশ দূরত্ব বিদ্যমান। জগতে এদের সংখ্যা কম না- এ পর্যন্ত আমাদের গ্যালাক্সিতেই ১,০০০ গ্যালাক্টিক ক্লাস্টার তালিকাভুক্ত হয়েছে। তবে কোনো কোন খোলা ক্লাস্টার সত্যিই খোলা ও অত্যল্প সদস্যসংখ্যা-সম্বলিত। এদের মধ্যে মোট তারার সংখ্যা কয়েক শয়ের বেশী হবে না। উপরের চিত্রে আমরা 'প্লায়েডিস' নামক অপেন ক্লাস্টারটি দেখতে পাচ্ছি।

প্লায়েডিস খোলা তারা ক্লাস্টার

প্লায়েডিস আমাদের থেকে ৩৮০ হতে ৪১৫ আলোক-বছর দূরে অবস্থিত। টোরাস নামক কন্সটেলেশনে এই ক্লাস্টারের নিবাস। এই ক্লাস্টারের সদস্যসংখ্যা প্রায় ৫০০ অল্প-বয়সী তারা। তারাদের মধ্যে গড় দূরত্ব ১ আলোক-বছর। এই তারা ক্লাস্টারকে আমাদের দেশে ‘সাত বোন’ বলা হয়। তবে খালি চোখে ৭টি মাত্র নয় ১২টি পর্যন্ত তারা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য শক্তিশালী দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা প্লায়েডিসের দিকে তাকালে শত শত তারা আত্মপ্রকাশ করে।

গ্লোবুলার তারা ক্লাস্টার: এসব ক্লাস্টারে তারারা একে অন্য থেকে অতি কাছে অবস্থান করে। এছাড়া গোলকের মতো মহাশূন্য দখল করে থাকে। সাধারণত এসব ক্লাস্টারের সদস্যসংখ্যা হাজার হাজার থেকে কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

গ্লোবুলার তারা ক্লাস্টার

ডানের ছবিতে আমরা একটি গ্লোবুলার তারা ক্লাস্টার দেখতে পাচ্ছি। এসব ক্লাস্টারের আরোও বৈশিষ্ট্য হলো অধিকাংশ সদস্য-তারা অনেক বয়স্ক। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলেন, এরূপ তারা ক্লাস্টার আমাদের গ্যালাক্সির সর্বাপেক্ষা আগের সৃষ্ট স্ট্রাকচার। আর মিল্কিওয়েতে এ পর্যন্ত ২ শতাধিক গ্লোবুলার তারা ক্লাস্টারের সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় অধিকাংশ অন্যান্য গ্যালাক্সিতেও এরূপ তারা ক্লাস্টার আছে। এগুলো গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। ১৯১৮ সালে গ্লোবুলার ক্লাস্টারের কক্ষপথ নির্ণয় করে আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রের অবস্থান বের করেন আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী হারলো শাপলি (১৮৮৫-১৯৭২)।

গ্যালাক্সি: গ্যালাক্সি মূলত তারাজগৎ। প্রত্যেক তারাই এককেটি তারাজগতের সদস্য। আমরা একটি আলাদা পরিচ্ছেদে গ্যালাক্সির উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, কোটি কোটি গ্যালাক্সির সমন্বয়ে

পুরো মহাবিশ্ব গঠিত- এবং এসব গ্যালাক্সির মূল সদস্যরা হলো তারা ও তারা ক্লাস্টার। পাশে আমরা একটি গ্যালাক্সি গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি।

তারাদের জীবনচক্র

সবকিছুর যেমন জন্ম আছে তেমনি মৃত্যুও আছে। প্রাণীজগতের বেলায় এ কথাটি আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এমনিতেই জানা হয়ে যায়। তবে ব্যাপারটি শুধুমাত্র প্রাণীজগতের ক্ষেত্রেই সত্য নয়- বস্তুজগতেও অনুরূপ জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপার আছে। তবে সে ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা তা অনেক সময় ধরা যায় না। এর মূল কারণ হলো আমাদের ইহলোকে জীবিত থাকার সময়ের স্বল্পতা। জগত সৃষ্টি ও বস্তুর জন্ম-মৃত্যু শত নয়, হাজার নয়- বরং কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধানে সংঘটিত হয়। তবে সংঘটিত হয়-ই যে, এ ব্যাপারে অজ আর কেউ দ্বিমত পোষণ করছেন না। আমরা ইতোমধ্যে আলোচিত কজমোলজির উপর তথ্যানুসন্ধান-কালে দেখেছি আধুনিক বিগ ব্যাং থিওরি কিভাবে জগতের শুরু ও শেষকে নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে- অর্থাৎ পুরো জগতের জন্ম হয়েছিল সুদূর অতীতে
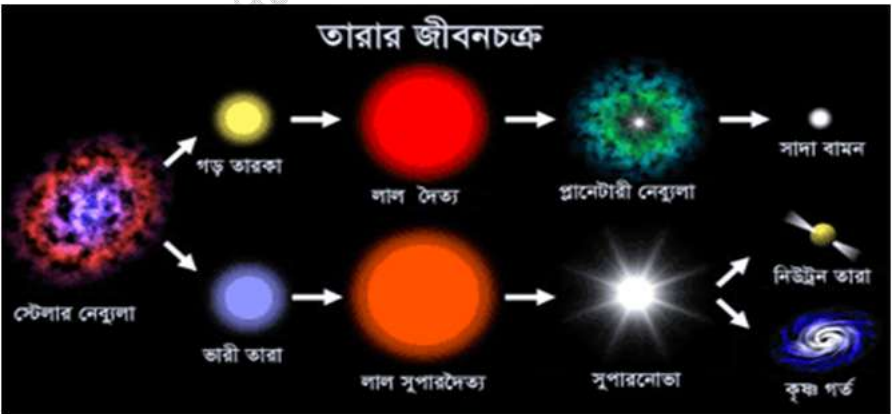
এবং মৃত্যুও হবে সুদূর ভবিষ্যতে, এটাই আধুনিক বিশ্বতত্ত্বের মূল কথা। তবে আমাদেরসহ সকল প্রাণীজগতের মতো মহামরণ তথা মহাপ্রলয়ের পূর্বেই অনেক বস্তুর জন্ম ও মৃত্যু ঘটে থাকে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো তারা।

তারারা আন্তঃতারা মহাকাশে জড়ো হওয়া ধুলোবস্তু থেকে জন্মলাভ করে এবং নির্দিষ্ট কাল জ্বলন্ত থেকে একদা নিভে যায়- অর্থাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর ঠিক প্রাণীদের মরদেহের মতো দেহের সকল বস্তু অন্য বস্তুর সাথে মিশে যায়- না হয় নির্জীব অবস্থায় বিগ ক্রাঞ্চের [তথা মহাপ্রলয়ের] অপেক্ষায় মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়।

আমাদের জগতটি এতো বড়ো ও এর মধ্যস্থ বস্তুর মাত্রা এতো বেশী যে তারাদের জন্ম ও মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আধুনিক টেলিস্কোপের মাধ্যমে ধারণ করা সম্ভব। নীচে আমরা ঠিক এরূপ তিনটি ছবি দেখতে পাচ্ছি- যেখানে তারার জন্ম-মৃত্যুর দৃশ্য ভেসে ওঠেছে। একটি তারা তার জীবন শুরু করে তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা গ্যাসখণ্ড হিসাবে। যে এলাকায় জীবনের শুরু একে বলে নেব্যুলা [বায়ের ছবি]। এরপর মহাকর্ষ ঐ গ্যাস-খণ্ডকে ভেতরের দিকে টেনে গাঢ় করতে থাকে- একই সময় গ্যাস-খণ্ডের ভর বা ম্যাস ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে এক পর্যায়ে এমন উর্ধ্বে যেয়ে পৌঁছে যে ঐ গ্যাস-খণ্ডের কেন্দ্রে আনবিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং উজ্জ্বল হয়ে একটি তারার জন্ম হলো। একটি মেইন সিকুয়েন্সের তারা [মাঝখানের চিত্র] জ্বলন্ত থাকে শত শত কোটি বছর এই কারণে যে, এর কেন্দ্রে হাইড্রোজেন জ্বালানি হিসাবে আনবিক ফিউশন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জড়িত হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। এতে রিলিজ হয়ে বেরিয়ে আসে বিরাট মাত্রার এনার্জি- আলো ও তাপসহ বিভিন্ন ইলেকট্রমেগনেটিক বিকিরণ হিসাবে। মূল সিকুয়েন্সের একটি মধ্যম ওজনের বা ম্যাসের তারা দীর্ঘ ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলন্ত থাকে বলে ধারণা করা হয়। আমাদের সূর্য অনুরূপ একটি তারা যার বয়স মাঝামাঝি পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারারা অবশ্য চিরকাল জ্বলন্ত থাকতে পারে না। একদিন তাদের মূল এনার্জি সূত্র 'হাইড্রোজেন গ্যাস' শেষ হয়ে যায়। ফলে তাদের মৃত্যু ঘটে।

দু'টি উপায়ে তারারা মৃত্যুকে বরণ করে- একটি খুব নীরবে আর অপরটি সত্যিই জমকালোপূর্ণ-ভাবে; একেবারে পুরো গ্যালাক্সিকে আলোকিত করে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। প্রথম পদ্ধতিকে বলে, সাদা বামনে রূপান্তর আর দ্বিতীয়টির নাম সুপারনোভা বিস্ফোরণ। একটি নির্দিষ্ট তারার শেষ পরিণতি কি হবে, তা অবশ্য নির্ভর করে তার ভর বা ম্যাসের উপর। নিচের ছবিতে আমাদের গ্যালাক্সির উপগ্রহ গ্যালাক্সি বড় মেজেলানিক ক্লাউডে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ দেখা যাচ্ছে।

তারা সৃষ্টির ক্ষেত্র: পরের পৃষ্ঠার ছবিতে আমরা 'তারা-সৃষ্টির নার্সারি' দেখতে পাচ্ছি। পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই নামকরণের কারণ কি হতে পারে। এরূপ নার্সারির ক্লাউড বা মেঘ এতোই ঘন যে, তারা দ্বারা সৃষ্ট আলোকরশ্মি পর্যন্ত এই ক্লাউড আটকে রেখে দেয়। সুতরাং নতুন তারা আবিষ্কারে দৃশ্যমান আলো অনেক সময় অকার্যকর- তাই মহাকাশ বিজ্ঞানীরা 'ইনফ্রারেড' [বা লাল-তরঙ্গের] টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন।

তারার বিবর্তনক্রিয়া: ১৭৮ পৃষ্ঠার ছবিতে আমরা তারাদের বিবর্তনক্রিয়া অঙ্কিত করে দেখিয়েছি। তারারা তাদের জীবন শুরু করে গ্যাস ও মেঘখণ্ড হিসাবে। এরপর মহাকর্ষের কবলে পড়ে এই গ্যাস জড়ো হয়ে তারার জন্ম দেয়। কোনো ধরনের তারার জন্ম হবে তা নির্ভর করে কতটুকু বস্তু নিয়ে তাদের জীবনযাত্রার শুরু। বেশী বস্তুসম্বলিত তারারা শেষ পর্যন্ত নিউট্রন তারা কিংবা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হতে পারে। ছবিতে আমরা বেশ ক'টি বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী ব্যবহার করেছি যেগুলো তারাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এবার এসব শব্দের ব্যাখ্যা একে একে প্রদান করছি।

নেব্যুলা [**Nebula**]: এ সম্পর্কে ইতোমধ্যে বলেছি। যেখানে আন্তঃতারা গ্যাসের ক্লাউড জমা থাকে তাকে নেব্যুলা বলে। নেব্যুলা থেকেই তারাদের জীবনের শুরু। মহাকর্ষের টানে বস্তু জড়ো হয়ে তারার জন্ম দেয়। বিখ্যাত ওরাইওন নেব্যুলার

একটি ছবি (উপরে) এখানে দেওয়া হলো।

প্রটোস্টার [**Protostar**]: পূর্ণ তারায় রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত যে অবস্থা ধারণের মাধ্যমে অস্তিত্ব রক্ষা করে সে অবস্থাকে বলে প্রটোস্টার (পরের পৃষ্ঠার প্রথম ছবি)। প্রটোস্টারের চতুর্দিকে গ্যাস ও ধুলোবস্তু ঘুরতে থাকে এবং ক্রমে তারার সাথে মিলিত হয়ে তারাটির ভর বাড়িয়ে তুলে। এতে তারার অভ্যন্তরে তাপমাত্রা ও চাপ বৃদ্ধি পেয়ে তারাটি পরবর্তী দীর্ঘজীবন স্টেজে পদার্পণ করে।

স্টার [Star]: বিলিয়ন বিলিয়ন বছর জ্বলন্ত থাকার মূলে যে জিনিসটি সক্রিয় থাকে তাহলো তারার অভ্যন্তরে ফিউশন নামক আনবিক ক্রিয়া। উচ্চ তাপ ও চাপের ফরে হাইড্রোজেন এটম একটা আরেকটার নিকটবর্তী হয়ে 'ফিউজ' হয়ে যায় ফলে এটি আর হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই থাকে না, রূপান্তরিত হয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াইয়ে। এই প্রসেসের ফলাফল বা নির্যাস হলো বিরাট মাত্রার এনার্জি- আলো, তাপ ও অন্যান্য বিকিরণ হিসাবে তারার কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত চতুর্দিকের মহাকাশে রিলিজ করা। একটি তারা কি পরিমাণ গ্যাস বস্তু নিয়ে জন্ম নিয়েছিল তার উপর নির্ভর করে শেষ জীবনে সে কোন্ পথে পাড়ি জমাবে। বায়ের ছবি দেখুন।

রেড জায়ান্ট ও সুপারজায়ান্ট [Red Giant / Supergiant]: তারার কেন্দ্রের হাইড্রোজেন শেষ হওয়ার পর আনবিক ফিউশন ক্রিয়া অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে ভেতর থেকে বাইরের দিকের চাপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তারাটি তার নিজের ভরের ফলে

ভেতরের দিকে কলাপ্স হতে থাকে। এবার তাপ ও চাপের ফলে পুনরায় ফিউশন প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়- তবে এখন আর তার কেন্দ্রে নয় বরং বাইরের দিকে পরবর্তী স্তরে তা ক্রিয়াশীল হয়। এর ফলে দু'দিকে তারাটি স্ফীত হওয়া শুরু করে। একদিকে কেন্দ্রের মধ্যে হাইড্রোজেন ফিউশন অনুপস্থিত থাকায় তারার কেন্দ্র ছোট্ট হয় এবং অপরদিকে দ্বিতীয় স্তরে ফিউশন প্রতিক্রিয়ার ফলে সেখান থেকে বাইরের দিকে বড়ো হয়ে ফুলে উঠে।

বাইরের স্তর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং লাল বর্ণ ধারণ করে রেড জায়ান্টে রূপান্তরিত হয়।

তবে লাল জায়ান্টের ভর বা ম্যাস যদি একটি বিশেষ মাত্রা পার হয়ে যায় তাহলে তারাটি এই অবস্থায় থাকবে না। তার কৌর [কেন্দ্র] আরো ছোট্ট হতে থাকবে এবং তাপমাত্রা ১০০ মিলিয়ন ডিগ্রী অতিক্রম করবে। এই বিরাট মাত্রার তাপ হিলিয়ামকে ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বনে রূপান্তর করার জন্য যথেষ্ট। হিলিয়াম ফিউশনের ফলে যে রেডিয়েশন রিলিজ হয় তার ফল স্বরূপ পুরো তারা সূর্য থেকে অন্তত ৫০০ গুণ স্ফীত হয়ে ওঠে। এই বিরাট তারাটি তখন রেড সুপারজায়ান্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারাদের এই পরিণতি কিন্তু ফাইনেল নয়। সাধারণত যেসব তারার ভর সূর্যের তুলনায় ৬ থেকে ১০ গুণ সেসব তারাই রেড সুপারজায়ান্ট স্টেজে এসে উপনিত হবে। কন্সস্টেলেশন স্কোরপিওতে একটি তারা আছে যার নাম আনটেরিস। এটি একটি সুপারজায়ান্ট। পৃথিবী থেকে ৪০০ আলোকবছর দূরত্বে এর অবস্থান। এটা সূর্যের তুলনায় ৩০০ গুণ বড়ো। সূর্যের স্থানে এটাকে এনে রাখলে মঙ্গলসহ সৌরজগতের প্রথম চারটি গ্রহই এর ভেতরে অবস্থান করবে। অপর আরেক সুপারজায়ান্ট হলো বিটালজিউস নামক তারাটি। এটিও আমাদের সৌরজগৎ থেকে ৩০০ আলোক বছর দূরে অবস্থান করে। এর ব্যাস ৫৮০ মিলিয়ন কিমি [৩৬০ মিলিয়ন মাইল]। সূর্য থেকে এটিও ৩০০ শতেরও বেশী গুণ বড়ো।

প্লানেটারী নেব্যুলা [Planetary Nebula]: লাইরা নামক কন্সটেলেশনে 'রিং নেব্যুলা' নামক একটি নেব্যুলা আছে। এটি একটি প্লানেটারী নেব্যুলা। নেব্যুলাটি আমাদের থেকে ৪,১০০ আলোক বছর দূরে অবস্থিত। ১১১ পৃষ্ঠায় এর একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। রেড জায়ান্ট তারার বিবর্তনের পরবর্তী স্তর হলো প্লানেটারী নেব্যুলা। সূর্য থেকে যখন কোনো তারা ৬ থেকে ৮ গুণ ভরসস্বলিত হবে তখন এটা রেড জায়ান্ট স্টেজ পেরিয়ে প্লানেটারী নেব্যুলায় উপনিত হয়। এর মূল কারণ হলো তারাটি জ্বালানিশূন্য হয়ে পড়া। অস্থিতিশীল এই তারা থেকে বাইরের বস্তু দূরে সরে পড়ে। এই গ্যাস-ধুলোবস্তু গ্রহের মতো তারার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে- এ কারণেই তারার এই স্টেজকে প্লানেটারী তথা গ্রহ নেব্যুলা বলে।

সুপারনোভা [Supernova]: সূর্য থেকে ৮ কিংবা ততোধিক ভরসম্পন্ন তারা সুপার জায়ান্ট স্টেজ পেরিয়ে সুপারনোভার সূত্রপাত ঘটায়। এ সময় তারাটি তার জ্বালানি শেষ করে নিজের ওজনের কারণে কলাপ্স হতে থাকে। এই কলাপ্স হওয়ার ফলে তারাটি স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে এবং এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে তার অধিকাংশ বস্তু মহাকাশে ছুড়ে ফেলে। তবে কোনো কোন ক্ষেত্রে পুরো তারাটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

রিং সুপারনোভা [Ring Supernova]: ১৯৯৪ সালে মহাকাশে স্থাপিত হাবল টেলিস্কোপ এই সুপারনোভার ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় [বায়ের ছবি]। সুপারনোভাটির আলো সর্বপ্রথম পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছে ১৯৮৭ সালে। এ কারণে এর নামকরণ করা হয়েছিল ১৯৮৭এ। এই সুপারনোভা বিস্ফোরণ আমাদের গ্যালাক্সির দু'টি স্যাটেলাইট 'মেজেলানিক ক্লাউডের' বড়োটিতে ঘটে। এই ক্লাউডের দূরত্ব দেড় লক্ষ আলোক-বছর। সুতরাং বিস্ফোরণটি অন্তত দেড় লক্ষ বছর পূর্বে ঘটেছিল। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন নি, কোন্ কারণে তারার চতুর্দিকে দু'টি রিং দেখাচ্ছে।

নিউট্রন স্টার [Neutron Star]: সুপারনোভা শেষে তারার ছোট্ট কৌর বা কেন্দ্র যদি থেকে যায় তাহলে এটি হয় নিউট্রন স্টার না হয় ব্ল্যাক হোলে পরিণত

হবে। নিউট্রন তারার নাম থেকে এর অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। প্রত্যেক এটমের কেন্দ্রে আছে নিউট্রন ও প্রটন। এগুলো প্রচণ্ড প্রেসারের কারণে ফিউজ বা একত্রিত হয়ে যায়- ফলে পুরো এটমই একটি নিউট্রনে রূপান্তর হয়। সুতরাং নিউট্রন তারার এটমগুলো নিউট্রনের তৈরী- মূলত এই তারায় আর পুরো এটমের অস্তিত্ব নেই- আছে শুধু নিউট্রন।

ব্ল্যাক হোল [Black Hole]: সুপারনোভার দ্বিতীয় পরিণতি সত্যিই আরো চিত্তাকর্ষক। এই অবস্থার নাম 'ব্ল্যাক হোল' বা কৃষ্ণ গর্ত। পূর্বে উল্লেখিত নিউট্রন তারায় রূপান্তরের পর কলাপ্স হওয়ার ক্রিয়া বন্ধ না-ও হতে পারে। এটা নির্ভর করবে তারার ভরের উপর। খুব বেশী ভরসম্পন্ন তারা নিউট্রন স্টেজে এসেও স্থিতিশীল হবে না। সে তার মহাকর্ষের টানে আরো কলাপ্স হতে থাকবে। অর্থাৎ নিউট্রনও কলাপ্স হবে। ফলে শেষ পরিণতি হবে ব্ল্যাক হোল। ব্ল্যাক হোল এমন এক বস্তু যার মহাকর্ষ এতোই শক্তিশালী যে, এর উপর থেকে আলোকরশ্মি পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। মহাকর্ষ আলোক রশ্মিকেও আটকে ফেলে। এ কারণেই এটির নামকরণ করা হয়েছে কৃষ্ণ গর্ত। এটাকে 'দেখার' কোনো উপায় নেই। অনেকের ধারণা ব্ল্যাক হোলের ভলিউম আমাদের পৃথিবীর কোনো একটি শহরের চেয়ে খুব একটা বেশী হবে না।

হুয়াইট / ব্ল্যাক ডোর্ফ [White / Black Dwarf]: বাংলায় বলা যায় সাদা বামন ও কালো বামন। রেড জায়ান্ট থেকে প্লানেটারী নেব্যুলায় পরিণত হওয়ার পর একটি তারা সাদা বামন ও পরে কালো বামনে রূপান্তর হতে পারে। লাল জায়ান্ট তার জ্বালানি শেষ করে কলাপ্স হয়ে সাদা বামন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিরাট ভরসম্পন্ন তারা তখনও উজ্জ্বল থাকে। এর কারণ হলো কেন্দ্রে বিরাট মাত্রার এনার্জি বন্দী হয়ে পড়ে। একটি হুয়াইট ডোর্ফ তারা পৃথিবীর সমপরিমাণ ব্যাস-সম্পন্ন হয়েও ভর বা ম্যাসের দিক থেকে সূর্যের ৭০ শতাংশ পরিমাণও হতে পারে।

লাল জায়ান্ট তারার শেষ পরিণতি একটি অনুজ্জ্বল ছোট্ট আয়তনের ভরপূর্ণ বস্তু। সাদা বামন অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকা সম্ভব হয় না। একদিন কেন্দ্রে বন্দী এনার্জি বেরিয়ে আসে। ফলে বামন তারা ঔজ্জ্বল্যতা হারিয়ে ঠাণ্ডা বস্তুতে রূপান্তর হয়। এই ঠাণ্ডা বস্তুকেই বলে কালো বামন।

অদ্ভুত তারা

উপরে বর্ণিত তারাগুলোকে বলে [হার্টসস্প্রাং - রাসেল চিত্র] মূল সিকুয়েন্সের তারা। তবে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে এমন কিছু তারা আবিষ্কার করেছেন যাদের বৈশিষ্ট্য সত্যিই অদ্ভুত। এসব তারাদের মধ্যে একটিকে বলে 'পালসেটিং ভেরিয়েবুল্স'।

পালসার হচ্ছে দ্রুত ঘূর্ণনরত নিউট্রন তারা
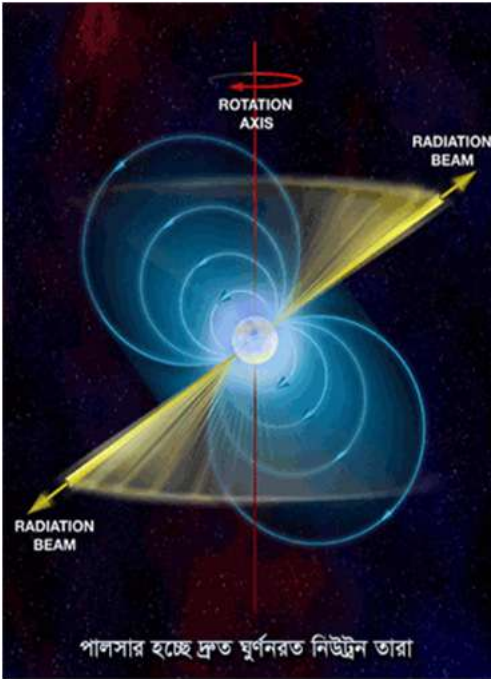
পালসেটিং ভেরিয়েবুল্স [Pulsating Variables]: এমন কিছু তারা আছে যাদের ঔজ্জ্বল্যতা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানীরা এরূপ 'স্পন্দনসম্পন্ন' তারার অস্তিত্বের কারণ সম্পর্কে বলেছেন, এসব তারার বাইর-বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত আয়তনের দিক থেকে বেশ-কম হয়ে থাকে। ঔজ্জ্বল্যতা ছাড়াও এসব তারার তাপমাত্রাসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দু' ধরনের পালসেটিং তারা আবিষ্কার করেছেন। এর একটি হলো সিফিড ভেরিয়েবুল্স আর অপরটি আর.আর. লিরি তারা।

সিফিড ভেরিয়েবুল্স [**Cepheid Variables**]: এদের বৈশিষ্ট্য হলো ঔজ্জ্বল্যতার মধ্যে বাড়তি ও কমতি নির্দিষ্ট সময়ে হওয়া। মহাকাশে ডেলটা সাফেই নামক একটি পালসেইটিং তারা আছে- এই তারার নামানুসারে অনুরূপ সকল তারাকে বলে সিফিড ভেরিয়েবুল্স। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে এ পর্যন্ত ৭ শতাধিক সিফিড তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। আর লকেল গ্রুপ নামক ৩০টির মতো গ্যালাক্সিতে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ কয়েক হাজার সিফিড তারা পর্যবেক্ষণ করে তালিকাভুক্ত করেছেন। সিফিড তারাদের আরো কিছু একক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, এদের ঔজ্জ্বল্য বা ব্রাইটনেস সর্বদাই তার অসিলেশন পিরিওড [উজ্জ্বল থেকে অনুজ্জ্বলে যাওয়া ও আবার উজ্জ্বলে ফিরে আসতে যে সময় ব্যয় হয়] এর সঙ্গে আনুপাতিক। এই সম্পর্ক জানা থাকার ফলে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারাটির দূরত্ব অঙ্ক কষে বের করতে পারেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন গ্যালাক্সির দূরত্ব এবং জগতের অনেক দূরবর্তী বস্তুর দূরত্ব এই সিফিড তারাদের সম্পর্ক থেকে বের করা সম্ভব হয়েছে।

সাধারণত সিফিড তারাদের ভর সূর্যের তুলনায় ৫ থেকে ২০ গুণ বেশী হয়ে থাকে। এছাড়া সূর্যের তুলনায় এদের ঔজ্জ্বল্য অন্তত ১০ হাজার গুণ বেশী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোনো তারার মধ্যে যখন ভেতরের দিকে ধাবিত মহাকর্ষের শক্তি ও বাইরের দিকে ধাবিত আনবিক রিয়েকশন শক্তির মধ্যে ব্যালান্স নষ্ট হয়ে

যায় তখনই এটা সময়ের ব্যবধানে নিয়মিতভাবে আয়তনে বৃদ্ধি ও হ্রাস হওয়া শুরু করে। তবে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো এই হ্রাস-বৃদ্ধির পিরিওড ১ দিন থেকে ৫০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে যা একটি তারার ক্ষেত্রে সত্যিই খুব দ্রুত। হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারার আয়তন বা ব্যাসে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেশকম হয়ে থাকে। তবে দীর্ঘ জীবনের তুলনায় সিফিড ভেরিয়েবুল্স তারাদের এই পালসেইটিং অবস্থা খুব অল্পদিন স্থায়ী থাকে- ধারণা করা হয় তা মিলিয়ন বৎসরের বেশী নয়। সিফিড তারারা যখন তাদের অসিলেশন শুরু করে তখন তাপমাত্রা ও ঔজ্জ্বল্যতার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। তারার আয়তন বাড়ার সময় তার আলো আরো উজ্জ্বল হয়, একই সময় তাপমাত্রা ৭,৩০০ থেকে ৫,৭০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। বিজ্ঞানীরা সিফিড তারাদেরকে দু'টি মূল উপদলে বিভক্ত করেছেন। প্রথম দলকে বলে টাইপ-১ আর দ্বিতীয়টি টাইপ-২। প্রথম দলের তারাদের বয়স কম এবং এগুলো মিল্কিওয়েসহ বিভিন্ন গ্যালাক্সির আর্মসে [হাতে] বসবাস করে। দ্বিতীয় দলের তারাদের নিবাস গ্যালাক্সির কেন্দ্রের দিকে কিংবা গ্লোবুলার তারা ক্লাস্টারে। টাইপ-২ দলের সকল সদস্যই পুরাতন বয়স্ক তারা।

আর আর লিরি ভেরিয়েবুল্স [RR Lyrae Variables]: লাইরা নামক কন্সটেলেশনে একটি তারার নামানুসারে এই গ্রুপের ভেরিয়েবুল তারাদেরকে আর আর লিরি ভেরিয়েবুল্স বলে। এদের বৈশিষ্ট্য হলো পিরিওডের মধ্যে ক্ষিপ্ততা। এমন কিছু আর আর লিরি তারার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের পিরিওড মাত্র ৮৮ মিনিট! আর এই গ্রুপের তারাদের সর্বোচ্চ পিরিওড ২৪ ঘণ্টার বেশী নয়। আর আর লিরি পুরাতন বড়ো বড়ো তারা যাদের অবস্থান বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গ্লোবুলার ক্লাস্টারে পাওয়া যায়। এদের ঔজ্জ্বল্যতা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সমান- তাদের পিরিওডের মধ্যে পার্থক্য যেটাই হোক। এর ফলে এসব তারার মাধ্যমে দূরত্ব মাপা অনেকটা সহজ।

মিরা বা দীর্ঘ পিরিওডসম্পন্ন ভেরিয়েবুল্স [Mira Variables]: 'মিরা সেটি' নামক একটি তারার নামানুসারে মিরা ভেরিয়েবুল্স নামকরণ হয়েছে। এ গ্রুপের ভেরিয়েবুল্স অনেকটা ঠাণ্ডা কিন্তু বেশ ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ। এদের এবস্যুলুট ব্রাইটনেস সূর্যের তুলনায় ৩ হাজার গুণ বেশী। এদের ঔজ্জ্বল্য ১০ গুণ থেকে হাজার গুণ পর্যন্ত রদবদল হয়ে থাকে। এদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘ পিরিওড। মিরা ভেরিয়েবুলসের পিরিওড ১০০ থেকে ৫০০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

নোভা

আমরা ইতোমধ্যে 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণ সম্পর্কে বলেছি। তবে সাধারণ বিস্ফোরণও কোনো কোন তারাদের মধ্যে ঘটে থাকে। এই বিস্ফোরণকে নোভা বলে। বাইনারি বা জোড়া তারা সিস্টেমে এই বিস্ফোরণ ঘটে। তবে সর্বক্ষেত্রে নয়। যেসব জোড়ার একটি থাকে মেইন সিকুয়েন্সে ও অপরটি সাদা বামন তারা শুধুমাত্র ওসব সিস্টেমে নোভা বিস্ফোরণ হতে পারে। বিস্ফোরণের পরমুহূর্তে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে জোড়ার ঔজ্জ্বল্যতা বৃদ্ধি পেয়ে সূর্য থেকে অন্তত তিন লক্ষ গুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তবে একদিন পরই আবার অনেকটা অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে এবং কয়েক দিন কিংবা সপ্তাহের ভেতরই ধীরে ধীরে তেজহীন তারায় রূপান্তর হয়। নোভা ও সুপারনোভার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো বিস্ফোরণের তীব্রতায়। দ্বিতীয়টি দ্বারা তারার মধ্যে স্থায়ী রদবদল ঘটে- এমনকি তা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায় আর প্রথমটি তারার দেহ থেকে কিছু বস্তু মহাকাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে যায় মাত্র- তারার মৌলিক ক্রিয়া বন্ধ হয় না, এটি স্বস্থানে তারা হিসাবেই অবশিষ্ট থাকে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা জোড়া তারার একটি থেকে অপরটিতে মহাকর্ষের ফলে বস্তু স্থানান্তরিত হয়। ১০ থেকে ১ লক্ষ বছর এভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে নোভার মাধ্যমে তারাটি অতিরিক্ত বস্তু মহাকাশে ছুড়ে মারে। বাস্তবে যা ঘটে তাহলো, তারার বায়ুমণ্ডলে বিরাট থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের ফলে উভয় তারায় আবার ব্যালান্স ফিরে আসে এবং তারা আগের মতোই জ্বলতে থাকে। আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি মিল্কিওয়েতে বাৎসরিক ২৫ থেকে ৭৫টি নোভা বিস্ফোরণ হতে দেখা যায়। ১৯৯২ সালে এরূপ এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে সিগনাস নামক নক্ষত্রপুঞ্জে। উপরে এই বিস্ফোরণের একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। সিগনি নামক এই নোভা এতোই উজ্জ্বল ছিলো যে, পৃথিবী থেকে খালি চোখে তা দেখতে পাওয়া যায়।

ফ্লেয়ার বা ইউভি সেটি স্টার

নোভা ও সুপারনোভা বাদেও অপর আরেক ধরনের তারার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদেরকে ফ্লেয়ার বা ইউভি সেটি স্টার বলে সম্বোধন করা হয়। এসব মূলত মেইন সিকুয়েন্সের এম বা কে উপদলের সদস্যভুক্ত লাল বামন তারা। বিস্ফোরণের সময় কিছু পাতলা বস্তু মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তারার ঔজ্জ্বল্যতা শতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তবে বিস্ফোরণের স্থায়ীত্বকাল মাত্র ১০ থেকে ৬০ মিনিট হয়ে থাকে।

পাল্সার

কিছু নিউট্রন তারা আছে যাদের মধ্য থেকে খুব দ্রুত পিরিওডে রেডিও সিগনাল বেরিয়ে আসে। এসব তারার নাম পালসার। আমরা বাংলায় স্পন্দন তারা বলতে পারি। আমাদের গ্যালাক্সিতে এ পর্যন্ত ৫ শতাধিক পাল্সার আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সুপারনোভা বিস্ফোরণের পরে যখন নিউট্রন তারা ঘন থেকে ঘন হতে থাকে তখন এর ঘূর্ণন গতিও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে

সেকেন্ডে কয়েক শতবার গতিশীল হয়ে ওঠে। বস্তুর ঘনত্ব বাড়লে ভর বা ম্যাস বৃদ্ধি পায়, সে সাথে এর মহাকর্ষও। নিউট্রন তারার মহাকর্ষ এক পর্যায়ে পৃথিবীর তুলনায় এক ট্রিলিয়ন [অর্থাৎ হাজার মিলিয়ন] গুণ বেশী হয়ে ওঠে। এর ফলে এই শক্তিশালী মেগনেটিক ফিল্ড ও দ্রুত ঘূর্ণনের কারণে সৃষ্টি হয় খুব প্রভাবশীল রেডিও তরঙ্গ। এই তরঙ্গ চতুর্দিকের মহাকাশে তারার ঘূর্ণন গতির সাথে তাল মিলিয়ে ঘুরতে থাকে। এতে সৃষ্টি হয় রেডিও তরঙ্গের স্পন্দন বা পাল্স। এই পালসের রেট বা পিরিওড ১.৬ মিলিসেকেন্ড [এক মিলিয়ন সেকেন্ডের এক অংশকে বলে মিলিসেকেন্ড] থেকে ৪ সেকেন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে।
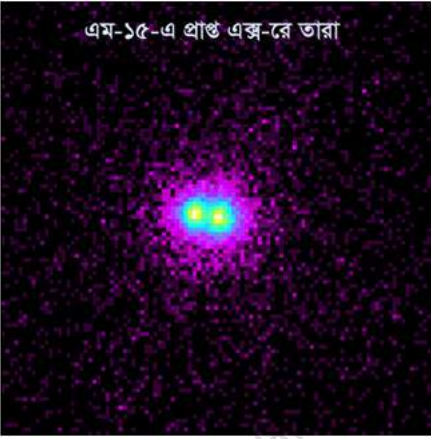
এক্স-রে স্টার

এদের নাম থেকেই সহজে বোধগম্য হয় এগুলো কোনো ধরনের তারা। জগতের অধিকাংশ তারা থেকে দৃশ্যমান বিভিন্ন তরঙ্গ নির্গত হয়। কিন্তু ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামের অদৃশ্য এরিয়ার এক্স-রে এলাকায়ও কিছু কিছু তারা তরঙ্গ প্রেরণ করে থাকে। এগুলোই হলো এক্স-রে স্টার। আমাদের গ্যালাক্সিতে এ পর্যন্ত শতাধিক এক্স-রে তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। পাশের ছবিতে কল্পিতভাবে ‘এক্স-রে বারস্টার’ তারার একটি দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখনও এসব তারা সম্পর্কে খুব বেশী জানেন নি। চিত্রে দেখাই যাচ্ছে এক জোড়া তারার মধ্যে প্রভাবশীল তারাটি দুর্বলটি থেকে কিছু বস্তু টেনে নিচ্ছে। ঘন শক্তিশালী তারার চতুর্দিকে এই বস্তু ঘুরে একটি ডিস্কের মতো আকার ধারণ করেছে। বস্তু টেনে নেওয়ার সময় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, এ থেকে সময় সময় শক্তিশালী এক্স-রে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে আসে।

মেগনেটার

এই গ্রন্থ লেখার সময় পর্যন্ত মহাকাশে আবিষ্কৃত সর্বশেষ অদ্ভুত তারার নাম হলো মেগনেটার। ২০০০ সালের দিকে এটির সন্ধান মিলে। আসলে এগুলো নিউট্রন

তারার একটি নতুন ক্লাস। এসব তারার বৈশিষ্ট্য হলো সাধারণ নিউট্রন তারা থেকে এদের মধ্যে মেগনেটিক ফিল্ডের একশত গুণ শক্তিশালী। পৃথিবীর মেগনেটিক ফিল্ডের বলের তুলনায় মেগনেটারের ফিল্ডের শক্তি এক হাজার ট্রিলিয়ন গুণ বেশী। বিজ্ঞানীরা বলেন এ পর্যন্ত এমন শক্তিশালী মেগনেটিক ফিল্ডের সন্ধান জগতের কোথাও আবিষ্কৃত হয় নি। সাধারণ নিউট্রন স্টার আর মেগনেটারের চরিত্র অনেকটা আলাদা- এবং এর মূল কারণ হলো মেগনেটিক ফিল্ডের প্রচণ্ড শক্তি। এই ফিল্ড তারার মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ঘূর্ণন গতিকে কমিয়ে দেয়। এছাড়া কেন্দ্রকে সময় সময় ফাটিয়ে ফেলে, ফলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে শক্তিশালী এক্স-রে ও গামা তরঙ্গ।

১৯৯৮ সালের ২৭ আগস্ট রাতে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে খুব শক্তিশালী এক্স-রে ও গামা-রে বিকিরণ সনাক্ত করেন। পরে তারা এটা নিশ্চিত করেছেন যে, এই বিকিরণের সূত্র ছিলো আমাদের গ্যালাক্সির স্যাটেলাইট লার্জ মেজেলানিক ক্লাউড। এই বিকিরণ তরঙ্গ ৫ মিনিট স্থায়ী ছিলো। বিকিরণের এনার্জির মাত্রা দিনের বেলা সূর্য থেকে বিকিরণ হওয়ার মাত্রার প্রায় সমান হওয়ায় এটাকেই সৌরজগতের বাইর থেকে আগত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রেডিয়েশন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত অধিকাংশ অদ্ভুত চরিত্রসম্পন্ন তারাদের উপর গবেষণা এখনও শেষ হয় নি। বলা যায় মাত্র শুরু হয়েছে। আগামীতে এগুলো সম্পর্কে আরোও অনেক ব্যাপার আমাদের জানা হবে তা নিশ্চিত। আর ওসব ব্যাপার হয়তো এমন অদ্ভুত হবে যার ফলে আমরা আরো অধিক আশ্চর্যান্বিত হবো।

ষষ্ঠ অধ্যায়
গ্যালাক্সি

বাংলায় ছায়াপথ বলে। তবে ছায়াপথ বলতে মূলত আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে বুঝায়। আমি এখানে ছায়াপথ না বলে গ্যালাক্সি শব্দটিই ব্যবহার করবো- এর কারণ হলো, এই শব্দের অর্থ ব্যাপক। জগতব্যাপী যতো তারাজগৎ আছে সবগুলোকেই গ্যালাক্সি বলে। আর পুরো বিশ্বজগৎ মূলত কোটি কোটি গ্যালাক্সি দ্বারা সৃষ্ট।

প্রতিটি গ্যালাক্সিই মূলত শত শত মিলিয়ন তারার সমন্বয়ে গঠিত একেকটি বিরাট জগৎ। সবগুলো তারা একে অন্যের মহাকর্ষ দ্বারা আকর্ষিত হয়ে একটি সাধারণ কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান আছে। আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ধারণা সমগ্র মহাবিশ্বে অন্তত ১২৫ বিলিয়ন গ্যালাক্সি বিদ্যমান। খালি চোখে আমরা রাতের আকাশে যেসব তারা দেখি তা সবই মূলত 'আমাদের গ্যালাক্সি' মিল্কিওয়ে এর [বা ছায়াপথের] সদস্য। সূর্য ও তার পরিবারভুক্ত সকল গ্রহ-উপগ্রহ-এ্যাস্টারোইড, ধূমকেতু ইত্যাদি সবই ঐ ছায়াপথের অসংখ্য তারার একটি মাত্র। তারা, গ্রহ-উপগ্রহ ছাড়াও গ্যালাক্সিতে আছে তারা ক্লাস্টার, এটম, সাধারণ ও জটিল মলিকিউল অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাস, নাইট্রোজেন, কার্বন, সিলিকন ইত্যাদি গ্যাস। আরো আছে সর্বত্র বিচরণশীল 'কজমিক রশ্মি'।

গ্যালাক্সির শ্রেণী

উপরের (পূর্বের পৃষ্ঠার) ছবিতে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দৃশ্যমান বিরাট আনড্রমেডা গ্যালাক্সিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই গ্যালাক্সিটি ‘স্পাইরাল’ [spiral] শ্রেণীভুক্ত। আমাদের মিল্কিওয়েও একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি। এই শ্রেণীভুক্ত গ্যালাক্সির বৈশিষ্ট্য হলো অসংখ্য তারার সৃষ্ট একাধিক স্পাইরাল আর্মস বা পেছানো হাত থাকা। অপর আরেক ধরনের গ্যালাক্সি দেখতে পাওয়া যায় যাদের আকার গোলকের মতো- এদেরকে বিজ্ঞানের ভাষায় eliptical [ডিম্বাকৃতি] গ্যালাক্সি বলে।

নীচের ছবিতে এম-৮৬ ও এম-৮৪ ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি-দ্বয়কে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ দু'টো গ্যালাক্সি ভারগো ক্লাস্টার নামক গ্যালাক্সি গ্রুপের সদস্য। আমাদের অপেক্ষাকৃত ছোট্ট ‘লকেল গ্রুপ’ নামক ক্লাস্টার থেকে এটির দূরত্ব ৫০ মিলিয়ন আলোক-বছর। ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সিতে বেশিরভাগ তারা বয়স্ক বলেই প্রতীয়মান হয়। এছাড়া এরূপ গ্যালাক্সিতে কোনো আন্তঃতারা গ্যাস বা ধুলোবস্তু নেই বললেই চলে। অধিকাংশ ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি দেখতে অত্যন্ত উজ্জ্বল। অপরদিকে স্পাইরাল গ্যালাক্সি আকারে অনেকটা চেপ্টা ও ডিস্কের মতো। এতে শুধু পুরাতন বয়স্ক তারা নয় বরং অল্প বয়স্ক তারাসহ বেশ কিছু আন্তঃতারা গ্যাস ও ডাস্ট বিদ্যমান।

আমাদের অপৃক্ষাকৃত কাছের একটি রিং গ্যালাকিক্স

অপর আরেকদল গ্যালাক্সি আছে যাদের দেখতে অনেকটা ডিস্কের মতো লাগলেও বিশেষ কোনো আকার-বৈশিষ্ট্য নেই। এসব গ্যালাক্সির শ্রেণী হলো 'ইরেগুলার' বা বিশেষ আকারহীন। এসব গ্যালাক্সিতে খুব বেশী গ্যাস, নতুন তারা ও ডাস্ট বস্তু বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত ছোট্ট আয়তনের এসব গ্যালাক্সি সাধারণত বড়ো কোনো গ্যালাক্সির নিকটে অবস্থান করতে দেখা যায়। প্রায়শঃই এগুলো নিকটস্থ বড়ো গ্যালাক্সিকে প্রদক্ষিণ করে থাকে- ফলে এগুলোকে স্যাটেলাইট গ্যালাক্সি হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অনুরূপ দু'টি স্যাটেলাইট গ্যালাক্সি আছে। এগুলোকে লার্জ ও স্মল মেজেলানিক ক্লাউডস বলে। এই একই শ্রেণীভুক্ত একদল গ্যালাক্সি আছে যাদেরকে রিং গ্যালাক্সি বলে। উপরের চিত্রে আমরা এরূপ একটি বস্তু দেখতে পাচ্ছি।

ছবিতে যে গ্যালাক্সি দেখা যাচ্ছে তার নাম হলো 'হগস অবজেক্ট'। এই গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বাস করে কোটি কোটি পুরাতন হলুদ তারা। অপরদিকে রিংয়ের অধিকাংশ তারা নীল ও অল্পবয়স্ক। বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাকাশে গ্যালাক্সিদের মধ্যে সংঘর্ষও বাধে। হগস অবজেক্ট অন্য কোনো গ্যালাক্সির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। এই গ্যালাক্সিটি আমাদের থেকে ৬০০ মিলিয়ন আলোক-বছর দূরে অবস্থিত। এক সময় মনে করা হতো রিং গ্যালাক্সির সংখ্যা খুব কম কিন্তু সম্প্রতি মহাকাশে স্থাপিত 'হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ' থেকে প্রাপ্ত ছবির সাহায্যে অনেক বেশী রিং গ্যালাক্সির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এতে এটাই বুঝা যায় যে, গ্যালাক্সিদের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায়ই হয়ে থাকে। আরো কিছু গ্যালাক্সি আছে

যাদেরকে ক্যুয়াইজার বলে। আমরা পরবর্তীতে কিছু বিশিষ্ট গ্যালাক্সির উপর তথ্যমূলক আলোচনা করবো। তখন ক্যুয়াইজার, রেডিও গ্যালাক্সি, বি এল লাসারটি অবজেক্টস ইত্যাদির উপর বিস্তারিত বলা হবে।

দূরত্ব নির্ণয়

সাধারণত গ্যালাক্সি একটা আরেকটা থেকে বিরাট দূরত্বে অবস্থান করে। আলোকের গতির সঙ্গে তুলনা করেও দূরত্বকে মিলিয়ন মিলিয়ন বলে উল্লেখ করতে হয়। প্রশ্ন জাগে, এই দূরত্ব মাপার উপায় কি? এসব কতটুকু সঠিক? টেলিস্কোপের ছবি থেকে কোনো মতেই দূরত্ব মাপার উপায় নেই- কারণ, দৃশ্যমান গ্যালাক্সিটি দূরবর্তী কোনো বিরাট আয়তনের বস্তু কিংবা নিকটস্থ ছোট্ট আয়তনবিশিষ্ট বস্তু হতে পারে। সুতরাং দূরত্ব নির্ণয়ের অন্য উপায় বের করতে হবে। এর একটি হলো অজানা গ্যালাক্সির মধ্যস্থ বস্তুর ঔজ্জ্বল্য কিংবা আয়তন আমাদের গ্যালাক্সির জানা বস্তুদের সঙ্গে তুলনা করা। এ পদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারা, সুপারনোভা বিস্ফোরণ, নক্ষত্রপুঞ্জ ও গ্যাস ক্লাউড ইত্যাদি বস্তু ব্যবহৃত হয়। সময়ের আবর্তনে যেসব তারার ঔজ্জ্বল্যতায় বেশ-কম হয় এদেরকে বলে ভেরিয়েবুল স্টার। এগুলো দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। এদের ঔজ্জ্বল্যতার সঙ্গে পিরিওডের সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং সতর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারার আসল ঔজ্জ্বল্যতা বের করা সম্ভব এবং এই তথ্য দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্যতার সাথে তুলনা দ্বারা তারার দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। বিজ্ঞানীরা আরো জানেন যে, গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে উপলক্ষ করে সকল তারাই যারতার কক্ষপথে ঘূর্ণমান আছে। এই ঘূর্ণন গতি ঔজ্জ্বল্যতা ও গ্যালাক্সির ভর বা ম্যাসের উপর নির্ভরশীল। দেখা গেছে, খুব দ্রুত গতিতে ঘূর্ণমান গ্যালাক্সি অপেক্ষাকৃত কম গতিতে ঘূর্ণমান গ্যালাক্সি থেকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী উজ্জ্বল। সুতরাং তারাদের প্রদক্ষিণ গতি নির্ণয় করতে পারলে, এটি যে গ্যালাক্সির সদস্য তার দূরত্বও বের করা সম্ভব। মোটকথা ঔজ্জ্বল্যতা ও গতিবিধি নির্ণয়ের মাধ্যমে দূরবর্তী গ্যালাক্সির দূরত্ব মাপা হয়ে থাকে।

মহাকাশের সর্বত্রই গ্যালাক্সির সন্ধান মিলেছে। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে, পুরো মহাবিশ্বব্যাপী সমভাবে গ্যালাক্সি বন্টিত আছে। তবে সাধারণত গ্যালাক্সিরা একক সম্পর্কহীন হিসাবে অবস্থান করে না। অধিকাংশই অপর কোনো ছোট্ট কিংবা

বড়ো গ্রুপ, না হয় ক্লাস্টারের সদস্য হয়ে থাকে। আর এই গ্রুপ বা ক্লাস্টারও এককভাবে নয় বরং কোনো একটি বিরাট সুপারক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত সদস্য। আমাদের লকেল গ্রুপের সদস্য মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। এই গ্রুপে আছে ৩০টি সদস্য-গ্যালাক্সি। ৩ মিলিয়ন আলোক-বছর দূরে অবস্থিত আনড্রমেডা গ্যালাক্সি এই লকেল গ্রুপের অপর বড় সদস্য- আর প্রথমটি আমাদের ছায়াপথ। তবে লকেল গ্রুপ আরেক লকেল সুপারক্লাস্টারের সদস্যও। ভারগো নামক বিরাট ক্লাস্টার লকেল সুপারক্লাস্টারের কেন্দ্র।

গ্যালাক্সির কেন্দ্র

প্রত্যেক গ্যালাক্সির তারা, ক্লাউড্স, গ্যাস ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু একটি কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘুরে। সাধারণত কেন্দ্রের দিকে যতোই অগ্রসর হওয়া যায় ততোই বেশী থেকে বেশী তারা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া কেন্দ্র থেকে বিরাট শক্তিশালী এনার্জি বেরিয়ে আসে। এর মধ্যে আলোকরশ্মি ও ইলেকট্রমেগনেটিক বিভিন্ন রেডিয়েশন আছে। কিন্তু ঠিক কেন্দ্রে কী আছে? এ প্রশ্নের জবাব এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে অনেকে মনে করেন ব্ল্যাক হোল নমক এক অদ্ভুত বস্তু সেখানে বাস করে। আমরা একটু পরই ব্ল্যাক হোলের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরবো। অনেকদিন যাবৎ ব্ল্যাক হোল শুধুমাত্র একটি কল্পিত বস্তু ছিলো- শেষ পর্যন্ত ১৯৯৪ সালে হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ একটি ব্ল্যাক হোল আবিষ্কার করে। এর অবস্থান দেখা গেছে একটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। এরপর ১৯৯৮ সালে শক্ত প্রমাণ মিললো যে, আমাদের নিজস্ব মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও একটি ব্ল্যাক হোল আছে। ২৮ হাজার আলোক-বছর দূরত্বে অবস্থিত কেন্দ্রের এই হোলটির ভর বা ম্যাস সূর্য থেকে ২ মিলিয়নেরও অধিক। আমাদের লকেল গ্রুপের অপর বিরাট স্পাইরাল গ্যালাক্সি আন্ড্রমেডার কেন্দ্রেও একটি ব্ল্যাক হোল থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আগেই বলেছি প্রত্যেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে এর সবকিছু প্রদক্ষিণ করে। অনেকটা সৌরজগতের মতো কিন্তু এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। সৌরজগতের বাইরের গ্রহ-উপগ্রহের প্রদক্ষিণ গতির তুলনায় ভেতরের গ্রহ-উপগ্রহের প্রদক্ষিণ গতি অনেকটা বেশী। কিন্তু গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এর ঠিক বিপরীত। স্পাইরাল গ্যালাক্সিতে তারাগুলো বৃত্তাকার প্রদক্ষিণপথে ঘুরে- তাদের

গতি নির্ভর করে কেন্দ্র থেকে দূরত্বের উপর। দূরত্ব যতো বেশী গতিও ততো অধিক। স্পাইরাল ডিস্কের শেষপ্রান্তে এসে প্রদক্ষিণ গতি ৩০০ কিমি প্রতি সেকেন্ডে [১৮৫ মাই/সেকেন্ড] উন্নীত হতে দেখা যায়। এই গতিতে যেসব তারা প্রদক্ষিণ করে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্ব দেড় লক্ষাধিক আলোক-বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ডার্ক মেটার

গতির সাথে দূরত্বের এই সম্পর্ক থেকে বিজ্ঞানীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নির্ণয় করেছেন। এটা হলো, গ্যালাক্সির অধিকাংশ ভর বা ম্যাস সৌরজগতের মতো কেন্দ্রের মধ্যেই নিহিত নয়। অথচ দৃশ্যমান তারার মধ্যে এই অতিরিক্ত ভর বিদ্যমান নেই- সুতরাং এই 'অন্ধকার বস্তু' কি? এসব বস্তুকে অন্ধকার এজন্য বলা হয় যে, এগুলো কোনো দৃশ্যমান আলো কিংবা ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনাল বিকিরণ করে না। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে, এই ডার্ক মেটার মহাকর্ষ দ্বারা দৃশ্যমান বস্তুকে আকর্ষণ করে। বাইরের বিভিন্ন দূরবর্তী গ্যালাক্সি গবেষণার মাধ্যমে এটাই নির্ণিত হয়েছে যে, মহাবিশ্বের অধিকাংশ 'বস্তু' দৃশ্যমান তারা নয় বরং 'অন্ধকার বস্তু' বা ডার্ক মেটার।

ডার্ক মেটারের অস্তিত্বের উপর প্রমাণস্বরূপ উপরোক্ত তথ্য ছাড়াও আরো কিছু থিওরি আছে। এর একটি হলো 'গ্যালাক্সি ক্লাস্টার' থাকা। জগতের অধিকাংশ গ্যালাক্সি বিভিন্নভাবে দলে দলে বিদ্যমান আছে। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, এভাবে জড়ো হয়ে থাকার পেছনে মূল কারণ হলো ঐ ডার্ক মেটার। তারা বলেন, প্রতিটি ক্লাস্টারের ৯০ শতাংশ ভর মূলত অন্ধকার বস্তু। আর এই বস্তু থাকার ফলেই গ্যালাক্সিগুলোয় দূরত্ব তেমন বেশী হতে পারছে না- মহাকর্ষ তাদেরকে একত্রে রেখে দিয়েছে। এই দু'টি থিওরি ছাড়াও ডার্ক মেটার থাকার আরেকটি থিওরি আছে।

আমরা ইতোমধ্যে 'ইনফ্লেশন থিওরি' [inflation theory] সম্পর্কে বলেছি। এই থিওরিও অন্ধকার বস্তু থাকার দিকে ইঙ্গিত করে। যদি এই থিওরি সঠিক হয় তাহলে বুঝতে হবে জগতের ৯৯ শতাংশ বস্তুই 'ডার্ক মেটার'। তাহলে এসব বস্তু কিসের তৈরী যাদের মধ্য থেকে আমরা কোনো ধরনের ইলেকট্রমেগনেটিক বিকিরণ লক্ষ্য করি না? একাধিক সম্ভাব্য বস্তুর কথা ইতোমধ্যে বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেছেন। এর মধ্যে প্রথমটি হলো ভরবিশিষ্ট নিউট্রিনো। যদিও স্বভাবের এই মৌলিক কণা নিউট্রিনোর মধ্যে ভর আছে বলে এখনও সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে নি। দ্বিতীয় যে বস্তুটি ডার্ক মেটার হবে বলে মনে করা হয় সেটা হলো আজো পর্যবেক্ষণহীন 'ব্রাউন ডোর্ফ' [বাদামী বামন] নামক তারার মতো ছোট্ট ছোট্ট বস্তু [সূর্য থেকেও অনেক কম আয়তনবিশিষ্ট]। এছাড়া সাদা বামন তারা ও ব্ল্যাক হোলকেও অন্ধকার বস্তুর সঙ্গে শামীল করা হয়। অন্ধকার বস্তু হওয়ার সঠিক ক্যান্ডিডেট যেটাই হোক না কেন- এটার অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এছাড়া ১৯৯৭ সালে হাবল টেলিস্কোপের একটি ছবি থেকেও এর প্রমাণ মিলে। বিজ্ঞানীরা দূরবর্তী একটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টার গবেষণা করতে যেয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এতে দৃশ্যমান অংশ যেটুকু ভর দেখাচ্ছে তারচেয়ে ২৫০ গুণ বেশী বস্তু থাকার দিকে অন্যান্য তথ্যাদি ইঙ্গিত করে। এই অতিরিক্ত বস্তু ডার্ক মেটার ছাড়া আর কিছু নয়। আর ডার্ক মেটার থাকার উপর নির্ভর করছে আমাদের এই মহাবিশ্ব একদা ক্লোজ হয়ে ধ্বংস হবে কি না।

গ্যালাক্সি নামক তারাপুঞ্জের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক আলোচনা এখানেই শেষ। তবে কিছু বিশেষ গ্যালাক্সির উপর আরও একটু অতিরিক্ত জেনে নিলে জগতের সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। মহাকাশ বিজ্ঞানীরাও ওসব বিশেষ গ্যালাক্সির উপর স্ট্যাডি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করে যাচ্ছেন। সুতরাং এবার আমরা বেশ ক'টি গ্যালাক্সির উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি

নিজের ঘর থেকে শুরু করা যাক। আমরা যে গ্যালাক্সির বাসিন্দা তার নাম হলো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি। ছোটবেলা জ্যোৎস্নাহীন অন্ধকার রাতে উঠোনে বেরিয়ে যখন আকাশের দিকে তাকাতাম তখন অসংখ্য তারা ছাড়াও একটি উজ্জ্বল রেখা চোখে পড়তো যা আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। কোনো কোন মুরুব্বীদের জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এটা 'দুধের নদী'। এই দুধের নদীই আমাদের গ্যালাক্সির একটি আর্মস বা হাত মাত্র। মিল্কিওয়েকে বাংলায় ছায়াপথও বলে। আমরা অবশ্য অনেকবার মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কথা উল্লেখ করেছি।

কোন এক সময় ধারণা করা হতো এই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিই মহাবিশ্ব। কিন্তু গেল শতকের দ্বিতীয় দশকে বড়ো বড়ো টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশের ছবি ওঠানোর পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মিল্কিওয়ে মূলত কোটি কোটি গ্যালাক্সির একটি মাত্র। পুরো মহাবিশ্বব্যাপী অনুরূপ ও অন্যান্য ধরনের গ্যালাক্সি বিস্তৃত আছে। জগতের আয়তনও অনেক অনেক বড়ো। আমাদের মিল্কিওয়ে একটি বিরাট তারাজগৎ। এতে আমাদের সূর্যসহ মোট তারার সংখ্যা চারশত বিলিয়নেরও অধিক হবে বলে সর্বশেষ হিসাবে বলা হয়েছে। আমাদের সূর্য ছায়াপথের একটি আর্মসে [হাতে] অবস্থান করছে। মিল্কিওয়ের ধরন হলো স্পাইরাল বা পেছানো। এতে বেশ কয়েকটি পেছানো হাত আছে। প্রতিটি হাতে কোটি কোটি তারা ছাড়াও তারা ক্লাস্টার, নেব্যুলা, আন্তঃতারা ডাস্ট ইত্যাদি আছে। আমাদের সৌরজগৎ থেকে ছায়াপথের কেন্দ্র ২৮ থেকে ৩০ হাজার আলোক-বছর দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ সেখান থেকে আলো আসতে ত্রিশ হাজার বছর অতিবাহিত হয়। রাতের আকাশে যেসব তারা আমাদের খালি চোখে ধরা দেয় তা সবই মূলত ছায়াপথের সদস্য।

কাঠামো

আমরা ইতোমধ্যে বলেছি গ্যালাক্সির তিনটি মৌলিক আকার আছে: ইলিপটিক্যাল [ডিম্বাকৃতি], স্পাইরাল [পেছানো] ও ইরেগুলার [বিশিষ্ট আকারহীন]। আমাদের ছায়াপথ একটি বড় আয়তনের স্পাইরাল গ্যালাক্সি। এতে কয়েকটি পেছানো আর্ম বা হাত আছে এবং ১০ হাজার আলোক-বছর গাঢ় কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় এলাকার তারাগুলো একটা আরেকটা থেকে বেশ নিকটে অবস্থিত। তবে দূরের তারারা একে অন্য থেকেও বেশ দূরে অবস্থান করে। পুরো ছায়াপথের ডিস্ক একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ১ লক্ষ আলোক-বছরব্যাপী বিস্তৃত। এই বিরাট ডিস্কের উপরে ও নীচে অনেক তারাক্লাস্টার আছে যাদেরকে গ্লোবুলার ক্লাস্টার বলে।

মিল্কিওয়ের তারা

আমাদের ছায়াপথে টাইপ-১ ও টাইপ-২ এই উভয় ধরনের তারা বিদ্যমান। টাইপ-১ তারাদের বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো খুব উজ্জ্বল, নীল রংবিশিষ্ট। অপরদিকে টাইপ-২ হলো বিরাট আয়তনবিশিষ্ট লাল তারা। টাইপ-১ তারা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী, আর এ কারণেই এগুলো উজ্জ্বল আলো প্রদান করে। এদের কেন্দ্রে জোরেসুরে আনবিক ফিউশন রিয়েকশন অব্যাহত আছে। এই ফিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি হাইড্রোজেন গ্যাস টাইপ-১ তারায় বিরাট মাত্রায় বিদ্যমান। টাইপ-২ লাল জায়ান্ট তারার মধ্যে হাইড্রোজেনের মাত্রা অনেক কম। এদের কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রতিক্রিয়া অনেকটা ধীর গতিতে সংঘটিত হচ্ছে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে ছায়াপথে কেন্দ্রের নিকটবর্তী তারাদের অধিকাংশই টাইপ-২ তারা। তবে কেন্দ্রটি পুরোপুরি পর্যবেক্ষণ পৃথিবী থেকে সম্ভব নয়। গ্যালাক্সির ডিস্কের মেঘমালা ও ডাস্ট আমাদের দৃশ্যকে অনেকটা অস্পষ্ট করে তুলে। তবে ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামের অন্যান্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এই এলাকা থেকে আগত বিরিকরণ পরীক্ষা করা সম্ভব। এই কাজে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা রেডিও ও ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া এক্স-রে কৃত্রিম উপগ্রহও কাজে লাগানো হয়। এসব যন্ত্রাদি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও গবেষণা দ্বারাই কেন্দ্রের মধ্যে একটি ব্ল্যাক হোল থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ব্ল্যাক হোলের উপর বিস্তারিত আলোচনা একটি আলাদা পরিচ্ছেদে করা হবে।

গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ব্ল্যাক হোল থাকার সম্ভাবনা ছাড়াও এ্যান্টিমেটার [অবস্তু] আছে বলে প্রমাণ মিলেছে। এসব অবস্তু বস্তুর [বা মেটারের] সাথে মিলিত হলেই উভয়টি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তবে অস্তিত্ব হারানোর সময় মহাকাশে বিকিরণ করে শক্তিশালী গামা-রে। এছাড়া কেন্দ্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণনরত তারাদের উচ্চ গতিও ব্ল্যাক হোল থাকাকে সমর্থন করে। কোনো কোন তারা ১.৮ মিলিয়ন কিমি/ঘণ্টা [১.১ মিলিয়ন মাইল প্রতি ঘণ্টা]- এই বিরাট উচ্চ গতিতে প্রদক্ষিণরত আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই গতিটি সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতির তুলনায় ১৭ গুণ বেশী। অথচ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের তুলনায় ওসব তারা কেন্দ্র থেকে শত শত গুণ বেশী দূরে অবস্থান করে। সুতরাং কেন্দ্রে যাকিছুই থাকুক না কেন, অত্যন্ত অল্প এলাকায় বিরাট মহাকর্ষসম্পন্ন বস্তু ছাড়া এতো দূরের তারারা এরূপ উচ্চ গতিশীল হতো না। সুতরাং এই গবেষণাও কেন্দ্রের সম্ভাব্য বস্তুটি ব্ল্যাক হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে।

ঘূর্ণন

পুরো মিল্কিওয়ে তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে ঘুরে। গ্যালাক্টিক উত্তর মেরুর উপর থেকে তাকালে মিল্কিওয়ের ঘূর্ণন ঘড়ির কাটা তথা ডান দিকে হচ্ছে দেখা যাবে। এসাথে সবক'টি স্পাইরাল আর্মসও একই দিকে ঘুরছে বলে দৃশ্যমান হবে। ঘূর্ণন গতি ও কেন্দ্রের দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক আছে। কেন্দ্র থেকে যতো দূরে কোনো তারা অবস্থান করে তার গতিও ততো বেশী হয়। অপরদিকে কেন্দ্রের দিকে যতো যাওয়া যাবে বস্তুর ঘূর্ণন গতিও ততো কম হবে। আমাদের সূর্য ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই গতির পরিমাণ হলো ২০০ মিলিয়ন বছর কিংবা এরচেয়ে বেশী। সুতরাং আমাদের সৌরজগৎ

গ্যালাক্টিক ঘূর্ণন ও সূর্যের প্রদক্ষিণপথ

গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চতুর্দিকে ২৪০ কিমি / সেকেন্ড [বা ১৪৯ মাইল প্রতি সেকেন্ড] বেগে প্রদক্ষিণ করছে।

আনড্রমেডা গ্যালাক্সি

ইতোমধ্যে এই বিরাট গ্যালাক্সির কথা উল্লেখ করেছি। এর একটি ছবিও আমরা দেখেছি (১৯২ পৃ.)। এটি এম-৩১ [মেসিয়ার-৩১] নামেও প্রসিদ্ধ। আমাদের প্রতিবেশী এই বিরাট আয়তনের স্পাইর‍্যাল গ্যালাক্সি পৃথিবী থেকে প্রায় ৩ মিলিয়ন আলোক-বছর দূরে অবস্থিত। জগতের বেশীরভাগ গ্যালাক্সির তুলনায় এর দূরত্ব কাছে বলেই বিবেচিত, তাই একে খুব উজ্জ্বল দেখায়। এই গ্যালাক্সিই একমাত্র বস্তু যাকে খালি চোখে পৃথিবী থেকে দেখা যায়। আনড্রমেডা নামক নক্ষত্রপুঞ্জে এর অবস্থান থাকায় এর নামকরণ হয়েছে আনড্রমেডা গ্যালাক্সি। এর ঔজ্জ্বল্যতা বা মেগনিটিউড ৩.৪। প্রায় ২ লক্ষাধিক আলোক-বছর ব্যাস-সম্বলিত এই বিরাট গ্যালাক্সি পরিষ্কার মেঘশূন্য জ্যোৎস্নাহীন রাতে আমাদের পূর্ণিমার চাঁদের তুলনায় ৫ গুণ বড়ো দেখায়। পারস্য মুসলিম মহাকাশ বিজ্ঞানী আস-সুফী ৯০৫ ঈসায়ী সালে সর্বপ্রথম এই গ্যালাক্সি সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। আধুনিক যুগে আনড্রমেডা গ্যালাক্সিকে অত্যন্ত বেশী গবেষণা করা হয় এই কারণে যে, এর মধ্যস্থ তারাগুলো পর্যন্ত দৃশ্যমান। এছাড়া এটি আমাদের নিজস্ব মিল্কিওয়ের অনুরূপ। আনড্রমেডাকে গবেষণা করে আমাদের গ্যালাক্সির যে অংশ অদৃশ্য সে সম্পর্কে অনেক তথ্য নির্ণয় সম্ভব।

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আনড্রমেডার স্পাইরাল আর্মস, গ্লোবুলার ক্লাস্টার, খোলা ক্লাস্টার, আন্তঃতারা বস্তু এবং সুপারনোভা ইত্যাদির উপর গভীর গবেষণা করে যাচ্ছেন। এই গ্যালাক্সিতে তারার কোনো অভাব নেই। অধিকাংশ মতে আনড্রমেডায় ৩০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন ছোট-বড় তারা আছে।

ডবল কেন্দ্র

আনড্রমেডার মাঝখানে একটির বদলে দু’টি কেন্দ্র আছে বলে প্রতীয়মান হয়। মহাকাশে স্থাপিত হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত ছবি দ্বারা এই অদ্ভুত ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রের নিকটস্থ তারাগুলো বৃত্তাকার না হয়ে

ডিম্বাকার প্রদক্ষিণপথে ঘূর্ণমান আছে। অথচ এরূপ আকৃতির গ্যালাক্সির অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রকে নিকটস্থ তারারা বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে। ব্যাপারটি আমাদের নিজস্ব স্পাইরাল গ্যালাক্সির ক্ষেত্রেও সত্য। আনড্রমেডার তারাদের গতির মধ্যে আরেকটি ব্যাপার চিত্তাকর্ষক। ঘূর্ণনের এক পর্যায়ে তারাদের গতি অনেকটা কমে আসে। সুতরাং তারা-ট্রাফিক সৃষ্টি হয়- যেমনটি হয় ট্রাফিক যানজটে। এ্যাস্ট্রনোমাররা এই অদ্ভুত ব্যাপার থেকে এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আনড্রমেডার কেন্দ্র আসলে একটি- আর ঐ তারাদের দ্বারা সৃষ্ট ট্রাফিক হেতু সেই এলাকা উজ্জ্বল হওয়ায় দ্বিতীয় কেন্দ্র আছে বলে মনে হয়। অপর সত্যিকার কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী বিরাট ওজনের ব্ল্যাক হোল আছে বলে অনেকেই বলেছেন। এই 'তারাদের কবরস্থান' নামে খ্যাত ব্ল্যাক হোল তার নিকট দিয়ে যাতায়াতকারী তারার বায়ুমণ্ডল থেকে বস্তু টেনে তার উপর পতিত করে। উচ্চ গতিতে বস্তু পতিত হওয়ার সময় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাই এই এলাকাও উজ্জ্বল দেখায়।

ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী চার্লস মেসিয়ার [১৭৩০-১৮১৭] ১৭৭১ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে 'ক্যাটালগ অব নেব্যুলাই এন্ড স্টার ক্লাস্টারস' নামক একটি তালিকা তৈরী করেন। এই তালিকায় আনড্রমেডা স্পাইরাল গ্যালাক্সি ৩১তম বস্তু হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এ কারণে গ্যালাক্সিকে এম-৩১ নামেও অভিহিত করা হয়। মেসিয়ার এই গ্যালাক্সিকে একাধিক যন্ত্রের মাধ্যমে গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু সে যুগের টেলিস্কোপ দ্বারাও গ্যালাক্সির মধ্যস্থ কোনো তারা আলাদাভাবে দেখাতো না- ফলে তিনি এটাকে আমাদের গ্যালাক্সির একটি নেব্যুলা মনে করেই তালিকাভুক্ত করেন। তবে কয়েক শতাব্দি পরে ১৯২৩ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল [১৮৮৯-১৯৫৩] আনড্রমেডা গ্যালাক্সির দূরত্ব মাপতে সক্ষম হোন। তিনি এটাও প্রমাণ করেন যে এম-৩১ নিকটস্থ কোনো নেব্যুলা নয়- বরং প্রায় ৩ মিলিয়ন আলোক-বছর দূরত্বে অবস্থিত আমাদের মিল্কিওয়েের মতো অপর একটি গ্যালাক্সি। এই আবিষ্কারের ফলে এটাই প্রমাণ হলো যে, ইতোমধ্যে সত্য বলে স্বীকৃত মহাবিশ্ব শুধুমাত্র আমাদের গ্যালাক্সির বস্তু নিয়ে গঠিত তা মূলত ভিত্তিহীন। এই মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্যালাক্সি আছে যাদের কোনো কোনোটির দূরত্ব মিলিয়ন মিলিয়ন এমনকি বিলিয়ন আলোক-বছর।

মেজেলানিক ক্লাউড্স

আমাদের গ্যালাক্সির নিকটে দু’টি বিশিষ্ট আকারহীন ছোট্ট গ্যালাক্সি আছে। ডরেডো নামক কন্সটেলেশনে লার্জ মেজেলানিক ক্লাউড [এলএমসি] অবস্থিত। আর টুকানা নামক কন্সটেলেশনে স্মল মেজেলানিক ক্লাউড [এসএমসি] দেখতে পাওয়া যায়। উভয় গ্যালাক্সি উত্তর গোলার্ধ থেকে রাতের আকাশে খালি চোখে দেখা যায়। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে ফারদিনেন্ড মেজেলান [১৪৮০-১৫২১] নামক পুর্তোগালের এক সমুদ্র নাবিক মুসলমানদের কাছ থেকে এই গ্যালাক্সিদ্বয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছিলেন। সুতরাং পরবর্তীতে এ দু'টোর নামকরণ তারই নামানুসারে করা হয়। এলএমসি ১,৫০,০০০ আলোক-বছর দূরে অবস্থিত এবং এসএমসি’র দূরত্ব ১,৭৩,০০০ আলোক-বছর।

ঈসায়ী ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে এসএমসি’র পেছনে আরও ২০,০০০ আলোক-বছর দূরে ছোট্ট আরেকটি আকৃতিহীন গ্যালাক্সি আবিষ্কৃত হয়। এটির নামকরণ মিনি মেজেলানিক ক্লাউডস [এমএমসি] হিসাবে স্বীকৃত হয়। ধারণা করা হয় আজ থেকে ২০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে এলএমসি ও এসএমসি’র মধ্যে প্রায়-সংঘর্ষ বাধে। ফলে এসএমসি থেকে এমএমসি বিচ্ছিহ্ন হয়ে ছিটকে পড়ে। ১৯৮৭ সালে এলএমসিতে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটে। মহাকাশে স্থাপিত হাবল

টেলিস্কোপ এই সুপারনোভার ছবি তুলে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। মেজেলানিক ক্লাউডস মূলত আমাদের ছায়াপথের উপ-গ্যালাক্সি বা স্যাটেলাইট। উভয় ক্লাউডস আমাদের গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে।

এনজিসি ৪২৫৮

কেনিস ভেনেসিটি নক্ষত্রপুঞ্জে এনজিসি ৪২৫৮ স্পাইরাল গ্যালাক্সি অবস্থিত। এর অপর নাম এম-১০৬। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি ভারী ব্ল্যাক হোল আছে। গ্যালাক্সিটি মহাকাশে উজ্জ্বল বস্তুদের একটি। ছোট্ট দূরবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে এটি সহজেই দৃশ্যমান। এর দৃশ্যমান মেগনিটিউড ৮.৩। আনড্রমেডা গ্যালাক্সির মতো এনজিসি ৪২৫৮-এর ডিস্ক কাত করা দেখায়। গ্যালাক্সির স্পাইরাল আর্মসে নতুন তারার জন্ম হচ্ছে বলে মনে হয়। এই গ্যালাক্সির একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তের দূরত্ব ১,৩১,০০০ আলোক-বছর। আমাদের পৃথিবী থেকে এটি ২৫ মিলিয়ন আলোক-বছর দূরত্বে অবস্থিত।

এনজিসি ৪২৫৮ 'আরসা মেজর' নামক ক্লাউডের সদস্য হতে পারে। সাম্প্রতিক কিছু তথ্য থেকে জানা যায় গ্যালাক্সির কেন্দ্রে সূর্য থেকে ৩৬ মিলিয়ন গুণ ভারী একটি বস্তু আছে। মাত্র ০.১ আলোক-বছর ব্যাসসম্পন্ন এই বস্তুটিই হলো এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা ঘন বস্তু। কেন্দ্র থেকে খুব শক্তিশালী গ্যাস জেট বের হয়ে আসতেও দেখা যায়। এসব তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এনজিসি ৪২৫৮-এর কেন্দ্রে একটি বড় আয়তন ও ওজনের শক্তিশালী ব্ল্যাক হোল আছে।

এনজিসি ৪২৬১

এই গ্যালাক্সিটি ৩সি২৭০ সংকেত দ্বারাও চিহ্নিত করা হয়। ভার্গো নক্ষত্রপুঞ্জে এই স্পাইরাল গ্যালাক্সির অবস্থান। নিউ জেনারেল ক্যাটালগ [এনজিসি] নামকরণে একটি তালিকা ডেনিশ মহাকাশ বিজ্ঞানী ডি. এল. ই. ড্রেয়ার ১৮৮১ সালে প্রণয়ন করেন। এনজিসি ৪২৬১ গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও একটি সুপার-ভারী ব্ল্যাক হোল আছে বলে অনেকেই ধারণা করেন। এই গ্যালাক্সিটি তুলনামূলকভাবে কাছেই অবস্থিত। মেপে দেখা গেছে এর দূরত্ব ১০০ মিলিয়ন আলোক-বছর। আকাশের ৩.৯ আর্ক হলো এর দৃশ্যের ব্যাপ্তি [এই মাপ দ্বারা এটাই বুঝায়: আকাশের কতটুকু অংশ জুড়ে এটি পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান হয়]। গ্যালাক্সিটির দৃশ্যতঃ মেগনিটিউড [পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান ঔজ্জ্বল্যতার একটি মাপ] ১০.৩।
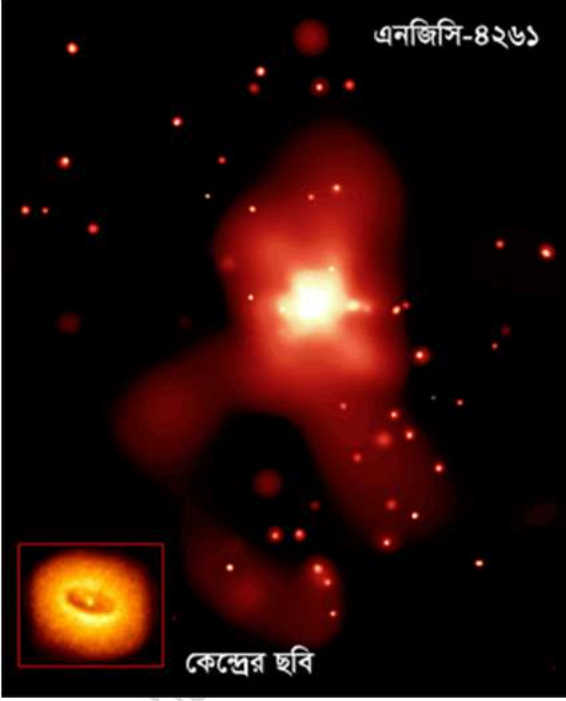
অতি সম্প্রতি মহাকাশে স্থাপিত হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা গেছে এনজিসি ৪২৬১ এর কেন্দ্রের চতুর্দিকে একটি স্পাইরাল ডিস্ক আছে। এটি প্রায় ১৩০০ কিমি [৮০০ মাইল] চওড়া। এই ডিস্ক থেকে খুব দ্রুত ধুলোর মতো বস্তু কেন্দ্রস্থ ব্ল্যাক হোলে পতিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেনো এই ডিস্কটি ব্ল্যাক হোলের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এম-৮৭

এটি 'ভারগো এ' নামেও প্রসিদ্ধ। ভার্গো নক্ষত্রপুঞ্জের একটি বিরাট আয়তনের ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সি হলো এম-৮৭। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ৫০ মিলিয়ন আলোক-বছর। এই গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও একটি বিরাট বড়ো ব্ল্যাক হোল থাকতে পারে।

ভার্গো ক্লাস্টার অব গ্যালাক্সিতে এম ৮৭ একটি প্রভাবশীল বস্তু। এই ক্লাস্টারটি পৃথিবী থেকে নিকটতম গ্যালাক্সি গ্রুপ। এম ৮৭ এর ব্যাস ১১,২০,০০০ আলোক-বছর। আমাদের মিল্কিওয়েয়ের ডিস্ক থেকে এর ব্যাস ২০ শতাংশ বেশী। প্রায় গোলকের মতো এই গ্যালাক্সিতে ছায়াপথের তুলনায় অন্তত দশ গুণ বেশী তারা আছে যাদের অধিকাংশই পুরাতন বা বয়স্ক।
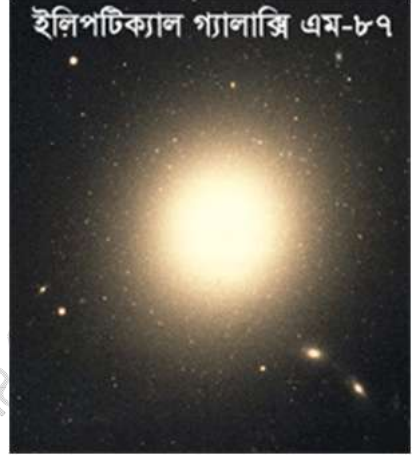
এম ৮৭ থেকে উচ্চ মাত্রায় রেডিও এবং এক্স-রে তরঙ্গ বিকিরণ হয়। এতে হাজার হাজার গ্লোবুলার তারা ক্লাস্টার বিদ্যমান। অত্যন্ত সক্রিয় কেন্দ্র থেকে হাজার হাজার আলোক-বছর দূর পর্যন্ত অস্থির বস্তু বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। কেন্দ্রে একটি ভারী কৃষ্ণ বস্তু আছে যার ভর সূর্যের তুলনায় ৩ বিলিয়ন গুণ বেশী। এই বস্তুটি হয়তো কোনো ব্ল্যাক হোল হবে। এর চতুর্দিকে একটি দ্রুত ঘূর্ণনরত ডিস্কের সন্ধান পাওয়া গেছে। এতে কেন্দ্রের কালো বস্তু ব্ল্যাক হোল হওয়ার সম্ভাব্যতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

রেডিও গ্যালাক্সি

আমরা ইতোমধ্যে বেশ ক'টি গ্যালাক্সির উপর তথ্যাদি তুলে ধরেছি। গ্যালাক্সি গবেষণায় বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোককেই ব্যবহার করেন না। গবেষণার সময় ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামের অন্যান্য তরঙ্গের উপরও অনুসন্ধান চালানো হয়- যাতে নির্ণিত হয় গ্যালাক্সি থেকে এসব বিকিরণ হয় কি না। এসব অদৃশ্য

তরঙ্গের মধ্যে আছে ইনফ্রাডের, আলট্রাভাইলোট, এক্স-রে ও রেডিও। পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রত্যেক গ্যালাক্সি থেকেই দৃশ্যমান আলো ছাড়াও রেডিও তরঙ্গ বেরিয়ে আসে। এই তরঙ্গে গবেষণা করলে আমরা আরো অনেক তথ্য জানতে পারবো যা সাধারণ আলোকরশ্মি থেকে জানা সম্ভব নয়।

কিছু কিছু গ্যালাক্সি আছে যাদের রেডিও তরঙ্গ খুব বেশী শক্তিশালী। সাধারণ গ্যালাক্সির তুলনায় একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে এসব গ্যালাক্সি থেকে এক হাজার থেকে একশ মিলিয়ন গুণ বেশী রেডিও তরঙ্গ নির্গত হয়। এসব বিশেষ গ্যালাক্সিকে বলে রেডিও গ্যালাক্সি। সাধারণত রেডিও গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে তরঙ্গ আসে। এই কেন্দ্রীয় এলাকাকে বলা হয় রেডিও নিউক্লিয়াস। আরো দু'টি এরিয়া থেকে রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ হয় যাকে বলে রেডিও লোবস। অধিকাংশ শক্তিশালী রেডিও গ্যালাক্সি ইলিপটিক্যাল হয়ে থাকে। আমাদের মিল্কিওয়েসহ স্পাইরাল গ্যালাক্সি থেকেও রেডিও তরঙ্গ নির্গত হয়- কিন্তু তা ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সির তুলনায় অনেক কম। তবে গড়ে ১০টি ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সির মধ্যে একটি মাত্র রেডিও গ্যালাক্সি পাওয়া যায়।

রেডিও গ্যালাক্সি তার নিজের অনেক গোপন তথ্য রেডিও সিগনালের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। উপরের [আগের পৃষ্ঠার] ফল্স চিত্রে আমরা একটি রেডিও গ্যালাক্সি দেখতে পাচ্ছি। অস্ট্রেলিয়ায় স্থাপিত একটি টেলিস্কোপ এই ম্যাপটি তৈরী করে। আমাদের ছায়াপথের স্যাটেলাইট গ্যালাক্সি লার্জ মেজেলানিক ক্লাউডস থেকে প্রাপ্ত রেডিও সিগনাল দ্বারা এই ম্যাপ বানানো হয়েছে। চিত্রে উজ্জ্বল এলাকাসমূহ হলো আয়োনাইজড্ [ionized] বা চার্জ হওয়া হাইড্রোজেন যা তাপ এনার্জি

বিকিরণ করে। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা কেন্দ্রে ব্ল্যাক হোল আছে এমন গ্যালাক্সি থেকে রেডিও সিগনাল আসে।

সিফার্ট গ্যালাক্সি

সাধারণ গ্যালাক্সি ও রেডিও গ্যালাক্সির মাঝামাঝি পর্যায়ের রেডিও বিকিরণ করে এমন কিছু গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের কেন্দ্র খুব বেশী উজ্জ্বল দেখায়- এসব গ্যালাক্সিকে সিফার্ট গ্যালাক্সি বলে। শুধু রেডিও নয় এক্স-রে বিকিরণও কোনো কোন সিফার্ট গ্যালাক্সি থেকে হয়ে থাকে। ১৯৪৩ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সিফার্ট সর্বপ্রথম এসব গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেছিলেন তাই তারই নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক তথ্য থেকে এটা প্রায় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, সিফার্ট, রেডিও গ্যালাক্সি ও ক্যুয়াইজার নামক গ্যালাক্সি মূলত একই ধরনের।

একটি সিফার্ট গ্যালাক্সি

এক্স-রে গ্যালাক্সি

বুঝাই যাচ্ছে এসব গ্যালাক্সি কোনো ধরনের: এগুলো ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামের এক্স-রে তরঙ্গ বিকিরণ করে। আমাদের সূর্যও এক্স-রে বিকিরণ করে, একইভাবে আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকেও এক্স-রে সিগনাল আসে। তবে উভয়ের মধ্যে কি পরিমাণ এক্স-রে বিকিরণ হয় সে হিসাব করলে তাতে রাতদিন তফাৎ বিদ্যমান। সূর্য যে পরিমাণ বিকিরণ করে তার লক্ষ গুণ বেশী ছায়াপথ করে। আর কোনো কোন অত্যুজ্জ্বল এক্স-রে গ্যালাক্সি থেকে ট্রিলিয়ন গুণ বেশী এক্স-রে বেরিয়ে আসে। সাধারণত বাইনারি [জোড়া] তারা সিস্টেম যাদের কক্ষপথ একে অন্য থেকে বেশী নিকটবর্তী এবং গ্যালাক্সির গরম গ্যাস থেকে এক্স-

রে তরঙ্গে রেডিয়েশন বিকিরণ হয়। সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এক্স-রে গ্যালাক্সির কেন্দ্র অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে থাকে। এতে অবশ্য ব্ল্যাক হোলের মতো বস্তু বিদ্যমান। এরূপ গ্যালাক্সিই শক্তিশালী এক্স-রে তরঙ্গ বিকিরণ করে।

বাইনারি তারা থেকে এক্স-রে

বাইনারি বা জোড়া তারা থেকে যে এক্স-রে নির্গত হয় তাতে সাধারণত একটি সাধারণ তারা আর অপর আরেক ভারী প্রভাবশীল তারা থাকে। শেষোক্ত তারার প্রভাবে ও মহাকর্ষে পতিত হয়ে প্রথম তারা থেকে বস্তু ছিটকে এসে দ্বিতীয়টির উপর পতিত হয়। আর পতনের সময় বস্তু গতি ও ঘর্ষণ থেকে তাপমাত্রায় বেড়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এসময় বস্তুর মধ্যে এক্স-রে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে মহাকাশে বিকিরণ হয়। প্রভাবশীল সঙ্গী সাধারণত ‘নিউট্রন তারা’ কিংবা ‘ব্ল্যাক হোল’ হতে পারে। অন্য এক্স-রে সূত্রের মধ্যে পুরাতন লাল জায়ান্ট তারা ও তার ভারী সঙ্গী অপর তারা হতে পারে। এছাড়া

এক্স-রে বাইনারি তারা (শিল্পীর কল্পিত ছবি)

সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর চতুর্দিকে দ্রুত বিস্তারী গ্যাস থেকেও এক্স-রে সিগনাল আসে।

ক্যুয়াইজার

ক্যুয়াইজার অর্থ ক্যুয়াইজি-স্টেলার রেডিও সোর্স। এগুলো মূলত খুব দূরে অবস্থিত শক্তিশালী রেডিও সূত্র। এগুলো এতো দূরে থাকা সত্ত্বেও তাদের আয়তনের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক উজ্জ্বল বস্তু। এছাড়া ক্যুয়াইজারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পৃথিবী থেকে এদের দূরে সরে পড়ার উচ্চ গতি।

অত্যন্ত দূরবর্তী গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ক্যুয়াইজারের অবস্থান। অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতামত হলো, ক্যুয়াইজার মূলত বিরাট বড়ো বড়ো ব্ল্যাক হোলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা একটু পরই ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবো। ব্ল্যাক হোলের কাজ হলো তার চতুর্দিকস্থ বস্তু বা মেটার নিজের মধ্যে দুমড়ে-ছুমড়ে টেনে নিয়ে পতিত করা। বস্তু ঘুরে ঘুরে ব্ল্যাক হোলের উপর পতিত হয় প্রায় আলোকের কাছাকাছি গতিতে। এই উচ্চ গতির ফলে বস্তুর মধ্যস্থ তাপমাত্রা বিরাট হয়ে ওঠে। ফলেই বিকিরণ হয় শক্তিশালী এক্স-রে তরঙ্গ। শুধু এক্স-রে নয় দৃশ্যমান আলোসহ ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামের অধিকাংশ তরঙ্গে ঐ দ্রুত পতনশীল বস্তু থেকে বিকিরণ হয়ে থাকে। ক্যুয়াইজার থেকে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো নির্গত হওয়ার কারণ এটাই।

দুটি ক্যুয়াইজারের ছবি
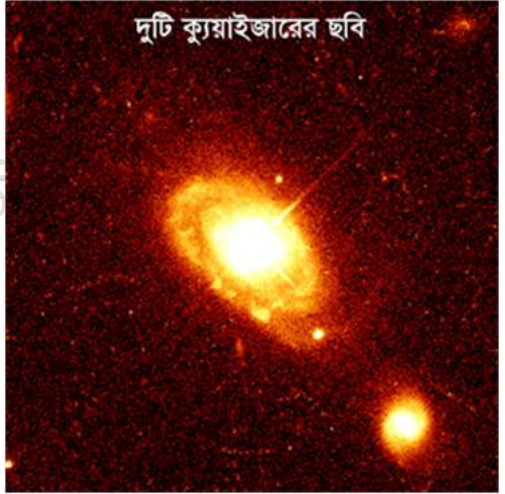
কুয়াইজার শব্দের মধ্যে স্টেলার বা তারার মতো কথাটি সম্পৃক্ত। এর কারণ হলো আমাদের টেলিস্কোপে বস্তুটি তারার মতো দেখায় যদিও এগুলো মূলত দূরতম গ্যালাক্সির কেন্দ্র। গেল শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে কুয়াইজার আবিষ্কৃত হয়। এগুলো ছিলো শক্তিশালী রেডিও সূত্র। কিন্তু পরবর্তীতে আবিষ্কৃত কুয়াইজারের মাত্র ১০ শতাংশ শক্তিশালী রেডিও সূত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। স্টেলার বা তারার মতো কথাটি নামের মধ্যে থাকায় আজকাল এগুলোকে কুয়াইজি স্টেলার অবজেক্ট [কিউএসও] নামে সম্বোধন করা অনেকে পছন্দ করেন। তবে কুয়াইজার নামও মুছে যায় নি। অধিকাংশ কুয়াইজার থেকে ইনফ্রারেড তরঙ্গে সিগনাল আসে। দৃশ্যমান আলো থেকে এই তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সামান্য কিছু দীর্ঘ। এই তরঙ্গ ছাড়া অনেক কুয়াইজার আছে যাদের মধ্য থেকে এক্স-রে তরঙ্গও নির্গত হয়।

আমরা গ্রন্থের প্রথম দিকে রেড শিফ্ট বা ডপলার ইফেক্ট নিয়ে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছি। কোনো বস্তুর রেডিয়েশন বা বিকিরণ যখন স্পেকটোগ্রাফির মাধ্যমে গবেষণা করা হয় তখন স্পেকট্রামে দৃশ্যমান এমিশন রেখা লাল কিংবা নীলের দিক শিফ্ট বা স্থানান্তরিত হয়। এই ব্যাপারটি সংঘটনের কারণ হলো সূত্র বস্তুর গতি। যদি তা দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে শিফ্ট হবে লালের দিকে আর কাছে আসতে থাকলে শিফ্ট হবে নীলের দিকে। অধিকাংশ গ্যালাক্সি থেকে প্রাপ্ত রেডিয়েশন পরীক্ষা করে দেখা গেছে লালের দিকেই রেখা শিফ্ট করে। সুতরাং রেড শিফ্ট কথাটি মহাকাশ বিজ্ঞানে সচরাচর ব্যবহৃত ব্যাপার। তবে কুয়াইজারের ক্ষেত্রে এই রেড শিফ্ট অত্যাশ্চর্য মাত্রায় হয়ে থাকে। এ থেকে '৩সি ২৭৩' নামক কুয়াইজারের দূরত্ব ১.৫ বিলিয়ন আলোক-বছর নির্ণিত হয়েছে। ২০০০ সাল পর্যন্ত ১০ হাজারেরও অধিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে যাদেরকে কুয়াইজার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের দু'এক হাজারের লাল শিফ্ট মাপা হয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটির রেড শিফটের মাত্রা ৫ এর কাছাকাছি বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ থেকে এটাই জানা গেল যে, এসব কুয়াইজার পৃথিবী থেকে অন্তত ১২ বিলিয়ন আলোক-বছর দূরে অবস্থিত। যখন আমরা ভাবি যে, আলো আসতে যে বস্তু থেকে ১২ বিলিয়ন বছর অতিবাহিত হলো তাহলে, আমরা যা দেখছি তা মূলত জগতসৃষ্টির মাত্র কয়েক বিলিয়ন বছর পরের দৃশ্য। অন্য কথায় যতোই দূরবর্তী আসমানী বস্তু আমরা পরীক্ষা করবো ততোই সৃষ্টিলগ্নের কাছাকাছির ব্যাপার-স্যাপার আমরা

জানতে পারবো। এই কারণেই ক্যুয়াইজার নিয়ে গবেষণার প্রতি মহাকাশ বিজ্ঞানীদের আগ্রহ সর্বাধিক। বাস্তবে ‘এখন’ এসব বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অনেকের মতে ক্যুয়াইজার মূলত আজকের বিশ্বে দৃশ্যমান গ্যালাক্সিসমূহের প্রাথমিক বিবর্তনের রেকর্ডকৃত ছবি যা অনেক পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর অতিবাহিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, কোনো কোন ক্যুয়াইজার থেকে যখন তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন তরঙ্গ তাদের যাত্রা শুরু করে তখন আমাদের সূর্য ও সৌরজগতের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের পৃথিবীসহ সূর্য ও সকল গ্রহ-উপগ্রহ ৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে জন্মলাভ করে। ক্যুয়াইজার বস্তুরা যে খুব অল্প বয়স্ক মহাবিশ্বের বস্তু তার প্রমাণ মিলে এদের থেকে প্রাপ্ত আলোর তীব্র ঔজ্জ্বল্যতা থেকে। গত ১৯৯৮ সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি ক্যুয়াইজার আবিষ্কার করেন যার ঔজ্জ্বল্যতা আমাদের পুরো গ্যালাক্সির তুলনায় ৩০ হাজার গুণ বেশী বলে প্রমাণিত হয়! ক্যুয়াইজারের উপর আমাদের জ্ঞান এখনও খুব সীমিত। এগুলোর উপর গভীর গবেষণা শুরু হয়েছে। নিঃসন্দেহে জগতসৃষ্টির কয়েক বিলিয়ন বৎসরের মধ্যে আকার ধারণকারী এসব বস্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরো অনেক গোপন রহস্য উন্মোচন অচিরেই করবে।

ব্ল্যাক হোল কি?

আমরা ইতোমধ্যে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে অনেকবার উল্লেখ করেছি। মহাকাশে এই অদ্ভুত বস্তুর অস্তিত্ব অনেক দিন যাবৎ শুধুমাত্র থিওরি হিসাবে লিখিত গ্রন্থাদি ও বিজ্ঞানীদের মুখের কথায় সীমাবদ্ধ ছিলো। এরূপ কোনো বস্তু আদৌ আছে কি না তা নিশ্চিত ছিলো না। কিন্তু পরবর্তীতে এরূপ বস্তু বাস্তবে থাকার সম্ভাবনা দিন দিন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আমরা ব্ল্যাক হোল নামক ‘কজমিক গ্রেভ ইয়ার্ড’ বা মহাশূন্যের কবরস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাঠকদের উপহার দিচ্ছি। এই বস্তুটি যেমন অদ্ভুত, এটা সম্পর্কিত বিভিন্ন থিওরিও তেমনি অদ্ভুত। সুতরাং এক্ষুণি পাঠকরা কিছু অচিন্তনীয় কথা পাঠ করতে যাচ্ছেন- যা সবার কাছে বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক উপন্যাসের কোনো গল্প বলে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু আসলে বাস্তব

সত্য! অন্তত ব্ল্যাক হোলকে জনপ্রিয় করার জন্য দায়ী বিজ্ঞানীদের জোর দাবী এটাই।

একটি ব্ল্যাক হোলোর প্রথম ছবি

আগেই বলে রাখি অধিকাংশ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে ব্ল্যাক হোল আছে বলে আজকাল প্রায়ই মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দাবী করে থাকেন। অবশ্য এ দাবীর পেছনে শক্তিশালী প্রমাণও আছে। তবে যে বস্তু দেখা যায় না সেটাই হলো ব্ল্যাক হোল। এটা এমন এক বস্তু যার উপর থেকে কোনো ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন বেরিয়ে আসতে পারে না- এমনকি আলোও না। এ কারণেই এগুলোকে সরাসরি চিহ্নিত করা কঠিন। বিজ্ঞানীরা আজো কোনো ব্ল্যাক হোল আবিষ্কারের কথা জোর গলায় প্রচার করতে নারাজ- তবে সকল ইঙ্গিত এদিকেই দিচ্ছে যে, জগতব্যাপী প্রচুর ব্ল্যাক হোল আছে এবং এদের অধিকাংশের বাসস্থান বড় আয়তন ও ওজনের গ্যালাক্সির কেন্দ্র।

কৃষ্ণ গর্তের মহাকর্ষ এতোই শক্তিশালী যে এটি যদি যথেষ্ট বড়ো হয়ে থাকে তাহলে কোনো ধরনের এনার্জি এটি থেকে বিকিরণ হতে পারবে না। আলোকরশ্মিকে পর্যন্ত এই মহাকর্ষ টেনে বক্র করে নিজের মধ্যে রেখে দেয়। সুতরাং জগতের মধ্যে রং কালো না হয়েও কোনো বস্তু যদি দেখতে সর্বাপেক্ষা কালো বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে তাহলে সেই বস্তুর নাম ব্ল্যাক হোল। ব্ল্যাক হোলোর চতুর্দিকে একটি সীমানা আছে যাকে বলে ‘ইভেন্ট হারাইজোন’ [event horizon]। এই হারাইজোনের অভ্যন্তরে যে কোনো কিছু এমনটি আলোকরশ্মিও যদি ঢুকে পড়ে তাহলে আর বের হয়ে আসার সম্ভাবনা নেই।
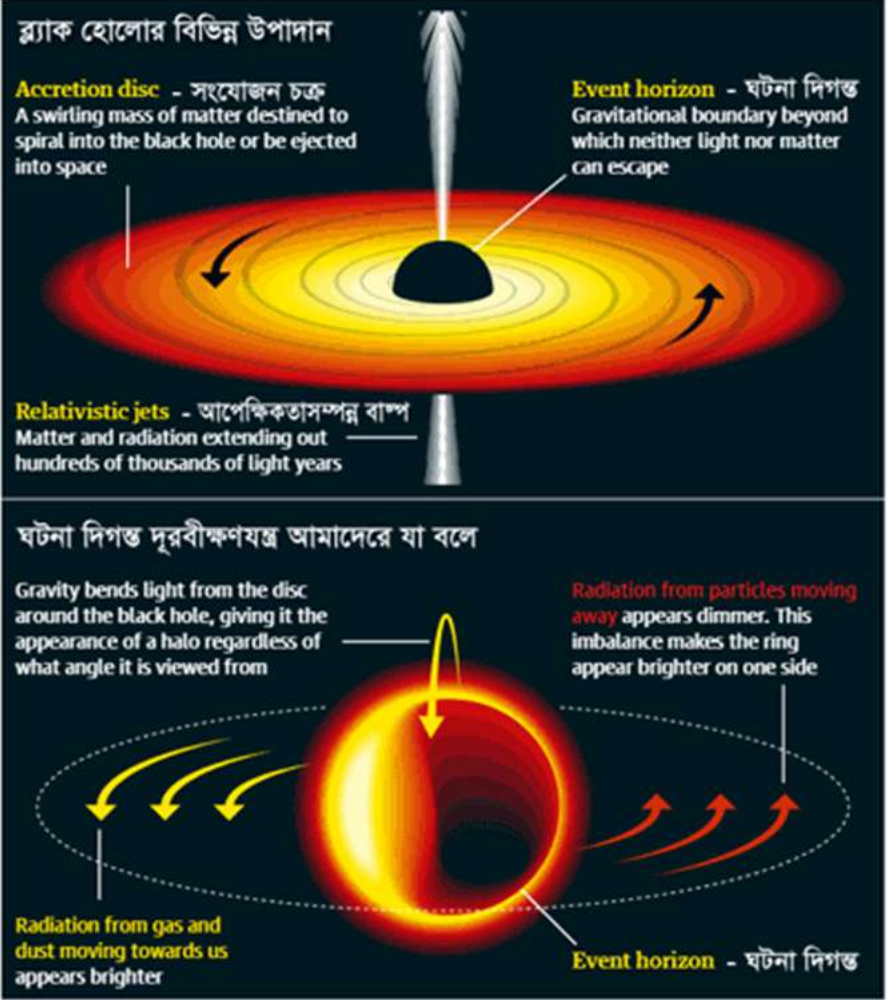
আমরা উপরের ছবিতে একটি ব্ল্যাক হোলোর কল্পিত চিত্র দেখতে পাচ্ছি। এতে বুঝানো হয়েছে ব্ল্যাক হোল কিভাবে মহাশূন্য ও সময়কে টেনে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তার জেনারেল থিওরি অব গ্রাভিটেশন দ্বারা এই অবস্থাটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ প্রসঙ্গে রিলেটিভিটির উপর বিস্তারিত বলবো না। তবে এখানে এটুকু বলা যায় যে আইনস্টাইনের মতে কোনো বিরাট ভর

বা ম্যাসসম্পন্ন বস্তু তার চতুর্পার্শস্থ মহাকাশ ও সময়কে বক্র করে ফেলে। এই থিওরি থেকেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ব্ল্যাক হোলের নিকটে জগতটি ভিন্ন। সেখানকার স্পেইস-টাইম অদ্ভুত এবং সচরাচর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা এসব ব্যাপার বুঝানো যাবে না।

ব্ল্যাক হোলের ইতিবৃত্ত

জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল শোয়ার্টচাইলন্ড ১৯১৬ সালে ব্ল্যাক হোলের ধারণার জন্ম দেন। তিনি ইতোমধ্যে উল্লেখিত আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটির উপর ভিত্তি করে ব্ল্যাক হোল থাকার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন। শোয়ার্টচাইল্ডের থিওরি অনুযায়ী ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হারাইজোন নির্ভর করে এর ভর বা ম্যাসের উপর। যদি কোনো বস্তু বৈদ্যুতিকভাবে চার্জসম্পন্ন হয়ে থাকে কিংবা এতে ঘূর্ণন গতি ধারণ করে তাহলে শোয়ার্টচাইল্ডের ফলাফল পরিবর্তিত হবে। এ ক্ষেত্রে হারাইজোনের বাইরে আরেকটি 'এরগোস্ফিয়ার' সৃষ্টি হবে। এই গোলক পর্যন্ত যতো বস্তু আছে তা ব্ল্যাক হোলের ঘূর্ণন গতির সাথে তাল মিলিয়ে ঘুরতে থাকবে। সুতরাং এই এরগোস্ফিয়ার থেকে এনার্জি বেরিয়ে আসতে পারে। একটি ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে জানার উপায় তাই এই এরগোস্ফেয়ারের এনার্জি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্যে নিহিত।
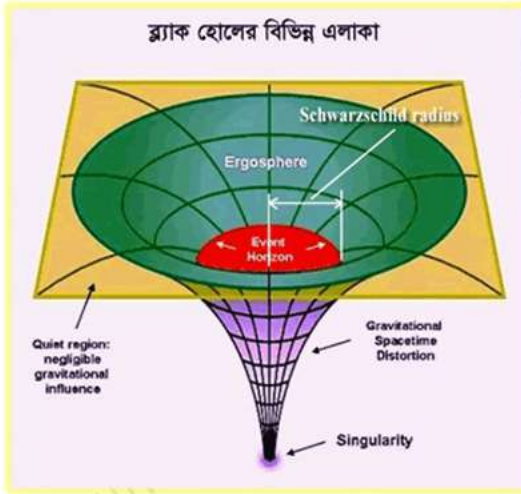
আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মহাকর্ষ ব্ল্যাক হোলের নিকটস্থ মহাশূন্য ও সময়ের গতিকে পরিবর্তন করে ব্যাপকভাবে। বাইর থেকে যদি কেউ ইভেন্ট হারাইজোনের দিকে ধাবিত হয় তখন সময় ধীরে ধীরে

দূরবর্তী কোনো পর্যবেক্ষকের তুলনায় স্তিমিত হয়ে আসবে। আর ঠিক হারাইজোনে পৌঁছে গেলেই সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে! তবে এখানেই শেষ নয়, কেউ যেই মুহূর্তে শোয়ার্টচাইল্ড ব্যাসের ভেতর পদার্পণ করবে সাথে সাথে সে কলাপ্স হয়ে শূন্য আয়তনে পৌঁছে যাবে- তবে তার অস্তিত্ব তখনও থাকবে- কারণ সে তখন বিস্তৃতিহীন বস্তু হলেও তার মধ্যে অসীম ঘনত্ব বিদ্যমান!

উপরে বর্ণিত ব্ল্যাক হোলের থিওরি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। নব্বুই বছর পূর্বে কার্ল শোয়ার্টচাইল্ড সর্বপ্রথম এই থিওরি বিজ্ঞানমহলে প্রকাশ করে সবাইকে অবাক করেন। বাস্তবে এরূপ কোনো বস্তু থাকতে পারে তা তখন কেউ কল্পনাও করে নি। কিন্তু এখন ব্ল্যাক হোল থাকার সম্ভাবনা যে আছে তা-তো সবাই মেনেই নিয়েছেন, সাথে সাথে এ পর্যন্ত অনেক সম্ভাব্য সদস্যেরও সন্ধান মিলেছে। আমরা ইতোমধ্যে বলেছি বেশ কিছু গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এই বস্তুটি বিদ্যমান থাকতে পারে বলে শক্তিশালী প্রমাণ মিলেছে। আর এর কারণ হলো কিছু কিছু তারার মৃত্যুর ফাইনেল পরিণতি ব্ল্যাক হোল হতে পারে। আমরা তারাদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনাকালে ব্ল্যাক হোল সৃষ্টির ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

পর্যবেক্ষণ

বিজ্ঞানীরা ১৯৯৪ সালে মহাকাশে স্থাপিত হাবল স্পেইস টেলিস্কোপ [এইচএসটি] ব্যবহার করে ব্ল্যাক হোল থাকার প্রথম সরাসরি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তারা একটি অত্যন্ত গরম গ্যাসীয় ডিস্ক আবিষ্কার করেন- একে তারা 'একরিশন ডিস্ক' [accretion disc] নামকরণ করেছেন। যখন কোনো বস্তুর মহাকর্ষ চতুর্পাশ্বস্থ ঘূর্ণমান বস্তুকে ক্রমান্বয়ে টেনে নিজের দেহের উপর পতিত করে তখন এটাকে একরিশন ক্রিয়া বলা হয়। সুতরাং এরূপ একরিশন ডিস্ক আবিষ্কারের ফলে ব্ল্যাক হোল থাকার প্রমাণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা বলেন, এই ডিস্কটি এম-৮৭ নামক গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে। বস্তুর ভর ও গতি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, কেন্দ্রের বস্তুটির ভর সূর্য থেকে ২.৫ থেকে ৩.৫ বিলিয়ন গুণ বেশী।
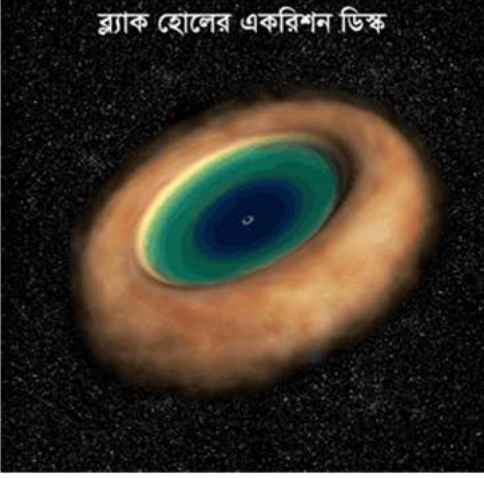
এরপর মাত্র চার বছরের মাথায় এসে প্রায় কয়েক ডজেন গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বিরাট ভরসম্পন্ন বড়ো বড়ো ব্ল্যাক হোল থাকার প্রমাণ মিলেছে। এটাও জানা গেছে যে, গ্যালাক্সির ভর বা ম্যাসের সঙ্গে ব্ল্যাক হোলের ম্যাস সম্পর্কিত। গ্যালাক্সি ভরের দিক থেকে যতো ভারী হবে তার কেন্দ্রে অবস্থানকারী ব্ল্যাক হোলও ততো বেশী ভর ও শক্তিশালীসম্পন্ন হবে। গ্যালাক্টিক ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জনের আগ্রহ এখন খুব বেশী। এ সম্পর্কে বেশী জানলে গ্যালাক্সির জন্ম ও বিবর্তন এবং পরিণতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক গুণ বেড়ে যাবে।

গঠনক্রিয়ার থিওরি

ব্ল্যাক হোল কেনো এবং কিভাবে গঠন হয় তার অনেক থিওরি আছে। আমরা ইতোমধ্যে বর্ণনা করেছি কিভাবে লাল সুপারজায়ান্ট তারার শেষ পরিণতি ব্ল্যাক হোল হতে পারে। ব্ল্যাক হোল শুধুমাত্র এ উপায়েই গঠিত হয় না- অন্তত আধুনিক বিজ্ঞানীদের মত এটাই। আর এই আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইংলিশ বিকলাঙ্গ পদার্থবিদ স্টিপেন হকিং অন্যতম। তার মতে জগতসৃষ্টির কিছুকাল পরেই ব্ল্যাক হোল গঠিত হয়েছিল। ব্ল্যাক হোলে পরিবর্তনও আসতে পারে। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কিপ থোর্ন বলেন, একটি ব্ল্যাক হোলও কলাপ্স হয়ে 'ওয়ার্মহোলে' রূপান্তর হতে পারে। ওয়ার্মহোল হলো স্টারগেটের মতো। এগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের দূরবর্তী কোনো স্থানে ভ্রমণ করা যাবে। তবে এই 'বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক' থিওরি এখনও অনেকে বিশ্বাস করে নিচ্ছেন না- থোর্ন নিজেই বলেছেন, সত্যিকার ওয়ার্মহোলকে বেঁচে থাকতে হলে কিছু 'অজানা বস্তুর' প্রয়োজন দাঁড়াবে, যা আজো আবিষ্কৃত হয় নি।

সপ্তম অধ্যায়
পদার্থবিজ্ঞান

পদার্থবিজ্ঞান হলো বিজ্ঞানের একটি মূল শাখা। এর ব্যাপ্তি বিরাট। বস্তুর মৌলিক গঠনপ্রণালী, গতিবিধি, স্বভাবের মৌলিক শক্তিসমূহ ইত্যাদি ব্যাপার হলো এই বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র। পদার্থবিজ্ঞানের উপর এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র ভূমিকা আকারে কিছু বর্ণনা ছাড়া আর আদৌ তেমন বেশী বলা সম্ভব নয়। তবে ইতোমধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর তথ্যানুসন্ধান-কালে আমরা যা কিছুই বলেছি তা-ও মূলত পদার্থবিজ্ঞানের গণ্ডিসীমার ভেতরে। এই মৌলিক বিজ্ঞানের শাখার উপর সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনার মাধ্যমে বস্তুজগৎ সম্পর্কে পাঠকদেরকে আরো কিছু অবহিত করাই উদ্দেশ্য। এ থেকে ক্ষুদ্রাদিক্ষুদ্র জগতেও সৃষ্টিকৌশলের অপূর্ব নমুনা উন্মোচন হবে।

পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি

ইংরেজীতে এই বিজ্ঞানকে ফিজিক্স [physics] বলে। এটার ব্যাপ্তি অত্যন্ত ব্যাপক। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার অধিকাংশই ফিজিক্সের সাথে সম্পর্কিত। বাস্তবে বহুক্ষেত্রে অন্যান্য প্রধান নেচারেল সাইন্স মূলত পদার্থবিজ্ঞানের শাখা হিসাবেই স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ রসায়নবিদ্যা বা কেমিস্ট্রির কথা বলা যেতে পারে। এই শাখাটি বস্তুর মধ্যস্থ এটম ও মলিকিউলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে। এছাড়া আজকের ভূতত্ত্বের বেশীরভাগ গবেষণা পদার্থবিজ্ঞান-ভিত্তিক। একে ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বা জিওফিজিক্স [geophysics] বলে। আর ইতোমধ্যে বর্ণিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবই মূলত পদার্থবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। এমনকি প্রাণীবিদ্যার মৌলিক গবেষণা তথা কোষ, এটম ও মলিকিউলের স্বরূপ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর অধ্যয়ন পদার্থবিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত- যদিও আমরা একে ভিন্ন শিরোনামে অভিষিক্ত করেছি। নিম্নে আমরা ফিজিক্সের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও গবেষণার ব্যাপ্তি তুলে ধরলাম।

শব্দবিদ্যা [acoustics - একুস্টিক]: শব্দতরঙ্গ বিস্তার।

জ্যোতির্বিজ্ঞান [astronomy - এ্যাস্ট্রনোমি]: মহাকাশবিদ্যা; কজমোলজি; এ্যাস্ট্রফিজিক্স, তারা, গ্রহ উপগ্রহ, গ্যালাক্সি ইত্যাদি মহাবিশ্বের সকল বস্তুর উপর সৃষ্টি, বিবর্তন, গতিবিধি ও অন্যান্য ডাইনামিক্সের উপর গভীর গবেষণা।

পরমাণুবিদ্যা [atomic physics - এটমিক ফিজিক্স]: এটমের কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের উপর গবেষণা।

বিদ্যুৎ ও চুম্বক [electromagnetism - ইলেকট্রমেগনেটিজম]: বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় ফোর্স ফিল্ড; চার্জ কণা ইলেকট্রমেগনেটিক ফিল্ডে কিভাবে ক্রিয়া করে; ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গ কিভাবে বিস্তার করে এবং ইলেকট্রডাইনামিক্স।

মৌলিক কণা বিজ্ঞান: পরমাণুর মধ্যস্থ মৌলিক কণা যেমন ইলেকট্রন, প্রটন, নিউট্রন ইত্যাদির [elementary particle physics - ইলেমেন্টারী পার্টিকল ফিজিক্স] বৈশিষ্ট্য, গঠন, গতিবিধির উপর গবেষণা; উচ্চ এনার্জি ফিজিক্স।

তরলপদার্থ গতিবিধি [fluid dynamics - ফ্লুইড ডাইনামিক্স]: চলন্ত তরল পদার্থ ও গ্যাসের বৈশিষ্ট্য।

ভূ-পদার্থবিদ্যা [geophysics - জিওফিজিক্স]: পৃথিবী নিয়ে গবেষণায় পদার্থবিদ্যার ব্যবহার। এতে সংশ্লিষ্ট আছে বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া, পানিচক্র, মহাসাগরবিদ্যা, ভূ-চুম্বকবিদ্যা, ভূ-কম্পনবিদ্যা এবং আগ্নেয়গিরিবিদ্যা।

গাণিতিক পদার্থবিদ্যা [mathematical physics - মেথেমেটিক্যাল ফিজিক্স]: পদার্থবিদ্যায় গাণিতিক কৌশল কাজে লাগানো।

বলবিদ্যা [mechanics - মেকানিক্স]: বস্তুর মধ্যে শক্তি, বল, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং গতিবিধি।

মলিকিউলবিদ্যা [molecular physics - মলিকিউলার ফিজিক্স]: একের অধিক এটমের তৈরী মলিকিউলের গঠনপ্রণালী ও বৈশিষ্ট্য।

পারমাণবিক-বিদ্যা [nuclear physics - নিউক্লিয়ার ফিজিক্স]: এটমের কেন্দ্রের গঠন, বৈশিষ্ট্য, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং বিবর্তন।

আলোকবিজ্ঞান [optics - অপটিক্স]: আলো সৃষ্টি ও বিকিরণ, বিস্তৃতি, ইলেকট্রমেগনেটিক তরঙ্গ।

প্লাজমা বিজ্ঞান [plasma physics - প্লাজমা ফিজিক্স]: আয়োনাইজ্ড বা বৈদ্যুতিকভাবে চার্জসম্পন্ন গ্যাস নিয়ে গবেষণা।

ক্যুয়ান্টাম বিজ্ঞান [quantum physics - ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্স]: বস্তুর ক্যুয়ান্টাম স্বভাব, এনার্জি এবং আলো।

কঠিন অবস্থার বিজ্ঞান [solid state physics - সলিড স্টেট ফিজিক্স]: কঠিন পদার্থের অবস্থার উপর গবেষণা। এতে আছে ক্রিস্টেলবিদ্যা, সেমিকন্ডাকটার্স, সুপারকন্ডাক্টিভিটি; একে কনডেন্স মেটার ফিজিক্সও বলে।

স্টেটিসটিক্যাল বলবিদ্যা [statistical mechanics]: অনেক পরমাণুর সম্মিলিত বৈশিষ্ট্য গবেষণায় স্টেটিসটিক্যাল মডেল [স্টেটিসটিক্যাল মেকানিক্স] কাজে লাগানো।

তাপবিদ্যা [thermodynamics - থার্মোডাইনামিক্স]: তাপ ও এনার্জি; তাপের চলন; এনার্জি রূপান্তর; বস্তুর মৌলিক অবস্থা [কঠিন, তরল, গ্যাস ও প্লাজমা]।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান : আপেক্ষিকতা

পূর্বে উল্লেখিত পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মাঝে ইতোমধ্যে আমরা একটির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি বলা যায়। এর নাম হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান। তবে অন্যান্য শাখা-প্রশাখার কয়েকটির উপর কিছুটা ছোঁয়া যে হয় নি, তা কিন্তু নয়। তবে এই গ্রন্থে পদার্থবিজ্ঞানের মতো বিরাট বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা মোটেই সম্ভব নয়। উপরের একেকটি বিষয়ের উপর একাধিক বড়ো গ্রন্থ রচনা করলেও কুলাবে না। সুতরাং এ প্রসঙ্গে বাধ্য হয়ে সীমাবদ্ধতার ভেতর থাকতে হচ্ছে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দু'টিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনার উপর পরবর্তী প্যারা ও পৃষ্ঠাসমূহে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সারসংক্ষেপ এই দু'টো মৌলিক বিষয়। এ বিষয় দু'টি হলো:

১. আপেক্ষিকতা [রিলেটিভিটি]
২. ক্যুয়ান্টাম থিওরি

উভয় বিষয়ের উপর একেকটি পরিচ্ছেদ রচনার ইচ্ছে রাখি। শুরু হলো আপেক্ষিকতা নিয়ে। রিলেটিভিটি [relativity] নামে খ্যাত এই থিওরিটি বিংশ শতকের শুরুতে জার্মান বংশোদ্ভুত আমেরিকান পদার্থবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই থিওরি প্রতিষ্ঠার মূল কারণ ছিলো আপেক্ষিক গতি বা রিলেটিভ মোশনকে ব্যাখ্যা করা। তবে আইনস্টাইন এ থেকেই শেষ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা তথা পুরো বিজ্ঞানজগতে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। সুতরাং আসুন এই জগত-কাঁপানো থিওরিটি আসলে কি তা আমরা জেনে নিই। তবে আগেই সতর্ক করে দিচ্ছি, আপেক্ষিকতা খুব জটিল একটি থিওরি। এর পেছনে কঠিন গাণিতিক গবেষণা বিদ্যমান। এটা অতি সহজে অনুধাবন হবে না। তবে প্রয়োজন মনে করলে পরিচ্ছেদটি একাধিকবার পাঠ করে নিলে হৃদয়ঙ্গম হবে- এটা আশা করা যায়। আমি অবশ্য যেটুকু সম্ভব সরল ভাষায় বুঝিয়ে বলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি।

রিলেটিভিটি দ্বারা বস্তু [matter], উদ্যম [energy], মহাশূন্য [space], সময় [time] ও মহাকর্ষ [gravitation] এবং ত্বরণের [acceleration] উপর মৌলিক থিওরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে আপেক্ষিকতাবাদ কী তা বুঝতে যেয়ে প্রথমে আমাদেরকে এর আগের পদার্থবিজ্ঞানের থিওরি সম্পর্কে জানতে হবে। একে বলে ‘ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স’ [classical physics]।

ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স

রিলেটিভিটি থিওরির পূর্বে যেসব ফিজিক্যাল আইন-কানুন সবাই মেনে নিয়েছিলেন তা-ই ক্লাসিক্যাল আইন-কানুন তথা পদার্থবিদ্যা। এটার প্রবর্তক ছিলেন সপ্তদশ শতকের ইংরেজ গাণিতিক আইজাক নিউটন []। তার প্রিন্সিপাল্স অব মেকানিক্স [principles of mechanics] নিউটনিয়ান মেকানিক্স নামেও খ্যাত। আজকাল রিলেটিভিটিকে রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্সও [Relativistic Mechanics] বলে। এই উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তবে বলাই বাহুল্য উভয় সিস্টেমই ব্যবহারযোগ্য। মনে করুন আপনি একটি স্নোকার বলে কিউ দিয়ে গুঁতো মারলেন। কিউ বল অবজেক্ট বলকে হিট করার পর এটির গতিবিধি কি হবে, তা নিউটনের আইন কিংবা আইনস্টাইনের আইন এই উভয়টি ব্যবহার করে খুব কাছাকাছি ফলাফলই পাওয়া যাবে। বাস্তব ক্ষেত্রে পারতপক্ষে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের ব্যবহারই অনেকটা সহজ। এর কারণ হলো গণিতসহ ক্লাসিক্যাল গবেষণা মোটামুটি সবার জন্য সহজবোধ্য। আর এই কারণেই মৌলিকভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য তথা ক্লাসিক্যাল ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত এবং রিলেটিভিটির ক্ষেত্রে ত্রুটিমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথমটির উপর অধ্যয়ন এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। রিলেটিভিটি প্রকাশ হওয়ার শত বছর পরও আমাদের সন্তানরা স্কুল-কলেজে নিউটনিয়ান মেকানিক্স শিখছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা মনে করা উচিৎ নয় যে, কঠিন আইনস্টানিয়ান মেকানিক্স অধ্যয়ন নিষ্প্রোয়জন। উপরের দৃষ্টান্তে যদি সেই স্নোকার বলটি অত্যধিক উচ্চ গতিসম্পন্ন হয় তাহলে আর নিউটনিয়ান মেকানিক্সে কাজ হবে না। মনে করুন একটি অবজেক্ট বলকে হিট করার পর এর গতি আলোকের কাছাকাছি গতিতে চলতে থাকলো। এ অবস্থায় উভয় থিওরি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল দেবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়,

এই দু'টি ভিন্ন ফলাফলের কোনটি সঠিক হবে? যেহেতু এগুলো ভিন্ন তাই উভয় ফলাফল তো সঠিক হওয়ার কথা নয়। আজকের সকল বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে একমত যে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলই হবে সঠিক আর ক্লাসিক্যাল থিওরি দ্বারা নির্ণিত ফলাফল হবে ভুল।

সাধারণত গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে দু'টি ফলাফলের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে তা নির্ভর করে একটি বিষয়ের উপর- যার আবিষ্কারক ছিলেন ডাচ পদার্থবিদ হেনরিক আন্টন লরেঞ্জ ও আইরিশ পদার্থবিদ জর্জ ফ্রান্সিস ফিটজারেল্ড। উল্লেখ্য তাদের এই আবিষ্কার ছিলো আইনস্টাইনের অনেক পূর্বে উনবিংশ শতাব্দিতে। এই ফেক্টরকে গ্রীক অক্ষর বিটা [β] দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। যে সমীকরণ থেকে এটা নির্ণিত হবে তা হলো: $\beta = SQR[1-v^2/c^2]$

উপরের সমীকরণে SQR- অর্থ স্কোয়ার রুট- তার মানে ব্র্যাকেটের ভেতরের সবকিছুর স্কোয়ার রুট নিতে হবে, v = ভেলোসিটি এবং c হলো আলোকের গতি। এই সমীকরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে বিটা ফেক্টর সাধারণ গতির ক্ষেত্রে তেমন বেশী পার্থক্য দেখায় না। এ পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্রবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ যে গতি নিয়ে বাস্তবে আমাদেরকে গবেষণা করতে হয় তা ১.৬ কিমি/সে [১ মাইল/সেকেন্ড]। একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে সাধারণ রসায়নিক বস্তু যেমন হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা সর্বোচ্চ যে গতিতে তুলা যায় তা মাত্র ২৯ কিমি/সে [বা ১৮ মাইল প্রতি সেকেন্ড]। শেষোক্ত গতি ব্যবহার করলেও বিটা ফেক্টরে পার্থক্য হবে মাত্র ৫ বিলিয়ন ভাগের একভাগ! সুতরাং পৃথিবীর উপরে গঠিত সাধারণ ত্বরণ, গতি ইত্যাদি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ব্যবহার আমাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু গতি যখন খুব উচ্চ পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছুবে- যেমনটি হয়ে থাকে মহাকাশ বিজ্ঞানে, তখন রিলেটিভিস্টিক গবেষণা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় আমাদের ফলাফল ভুল হয়ে যাবে। খুব উচ্চ দূরত্ব নিয়ে গবেষণাকালেও রিলেটিভিটির ব্যবহার একান্ত জরুরী।

রিলেটিভিটির আবির্ভাবের পূর্বেই কিন্তু ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের মধ্যে যে মৌলিক ভুল বিদ্যমান তা ধরা পড়ে যায়। এই ভুল ধরার বছরটি ছিলো ১৮৮৭ সাল। আর এই ভুল আবিষ্কারের মূলে ছিলো প্রখ্যাত এক পরীক্ষা।

মাইকেলসন-মরলি পরীক্ষা

আমেরিকান দুই বিজ্ঞানী আলবার্ট মাইকেলসন [১৮৫২-১৯৩১] ও এডওয়ার্ড উইলিয়াম্স মরলি [১৮৩৮-১৯২৩] এই পরীক্ষা করেছিলেন বলে তাদের নামানুসারে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত সবাই ভাবতো 'ইথার' [ether] নামক এক কাল্পনিক বস্তু দ্বারা সকল শূন্যস্থান পরিপূর্ণ। মনে করা হতো এই বস্তুর উপর দিয়ে ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন ও আলোকরশ্মি ট্রান্সমিট [transmit] হয়। অর্থাৎ ওসব তরঙ্গের মিডিয়াম বা মাধ্যম হলো ইথার। মাইকেলসন ও মরলি ভাবলেন একটি পরীক্ষা করে দেখা যাক, এই ইথারের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর গতির রেইট কি হয়। নিচের নক্সায় আমরা এই পরীক্ষার মৌলিক দিক তুলে ধরেছি।
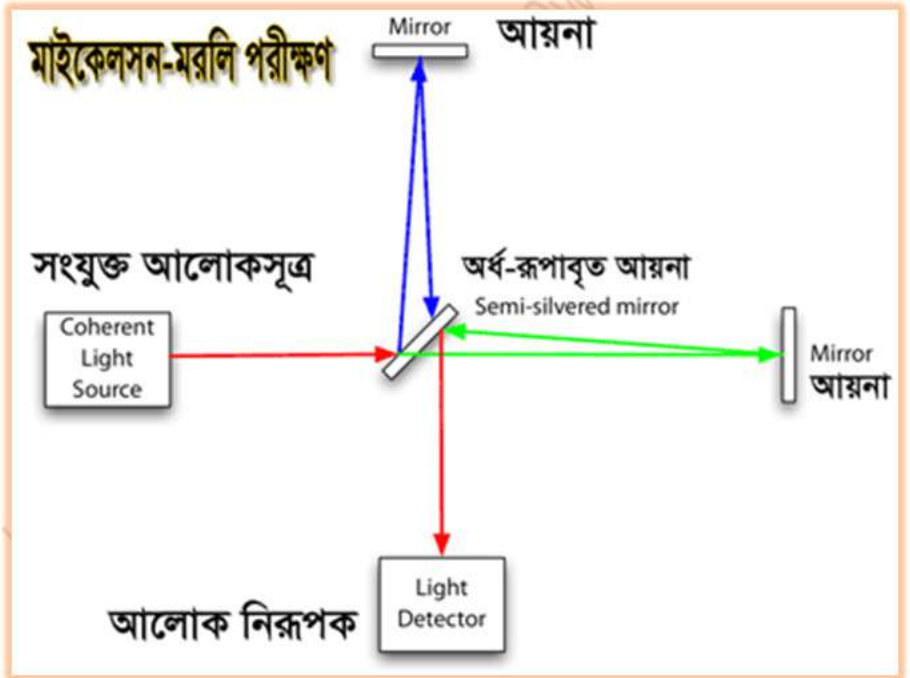
সূর্য যদি মহাকাশে অনড় অবস্থায় থাকে তাহলে এর চতুর্দিকে কক্ষপথে ঘূর্ণমান পৃথিবীর অপরিবর্তনীয় গতি হবে ২৯ কিমি/প্রতি সেকেন্ড [১৮ মাইল/সে]। তবে সূর্য তো আসলে মহাকাশে অনড়-স্থির অবস্থায় নেই; সূর্যসহ পুরো সৌরজগৎ গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সুতরাং বৎসরের কিছু সময় সৌরজগতের গতির ফলে পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণন গতি বাড়বে আর কিছু সময় কমবে। কারণ, আমাদের পৃথিবী সর্বদাই ঘূর্ণনের সময় তার চলনের দিক পরিবর্তন করে যাচ্ছে। কিন্তু মাইকেলসন-মরলি পরীক্ষার ফলাফল সম্পূর্ণ আশাতীত ও অদ্ভুত ছিলো। তারা দেখলেন ইথারের উপর পৃথিবীর গতি পুরো বছরব্যাপীই শূন্য।

মাইকেলসন-মরলি পরীক্ষা দ্বারা যা মাপা হয়েছিল তা ছিলো দু'টি ভিন্ন দিকে গতিশীল আলোকের গতি। একটি আলোকরশ্মি যদি মহাকাশের মধ্যে ৩,০০,০০০ কিমি/সে [১,৮৬,০০০ মা/সে] বেগে ছুটে চলে আর কোনো পর্যবেক্ষক একই দিকে ২৯ কিমি/সে [১৮ মা/সে] বেগে চলে তাহলে ঐ পর্যবেক্ষকের নিকট দিয়ে আলোকরশ্মির গতি ২,৯৯,৯৭১ কিমি/সে [অর্থাৎ: ৩০০০০০ - ২৯] বেগে চলে যাওয়ার কথা। আর এই পর্যবেক্ষক যদি আলোকের গতির বিপরীত দিকে একই গতিতে চলমান থাকে তাহলে আলোকরশ্মির গতি তার নিকট দিয়ে ৩,০০,০২৯ কিমি/সে [অর্থাৎ: ৩০০০০০ + ২৯] হওয়ার কথা। কিন্তু মাইকেলসন-মরলি পরীক্ষা এই পার্থক্য সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। পরীক্ষার ব্যর্থতা কোনো ভাবেই বুঝানো সম্ভব হলো না।

এরপর ১৮৯০-এর মাঝামাঝি দিকে হেনড্রিক লরেঞ্জ [১৮৫৩-১৯২৮] ও ফ্রানসিস ফিটজারেল্ড [১৮৯৬-১৯৪০] এই পরীক্ষার ব্যর্থতার কারণ বুঝাতে একটি থিওরি প্রকাশ করেন। এই থিওরির নাম লরেঞ্জ-ফিটজারেল্ড কন্ট্রাকশন। তারা বললেন যখন কোনো বস্তু মহাকাশে গতিশীল হয় তখন গতির দিকে এর দৈর্ঘ্য বিটা ফেক্টর হিসাবে হ্রাস করে। সুতরাং মাইকেলসন-মরলি পরীক্ষার ইতিবাচক ফলাফলের একটি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। কারণ তাদের মতে, এই দৈর্ঘ্য হ্রাস হওয়ার ফলে আলোকরশ্মিটি একই টাইমের মধ্যে হ্রাসকৃত দূরত্ব ভ্রমণ করেছে- অর্থাৎ কিছুটা কম গতিতে চলেছে। কিন্তু এই পার্থক্য নির্ণয় সম্ভব হয় নি এ কারণে যে, পরীক্ষায় ব্যবহৃত যন্ত্রাদিও যেহেতু চলমান ছিলো তাই ওগুলোও দৈর্ঘ্যে হ্রাস

হওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। লরেঞ্জ-ফিটজারেল্ড কন্ট্রাকশন থিওরি কিন্তু বিজ্ঞানীদের মনঃপুত হলো না। কারণ এই থিওরি কোনো বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে সত্যায়ন করা সম্ভব ছিলো না।

স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি

মাইকেলসন-মরলি পরীক্ষার ব্যর্থতা ও পরবর্তীতে লরেঞ্জ-ফিটজারেল্ড কন্ট্রাকশন থিওরি দ্বারা এর কারণ বুঝানোর প্রচেষ্টার মূলে একটি ব্যাপার বিশ্বাস করা হয়েছিল যে, এবস্যুলুট বা চুড়ান্ত গতি বিদ্যমান। আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ থিওরি প্রকাশ করেন। এতে তিনি তখনও সর্বজনস্বীকৃত এবস্যুলুট গতি মূলত অমূলক বলে সবাইকে অবগত করলেন। বাস্তবে এরূপ কোনো গতি এই মহাবিশ্বে নাই। সব গতি আপেক্ষিক বা রিলেটিভ। তিনি বললেন জগতের কোনো বস্তুই মহাশূন্যে দৃঢ় ও চুড়ান্তভাবে স্থির অবস্থায় নেই। তবে স্থানীয়ভাবে যে কোনো বস্তু ও এর গতিকে আমরা 'ফ্রেম অব রেফারেন্স' [frame of reference] হিসাবে সাব্যস্ত করে নিতে পারি- দৃষ্টান্তস্বরূপ সূর্যের কথা বলা যেতে পারে। সুতরাং আমরা যদি বলি, 'ট্রেনটি স্টেশন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে' এবং 'স্টেশনটি ট্রেনটি পেরিয়ে চলে যাচ্ছে' তাহলে উভয় কথাই সত্য হবে। এ কথাটি অদ্ভুত মনে হলেও যখন আমরা বুঝতে সক্ষম হবো যে পৃথিবীর দু'টি গতি আছে- সে স্টেশনসহ তার আহ্নিক [দৈনিক] গতির ফলে স্টেশনটি নিয়ে ঘুরছে এবং বার্ষিক গতির ফলে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে। শুধু তাই নয় পুরো সৌরজগতও ছায়াপথের চতুর্দিকে উচ্চগতিতে প্রদক্ষিণরত আছে। এখন চিন্তা করুন ঐ ট্রেন ও স্টেশনের মধ্যে ক'টি গতি একই সঙ্গে ক্রিয়া করছে? সুতরাং আইনস্টাইনের মতে সব গতি মূলত আপেক্ষিক- এবস্যুলুট বা দ্রুত সত্য চুড়ান্ত কোনো গতি নেই।

আইনস্টাইন আরো বললেন, এই মহাবিশ্বে একটি মাত্র গতি এবস্যুলুট আর তাহলো আলোকের গতি। এই গতি শূন্যস্থানে সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে। তিনি এটাও বললেন, ভিন্ন গতিতে চলমান পর্যবেক্ষকের নিকটও আলোকের গতি অপরিবর্তিত থাকবে। সুতরাং আমরা যদি কল্পনা করি দু'জন পর্যবেক্ষক একে অন্য থেকে ১,৬০,০০০ কিমি/সেকেন্ড আপেক্ষিক গতিতে চলমান থাকে তথাপি উভয়ে

যদি একই আলোকরশ্মির গতি মাপে তাহলে উভয়ের ফলাফল হবে ৩ লক্ষ কিমি/সেকেন্ড। এ কারণেই মাইকেলসন-মরলি ফলাফল ঐরূপ ছিলো। নিচের চিত্রে কিছু গণিত ও ব্যাখ্যাসহ আমরা বিষয়টি তুলে ধরেছি। ভালো করে স্ট্যাডি করুন।
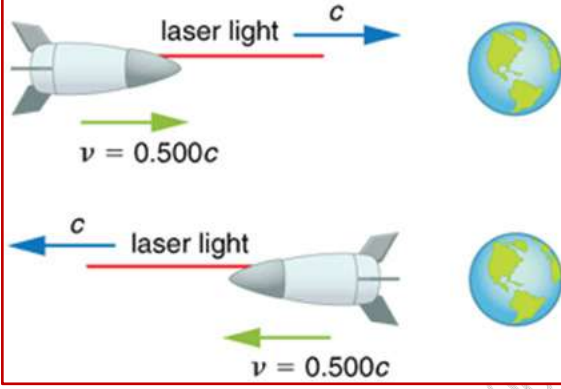
মনে করুন একটি মহাকাশযান পৃথিবীর দিকে আলোকের অর্ধ-গতিতে ধেয়ে আসছে। মাকাশে থাকতেই ক্যাপ্টেন একটি লেইজার সিগনাল প্রেরণ করলেন পৃথিবীপানে। যান থেকে আলোক রশ্মি আলোকের গতি তথা c গতিতে পৃথিবীপানে আসবে বলে ক্যাপ্টেন দেখবেন। তবে বাস্তবে পৃথিবীতে কোন্ গতিকে রশ্মিটি ছুটে আসবে? আমরা এ গতি বের করতে রিলেটিভিস্টিক গতি সমীকরণ ব্যবহার করতে পারি:

$$u = \frac{v + u'}{1 + \frac{vu'}{c^2}}$$

এ সমীকরণে u = একজন পর্যবেক্ষকের নিকট বস্তুর আপেক্ষিক ভেলোসিটি, v = আমাদের থেকে অপর কারোর আপেক্ষিক ভেলোসিটি, u^1 = অপর পর্যবেক্ষকের সাথে আপেক্ষিক ভেলোসিটি এবং c = আলোকের গতি। এখানে আমাজের অজানা মানটি হলো u ।

আমাদের সমস্যা সমাধানে এবার আমরা উক্ত সমীকরণে বিভিন্ন ভেলোসিটি সাবসস্টিটিউট (প্রতিকল্প) করতে পারি। যথা:

v=0.500c; *u′=c;* এবার সমাধান পেয়ে যাবো (ডানের চিত্র)। তাহলে বুঝা গেলো, আলোকের গতি চলন্ত এবং আপেক্ষিক স্থির পর্যবেক্ষক- এ উভয়ের

$$u = \frac{(0.5 \times c) + c}{1 + \frac{(0.5 \times c) \times c}{c^2}}$$

$$= \frac{(0.5 + 1)\,c}{1 + \frac{0.5c^2}{c^2}}$$

$$= \frac{1.5c}{1 + 0.5}$$

$$= c$$

নিকট সমান। অন্যকথায় আলোকের গতি অপরিবর্তনশীল বা এ্যাবসুলুট।

শুধু তাই নয় আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সময়ও মূলত আপেক্ষিক। এবস্যুলুট সময় বলতে কিছু নেই। সময় কারো জন্য আস্তে চলে আবার আরেক জনের জন্য দ্রুত চলে। সব নির্ভর করে ঐ ব্যক্তির নিজের গতির উপর।
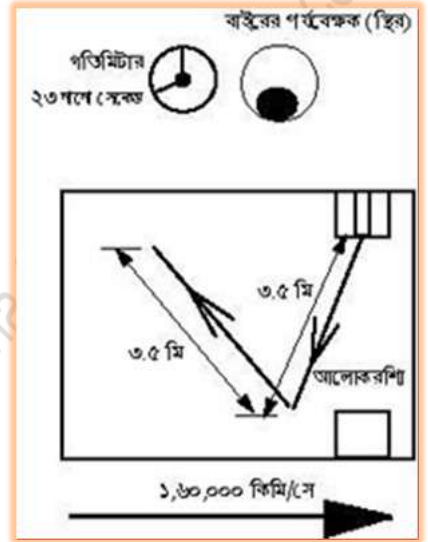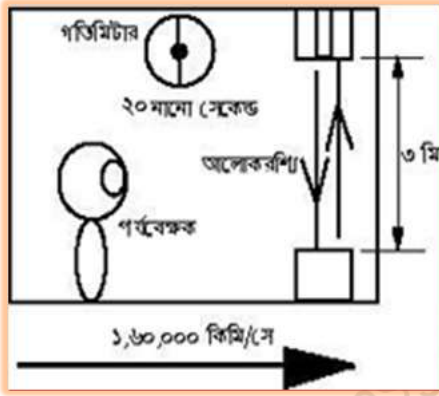
উপরের প্রথম [বায়ের] ছবিতে মহাকাশে ভ্রমণরত একজন এ্যাস্ট্রনাট চোখের সামনে স্থাপিত একটি আলোকরশ্মির পাল্স দেখলো। এটা উপর থেকে নীচে নেমে আবার উপরে উঠলো। সে তার গতিমিটার দ্বারা রশ্মির গতি মেপে দেখলো, এটা উপর থেকে নীচে নেমে উপরে উঠতে ঠিক ২০ নানো সেকেন্ড সময় নিয়েছে [এক নানো সেকেন্ড = ১ সেকেন্ডের ১ বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ]। তার মহাকাশযান এই গতি মাপার সময় যদিও ১ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড গতিতে চলমান ছিলো, তথাপি তার চোখে দৃশ্যমান হলো ঐ আলোকরশ্মি সোজা নীচের দিকে নেমে আবার উপরের দিকে সোজা উঠেছে। এবার এই একই অবস্থা বাইরে

আপেক্ষিকভাবে স্থির একজন এ্যাস্ট্রনাট পর্যবেক্ষণ করলো [দ্বিতীয় ডানের ছবি]। সে দেখবে আলোকরশ্মিটি আড়াআড়িভাবে নীচে নেমে আবার উপরে উঠে গেল। তার গতিমিটারে দেখাবে ২৩ নানো সেকেন্ড এই ওঠানামার জন্য অতিবাহিত হয়েছে। সুতরাং একই পাল্স উভয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হলো। ভেতরের এ্যাস্ট্রনাটের নিকট পাল্স ২ x ৩ মিটার = ৬ মিটার ভ্রমণ করতে সময় লাগিয়েছে = দূরত্ব ভ্রমণ/ আলোকের গতি = ৬/০.৩ মি/নানো সেকেন্ড = ২০ নানো সেকেন্ড। আর যেহেতু বাইরের এ্যাস্ট্রনাটের নিকট পাল্সটি দৃশ্যত ৩.৫ x ২ = ৭ মিটার ভ্রমণ করেছে তাই ভ্রমণের সময় লেগেছে: সময় = দূরত্ব ভ্রমণ / আলোকের গতি = ৭/ ০.৩ মি/নানো সেকেন্ড = ২৩ নানো সেকেন্ড। এই অতিরিক্ত ৩ নানো সেকেন্ড কোত্থেকে এলো? বাইরের এ্যাস্ট্রনাট সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ভেতরের এ্যাস্ট্রনাটের নিকট সময় ধীরে চলে। সুতরাং সময়ের গতিও নির্ভর করে বস্তুর নিজস্ব গতির উপর। আলোকের কাছাকাছি গতিতে চললে বাইর জগতের আপেক্ষিক স্থির পর্যবেক্ষকের নিকট ঐ গতিশীল বস্তুর উপর দিয়ে সময় ধীরে চলছে বলে পরিলক্ষিত হবে।

আইনস্টাইন অবশ্য আলোকের গতি অপরিবর্তিত রেখে রূপান্তর গ্রহণ করে নিয়েছেন যদিও তাকে এটা নতুন ধাঁচে সাজাতে হয়েছে। আপেক্ষিক পরিবর্তন মুতাবিক গতির দিকের রেখা পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে গতিশীল বস্তুর ভর ও সময়ের মধ্যে পরিবর্তন ঘটবে। বস্তুর ম্যাস বা ভর বাড়বে- আলোকের যতো কাছাকাছি গতিতে বস্তুটি চলবে তার মধ্যস্থ ভরও ততো বেশী বাড়তে থাকবে- শেষ পর্যন্ত আলোকের গতিতে পৌঁছে তা হবে অসীম। এ কারণেই বলা হয় আলোকের কাছাকাছি গতিতে কোনো বস্তু চলতে পারবে না। এর কারণ হলো অসীম ভরসম্পন্ন বস্তুকে চালাতে হলে অসীম এনার্জির প্রয়োজন যা বাস্তব ক্ষেত্রে অর্জন অসম্ভব। আর ঘড়ির গতি যে কমে আসে তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। আইনস্টাইন বলেছেন, বস্তুর ভর বিটা ফেক্টর অনুযায়ী বাড়বে- যা উপরে উল্লেখিত সমীকরণে দেখানো হয়েছে।

১৯০৫ সালের ৮ বছর পূর্বে ১৮৯৭ সালে বৃটিশ পদার্থবিদ জোসেফ জন থম্পসন (১৮৫৬-১৯৪০) ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন। আইনস্টাইনের থিওরির

একটি ফলাফল পরীক্ষার সুযোগ অনুসন্ধান করা হচ্ছিলো- আর এই ইলেকট্রন দ্বারা বস্তুর ভর বাড়ার ব্যাপারটি পরীক্ষা করার সম্ভাবনা উন্মোচন হলো। কারণ, তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন বস্তু থেকে বিকিরণ হিসাবে এই ইলেকট্রন আলোকের কাছাকাছি গতিতে বেরিয়ে আসে।

আনস্টাইনের থিওরী অনুযায়ী বিটা ফেক্টর ০.৫ পর্যন্ত হতে পারে এরূপ গতিশীল ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এবং এর ফলে ইলেকট্রনের ভর দ্বিগুণ হওয়ার কথা- যদি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সঠিক হয়ে থাকে। এখন সমস্যা হলো গতিশীল ঐ ইলেকট্রনের ভর কিভাবে মাপা যায়? একটি সহজ উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। ইলেকট্রনকে একটি মেগনেটিক ফিল্ডের ভেতর চলমান রাখা হলে এ সমস্যার সমাধান মিলবে। ইলেকট্রনের ভর যতো বেশী হবে তার মধ্যস্থ ইনারশা শক্তি ততো বেশী হবে এবং এর ফলে ঐ মেগনেটিক ফিল্ডে এর গতিপথের মধ্যে বক্রতাও ততো কমে আসবে। অন্যকথায় মেগনেটিক ফিল্ড দ্বারা এর গতিবিধির মধ্যে বক্রতা আনা যায়। আর কি পরিমাণ ফিল্ড শক্তি দ্বারা কি পরিমাণ বক্র করা সম্ভব সে হিসাব থেকে আমরা সহজেই ইলেকট্রনের ম্যাস বের করতে পারি। এই উপায়ে বার বার পরীক্ষা দ্বারা আইনস্টাইনের হিসাবমতো গতিশীল বস্তুর ম্যাস বৃদ্ধির ব্যাপারটি নাটকীয়ভাবে প্রমাণিত হলো। ইলেকট্রনের মধ্যস্থ কিনেটিক এনার্জি [গতির ফলে সৃষ্ট এনার্জি] নিম্নের সমীকরণ মুতাবিক ভর বা ম্যাসে রূপান্তরিত হলো: এনার্জি [E] = ম্যাস [m] x আলোকের গতি [$c^২$।

আইনস্টাইনের থিওরি অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে যাকিছু তথ্য তুলে ধরেছি তা থেকে পাঠকরা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, আইনস্টাইনের পুরো থিওরিটি মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের উপর নির্ভরশীল। এই আবিষ্কারটি হলো সমগ্র মহাবিশ্বের মধ্যে কোনো স্থির বিন্দুর অস্তিত্ব নেই। আর এ কারণেই গতি নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের গতির উপর। পর্যবেক্ষকের গতির মধ্যে তারতম্য দেখা দিলে দৃশ্যমান বস্তুর গতির মধ্যেও তারতম্য পরিলক্ষিত হবে। বিষয়টি বুঝার জন্য পরের পৃষ্ঠার তিনটি চিত্র গবেষণা করে দেখা যাক।
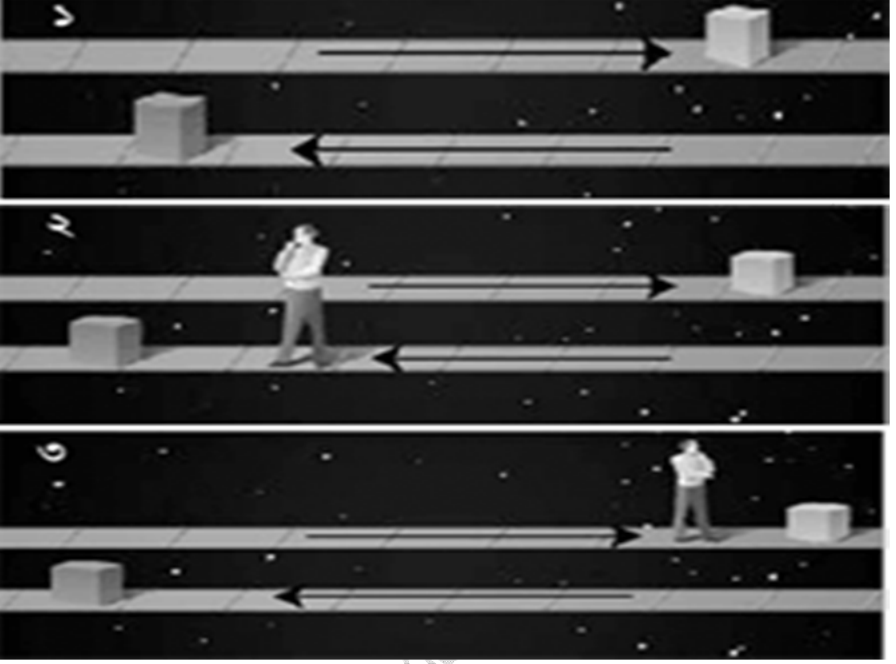
চিত্র-১-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাকাশে স্থাপিত দু'টি কল্পিত কনভেয়ার বেল্ট চলন্ত আছে। বেল্টের উপরস্থ বাক্স দু'টো বিপরীত দিকে যাচ্ছে। একজন পর্যবেক্ষক উপরে এসে তাকালে দেখবে উভয় বাক্স একই গতিতে- [মনে করুন] ৫০ কিমি / ঘণ্টায় চলমান আছে। এবার আমরা দ্বিতীয় [চিত্র-২] ছবিটির প্রতি দৃষ্টি দেবো। এখন ঐ পর্যবেক্ষক নীচের বেল্টের উপর নেমে পড়লো। এবার সে দেখবে তার বেল্টের বাক্সের গতি ০। কিন্তু অপরটির গতি ১০০ কিমি/ঘণ্টা দৃশ্যমান হবে [নিজের গতি + ঐ বেল্টের গতি]। এবার আমরা তৃতীয় চিত্রটি [চিত্র-৩] পরীক্ষা করে দেখাবো। এটাও দ্বিতীয়টির মতো কিন্তু এখন ঐ পর্যবেক্ষণ অপর [উপরের] বেল্টে দাঁড়ানো আছে। এবার সে লক্ষ্য করবো তার পার্শ্বস্থ বাক্সের গতি ০ এবং অপরটি ১০০ কিমি/ঘণ্টা [নিজের গতি + বেল্টের গতি] বেগে বিপরীত দিকে যাচ্ছে। একই বস্তুর মধ্যে পর্যবেক্ষকের নিজের অবস্থান ও গতির ভিন্নতার কারণে এই ভিন্ন গতি পরিলক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটি কিভাবে বুঝানো যায়? আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি বলে, পর্যবেক্ষকের দৃশ্যত গতির পার্থক্য তিন অবস্থায়ই মূলত অভিন্ন।

এখানে আসল তথ্যটি হলো বাক্স দু'টোর মধ্যে আপেক্ষিক গতি বিদ্যমান। তারা একে অন্য থেকে ১০০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে আপেক্ষিকভাবে চলমান। গতির মাত্রা ফ্রেম অব রেফারেন্স থেকে নির্ণিত হয়েছে। এই চিত্রগুলো এটাই প্রমাণ করছে যে, যে পয়েন্ট অব রেফারেন্স থেকে আমরা গতিটি মেপে নেবো সেই পয়েন্টও চলমান থাকতে পারে- বাস্তবে তা-ই হয়, যেহেতু এই মহাবিশ্বে কোনো স্থির বিন্দু নেই।

উপরের কল্পিত পর্যবেক্ষকের নিজের অবস্থান ও গতির উপর নির্ভর করছে সে কোন্ বাক্সের মধ্যে কোন্ গতি পর্যবেক্ষণ করবে। জগতে এমন কোনো স্থির বিন্দু নেই যেখানে দাঁড়িয়ে কেউ বলতে পারবে সবকিছু কিভাবে অপর সবকিছুর রেফারেন্সে গতিশীল আছে। আইনস্টাইন বলেন কোনো বস্তুতে একই গতি থাকলেই একে ভিন্ন রেফারেন্স থেকে ভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। আর সকলের ক্ষেত্রেই এই পর্যবেক্ষণ সঠিক হবে। এক কথায় কোনো বস্তুর মধ্যে এবস্যুলুট বা বাস্তব ধ্রুব সত্য কোনো গতি নেই। সব গতি আপেক্ষিক, কারণ স্থির কোনো বিন্দু নেই যেখান থেকে বস্তুর এবস্যুলুট গতি মাপা যায়।

আপেক্ষিকতার ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত যা বর্ণনা করেছি তা থেকেই আশারাখি পাঠকরা ব্যাপারটি অনুধাবন করে নিয়েছেন। এরপরও আরও একটু বুঝিয়ে বললে কথাটি সুস্পষ্ট হবে- এটা সঠিকভাবে বুঝার উপর নির্ভর করে আপেক্ষিকতাবাদকে বুঝা। মনে করুন আপনি পৃথিবীর উপর কোনো একটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার পাশকেটে একটি গাড়ি চলে গেল ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে। এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখবো অপর একাধিক পর্যবেক্ষক এই একই গাড়ির গতি কি দেখলো? প্রথমত আপনার নিজের ফ্রেম অব রেফারেন্স কি জেনে নিন। আপনি ভাবছেন স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন- কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। কারণ মহাকাশে অবস্থিত একজন পর্যবেক্ষক দেখবে আপনি পৃথিবীর দৈনিক গতির সাথে ২৭ কিমি প্রতি মিনিট বেগে পূর্ব দিকে ছুটে চলছেন। অপর আরেক পর্যবেক্ষক লক্ষ করবে আপনি সূর্যের চতুর্দিকে প্রতি ঘণ্টায় ১,০৭,০০০ কিমি বেগে পৃথিবীর বাৎসরিক প্রদক্ষিণ গতির সাথে দ্রুত ঘুরছেন। এখানেই শেষ নয়, মহাকাশে সৌরজগতের বাইর থেকে একজন পর্যবেক্ষক দেখবে আপনি ছায়াপথের চতুর্দিকে পুরো সৌরজগতের সাথে প্রতি সেকেন্ডে ২৪০ কিমি গতিতে ছুটে চলছেন। সুতরাং

আপনার নিজের মধ্যে বেশ ক'টি গতি বিদ্যমান কিন্তু আপনি মনে করছেন স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন! একই অবস্থা ঐ আপনার নিকট ৩০ মাইল/ঘণ্টা চলমান গাড়িটিরও। এর গতি ঐ ভিন্ন পর্যবেক্ষকরা ভিন্নভাবে দেখবে। কারো নিকটই একই গতি পরিলক্ষিত হবে না। অথচ প্রত্যেকের দেখা ও গতি মাপা সঠিক। তাহলে গাড়ির আসল গতি কোনটি? এক কথায় যাবতীয় গতি লকেল- এবস্যুলুট গতি বলতে কিছু নেই। আশ্চর্যের বিষয় আইনস্টাইনের পূর্বে এই সাধারণ ব্যাপারটি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।
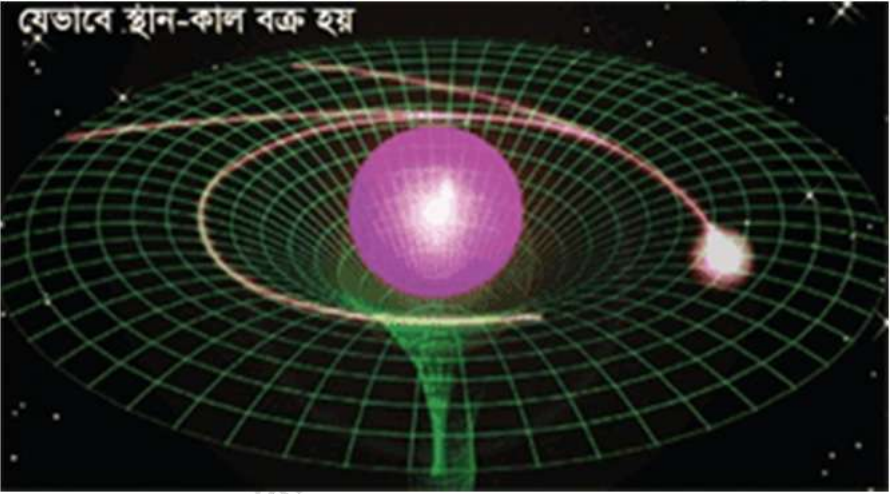
আইনস্টাইন আরো একটি ব্যাপার অনুধাবন করলেন, আর তাহলো কোনো ঘটনা ঠিক কখন ঘটেছে তা বলা সম্ভব নয় যদি আমরা ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে তা-ও নির্ণয় না করি। জগতের প্রতিটি কণা কিংবা বস্তুকে আমরা এক বা একাধিক 'জগতরেখা' দ্বারা বুঝাতে পারি যা বস্তুর অবস্থান সময় ও স্থান দ্বারা বুঝানো যায়। এখন দুই বা ততোধিক জগতরেখা যদি একটা আরেকটাকে ক্রস করে যায় তাহলে একটি 'ঘটনা' ঘটে গেল। আর জগতরেখা যদি এভাবে একে অন্যকে ক্রস না করে তাহলে বস্তুর মধ্যে কোনো কিছু ঘটলো না; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থান কোনো মুহূর্তে বুঝিয়ে দেওয়ার মধ্যে আর কোনো অর্থ থাকে না, এটা জানা কারোর জন্য জরুরীও নয়। দু'টি ঘটনার মধ্যে 'দূরত্ব' কিংবা 'কালান্তর' সঠিকভাবে বুঝিয়ে

দেওয়া যায় স্থান ও কাল দ্বারা। কিন্তু শুধু সময় বা শুধু স্থান দ্বারা মোটেই বুঝানো যাবে না। এসব কথার মূলে এটাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, জগতের যাবতীয় ঘটনা ঘটে চার-বিস্তৃতিসম্পন্ন স্থান-কালের মধ্যে। আইনস্টাইনের পূর্বে সবাই বলতো এসব ঘটনা ঘটে সচরাচর দৃশ্যমান তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন স্থানে [দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা]। তিনি বললেন, সব ঘটনা ঘটে স্থান-কাল কন্টিনিউয়ামে [space-time continuum]। কাল বা সময়কে বাদ দিয়ে কোনো ঘটনার আসল স্বরূপ বুঝা অসম্ভব। এসব ব্যাখ্যা এসেছে বিশেষ থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকে।

জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি

বিশেষ থিওরি প্রকাশের ১০ বছর পর ১৯১৫ সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আরেকটি বিশ্ব-কাঁপানো থিওরি প্রকাশ করলেন। এটি ছিলো মহাকর্ষের উপর। এই থিওরি দ্বারা তিনি নিউটনের প্রতিষ্ঠিত মহাকর্ষ থিওরিকে সম্পূর্ণরূপে ওলট-পালট করে দিলেন।

আইনস্টাইনের এই থিওরির মূলে আছে 'প্রিন্সিপাল অব ইক্যুইভেলেন্স' [principle of equivalence] বা সমতা মূলনীতি। এই নীতি অনুযায়ী মহাকর্ষ থেকে সৃষ্ট ফোর্স ও ত্বরণ থেকে সৃষ্ট ফোর্সের মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য বিদ্যমান নেই, উভয়েরই ফলাফল বা ক্রিয়া মূলত সমান। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই মহাকাশে ভ্রমণকালে কোনো স্পেইস শীপের ভেতর 'কৃত্রিম মধ্যাকর্ষণ' সৃষ্টির ধারণা জন্ম নিয়েছে। চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি অঙ্কন করে বুঝানোর চেষ্টা করেছি।

পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া চারটি চিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিন। এর প্রথমটি [বায়ের উপরের ছবি] দ্বারা এটাই বুঝানো যাচ্ছে যে, পৃথিবীর উপর স্থির অবস্থায় মহাকর্ষের ফলে ৯.৮১ মি/সে^{২} গতিতে এ্যাস্ট্রনাটের হাত থেকে বলটি যানের মেঝে পতিত হবে। এই অবস্থায় এ্যাস্ট্রনাটও নিজের মধ্যে স্বাভাবিক ওজন অনুভব করবে। মহাকাশে উড্ডয়ন শেষে যদি যানের মধ্যে একই উর্ধ্বগতি তথা ৯.৮১ মি/সে^{২} সৃষ্টি করা হয় [উপরের ডানের ছবি] তাহলে এ্যাস্ট্রনাট একইভাবে স্বাভাবিক ওজন অনুভব করবে- বলটিও সেই একই গতিতে যানের মেঝে পতিত হবে। এই অবস্থায় 'কৃত্রিম

মধ্যাকর্ষণ' [artificial gravity] সৃষ্টি হবে। তাহলে ইতোমধ্যে উল্লেখিত 'প্রিন্সিপাল অব ইক্যুইভেলেন্স' এর সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল। কারণ, ত্বরণ ও পৃথিবীর উপর স্থির এই উভয় অবস্থার ফলাফল এ্যাস্ট্রনাটের নিকট সম্পূর্ণ সমান- এতে কোনো পার্থক্য নেই।

পৃথিবীর উপর স্থির অবস্থা

মহাকাশে ত্বরণ অবস্থায় ৯.৮১ মি/সে^{২}

পৃথিবীর উপর স্থির অবস্থা

মহাকাশে ত্বরণ অবস্থায় ৯.৮১ মি/সে^{২}

এবার আমরা আরেকটি পরীক্ষা করবো। পৃথিবীতে স্থির অবস্থায় একটি আলোকরশ্মি মহাকাশযানের বায়ের দিক থেকে ডানের দিকে প্রেরণ করবো [নীচের

বায়ের ছবি]। এতে পরিলক্ষিত হবে রশ্মিটি সরলরেখায় চলে। এরপর মহাকাশে যানটিকে ত্বরণশীল করে একই পরীক্ষা করে দেখা যাবে আলোকরশ্মি এবার কিছুটা বক্র হয়েছে [ডানের নীচের ছবি]। আইনস্টাইন বলেন, এই একই অবস্থার সৃষ্টি হবে যদি কোনো আলোকরশ্মি বড় কোনো বস্তুর পাশকেটে যায়- যেমন সূর্য। কারণ, মহাকর্ষও অনুরূপ আলোকরশ্মিকে বক্র করে দেবে। তিনি আরোও বললেন, এই বক্রতার কারণ হলো মহাকর্ষ চতুর্দিকের স্থান-কালকে বক্র করে দেয়। সুতরাং মহাকর্ষ আর কিছু নয়- স্থানকালের একটি ক্রিয়া। ভারী বস্তু তার চতুর্দিকের স্থান-কালকে বক্র করে দেয় আর এই বক্র স্থানের উপর কিছু চললে তা ঘুরতে থাকবে, যেমনটি সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলো কক্ষপথে ঘুরে। এসব ব্যাখ্যা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অঙ্ক দ্বারা আইনস্টাইন মহাকর্ষের এক অভিনব ব্যাখ্যা তুলে ধরলেন যা নিউটনের ব্যাখ্যার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। থিওরিটি প্রকাশ হওয়ার পরই পুরো বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার মাধ্যমে আলোকরশ্মি বক্র হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণ হয়ে গেলো এবং আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলো।

আমরা ইতোমধ্যে ব্ল্যাক হোল নামক বস্তুর কথা ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করেছি। অনেক গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বিরাট মহাকর্ষসম্পন্ন এই বস্তুটি থাকার সম্ভাবনা খুব বেশী। সুতরাং বিজ্ঞানীরা মনে করলেন আইনস্টাইনের থিওরি পরীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র এই ব্ল্যাক হোল। ১৯৯৭ সালে বিজ্ঞানীরা দু'টি ব্ল্যাক হোলের উপর গবেষণা চালিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন আইনস্টাইনের 'ফ্রেম ড্রাগিং' [frame dragging] বা স্থান-কাল বক্র হওয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এর আগেও আলোকরশ্মি বক্র হওয়ার প্রমাণ মিলেছে (ডানের চিত্র)।
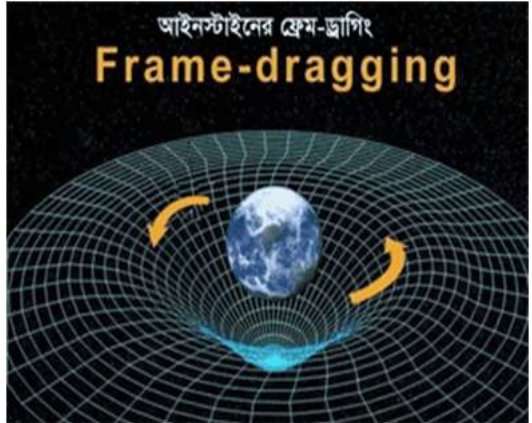
আইনস্টাইন তার রিলেটিভিটি দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, দূরের তারা থেকে আগত আলোকরশ্মি যদি সূর্যের কারণে পৃথিবীতে সরাসরি এসে পৌঁছতে না পারে তাহলে তা বক্রপথে পৌঁছে যাবে। তিনি অঙ্ক কষে বলে দিলেন ঐ আলোকরশ্মিতে ঠিক কতো ডিগ্রী পরিমাণ বক্রতা সৃষ্টি হবে। এরপর বেশ ক'বছর পর **১৯১৯** সালে তার এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করার এক সুবর্ণ সুযোগ এসে পড়লো। দু'টি দূরবর্তী তারা সূর্যের অপরদিকে একটি সূর্যগ্রহণের সময় আত্মপ্রকাশ করলো। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন এবার আইনস্টাইন ধরা পড়ে যাবেন! যদি তার রিলেটিভিটি সঠিক হয়ে তাকে তাহলে ঐ তারা দু'টোর অবস্থান তাদের থেকে আগত আলোকরশ্মি বক্রতার কারণে অন্য স্থানে দেখাবে- অন্যথায় ঐ তারাদ্বয় দেখাই যাবে না। উল্লেখ্য পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় রাতের আকাশের মতো তারাগুলোও পৃথিবীর বিশেষ স্থানে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইনস্টাইনই শেষ হাসি হাসলেন- গোটা পৃথিবীব্যাপী তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়ার কথা প্রকাশ হলো, এবং তিনি রাতারাতি এক খ্যাতিমান ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। এরপর **১৯২২** সালে অনুরূপ আরেকটি সূর্যগ্রহণ কালে ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়। উপরের ছবিতে এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে। আধুনিক যুগেও এই ব্যাপারটি একাধিকবার পরীক্ষা করে সত্যায়িত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ক্যুয়াইজার নামক দূরবর্তী বস্তু থেকে আগত রেডিও-তরঙ্গ পরীক্ষা করে দেখেছেন এটাও রিলেটিভিটির মাধ্যমে বিশ্লেষণকৃত পন্থায় বক্র হয়ে যায় সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাবে।

জেনারেল রিলেটিভিটি আমাদেরকে আরেকটি ব্যাপার বলে, আর তাহলো ভারী বস্তু যার মধ্যে বড় অঙ্কের মহাকর্ষ আছে, সময়কেও বেটে করে দেয়। এই ব্যাপারটিও আধুনিক যুগে বার বার পরীক্ষা করে সত্যায়িত করা হয়েছে। এই টাইম-

ডিলে [time-delay] ক্রিয়া পরীক্ষার সময় পৃথিবী থেকে সূর্যের অপরপার্শ্বে স্থাপিত মহাকাশযানে সিগনাল প্রেরণ করা হয়েছিল। দেখা গেছে সত্যিই সূর্যের মহাকর্ষ সময়ের উপর ক্রিয়া করে।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান : ক্যুয়ান্টাম থিওরি

যেসব পারমাণবিক কণা থেকে বস্তু সৃষ্ট তাদের ব্যাখ্যা, তাদের একে অন্যের মধ্যে সম্পর্ক এবং এনার্জির সঙ্গে কিভাবে এগুলো সম্পর্কিত এসব ব্যাপার যে অত্যাধুনিক থিওরির মাধ্যমে বুঝানো হয় তারই নাম ক্যুয়ান্টাম থিওরি [quantum theory]। আমরা এ প্রসঙ্গে অত্যধিক কঠিন এই থিওরির গাণিতিক দিক নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। থিওরির উপর ভাসাভাসাভাবে কিছু তথ্যাদি বর্ণনা ও সংজ্ঞা দেওয়া ছাড়া অতিরিক্ত কিছু বলা আদৌ সম্ভব নয়।

ক্যুয়ান্টাম থিওরি বস্তু জগৎ কিভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে দেয়; যে কোনো ফিজিক্যাল কিংবা বায়োলজিক্যাল কাঠামোগত পরীক্ষার ফলাফল কি হতে পারে, হওয়ার মৌলিক কারণ ইত্যাদি এই থিওরি দ্বারা বুঝানো যায়। থিওরির নাম থেকে আমরা এ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়ে যেতে পারি। ক্যুয়ান্টাম শব্দ 'ক্যুয়ান্টা' [quanta] শব্দের একবচন। এর অর্থ প্যাকেট। এই থিওরি বলে এনার্জি ও আলোকরশ্মি প্যাকেট প্যাকেট হিসাবে বিকিরণ হয়- একে বলে ফটোন [photon]। এই থিওরি পুরাতন ক্লাসিক্যাল থিওরি থেকে ভিন্ন। ক্যুয়ান্টাম থিওরিতে ব্যবহৃত সমীকরণসমূহ ক্লাসিক্যাল থিওরিতে ব্যবহৃত সমীকরণগুলোর তুলনায় আরো সূক্ষ্ম ও এই থিওরির প্রবর্তকদের দাবী অনুযায়ী সত্যের কাছাকাছি। ক্লাসিক্যাল থিওরি আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য হলেও সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রতম পরমাণু-পরমাণুর জগতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে ক্যুয়ান্টাম থিওরি থেকে আমরা সঠিক ফলাফল ও ব্যাখ্যা পেতে পারি। বাস্তবে ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের আইন-কানুন এটমিক ও সাব-এটমিক জগতের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই বলে ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্স দ্বারা বড়ো কোনো দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না- তা কিন্তু নয়। এই থিওরি সর্বাপেক্ষা ছোট্ট পরমাণু-পরমাণু-কণার জগৎ ও সর্বাপেক্ষা বড়ো গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্বজগৎ এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহারযোগ্য এবং

তা অধিক যথার্থ। তবে প্রাত্যহিক ঘটনাবলী বুঝানো ও ফলাফল বেরকরণ ইত্যাদি কাজে আমাদের জন্য ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান কাজে লাগানোই যথেষ্ট এবং সহজও বটে। কারণ ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্সের সমীকরণ অত্যন্ত কঠিন।

আইন-কানুন ছাড়াও মহাবিশ্ব ও বস্তুর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে এই থিওরি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। যেসব ক্ষুদ্র পরমাণু নিয়ে এই থিওরি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ওগুলোর কোনো বিশেষ স্থিতিস্থান নেই, নেই কোনো নির্দিষ্ট গতি ও চলার পথ। ক্যুয়ান্টাম থিওরি এসব ক্লাসিক্যাল ধারণার বদলে কণার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু অর্থপূর্ণ মান হওয়ার 'সম্ভাবনা' বা চান্স নিয়ে কথা বলে। একটি বিশেষ ক্ষণে একটি বিশেষ কণা ঠিক কোনো স্থানে অবস্থান করছে তার সম্ভাবনা নির্ণয় করতে এই থিওরি বিজ্ঞানীদেরকে সাহায্য করে। পরমাণু-পরমাণুর জগতে চান্স অনেক ক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করেছে সত্যি, কিন্তু ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কিভাবে গবেষণা গভীরে নিয়ে যাওয়া যায় তা জানতো না।

একটি এটম ও মলিকিউল কিভাবে সৃষ্টি হয় ও অস্তিত্ব বজায় রাখে তার সঠিক ব্যাখ্যা আসে ক্যুয়ান্টাম থিওরি থেকে। অপরদিকে এই থিওরিই সূর্য কিভাবে জ্বলন্ত আছে, সৃষ্টির শুরুতে কি হয়েছিল ইত্যাদিও ক্যুয়ান্টাম থিওরি দ্বারা বুঝানো যায়। বাস্তবে ক্যুয়ান্টাম থিওরি ছাড়া আজ আমরা কম্পিউটার দেখতাম না অথবা নিউক্লিয়ার এনার্জি পেতাম না। একমাত্র মহাকর্ষ ছাড়া স্বভাবের মৌলিক সকল ফোর্স কিভাবে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে তা এই থিওরি দ্বারা বুঝানো যায়। ইলেকট্রিক, মেগনেটিক, প্রবল ও দুর্বল আনবিক শক্তি ইত্যাদি ক্যুয়ান্টাম থিওরি দ্বারাই বুঝতে হবে। এসব শক্তিকে বিজ্ঞানীরা 'ইন্টারেকশন' বা মিথস্ক্রিয়া বলেন। এর কারণ হলো উল্লেখিত সকল মৌলিক শক্তির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান।

ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স ও আধুনিক ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্সে একটি গুরুত্ব পার্থক্য আলো ও বস্তুর ব্যাখ্যার মধ্যে বিদ্যমান। আগের যুগে আলোকরশ্মি শুধুমাত্র 'তরঙ্গ' [wave] মনে করা হতো এবং পরমাণুকে বলের মতো অতি ক্ষুদ্র বস্তুই ভাবা হতো।

কিন্তু ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্স বলে, আলো ও বস্তু তরঙ্গ এবং কণা [wave and particle] এই উভয় অবস্থা ধারণ করে ক্রিয়া করতে পারে। তরঙ্গ সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা একান্ত জরুরী। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। মনে করুন একগাছি লম্বা দড়ির একপ্রান্ত একটি খুঁটির মধ্যে বেধে রাখা হলো। অপরপ্রান্তে আপনি ধরে হাত ওঠানামার মাধ্যমে 'তরঙ্গ' সৃষ্টি করে অপরপ্রান্তের দিকে প্রেরণ করলেন। ছোটবেলা এরূপ দড়ির খেলা অনেকেই করে থাকে। তরঙ্গ অপরপ্রান্তের দিকে চলতে লাগলো। দড়ির তরঙ্গে সর্বোচ্চ পয়েন্টকে বলে 'তরঙ্গের চূড়া' [wave crest]। আর সর্বনিম্ন পয়েন্টকে বলে 'তরঙ্গের অবতলাংশ' [trough]। এক চূড়া থেকে অপর চূড়া কিংবা এক অবতলাংশ থেকে অপর অবতলাংশের দূরত্বকে বলে 'তরঙ্গদৈর্ঘ্য' [wavelength]। এখন দড়ির যে কোনো পয়েন্ট দিয়ে প্রত্যেক সেকেন্ড ক'টি তরঙ্গ [পুরো তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিয়ে একটি পূর্ণ তরঙ্গ] অতিক্রম করে তার একটি হিসাবকে বলে ফ্রিক্যুয়েন্সি [frequency]। আমরা বাংলায় 'তরঙ্গসংখ্যা' বলতে পারি। নিচের চিত্র দেখুন।
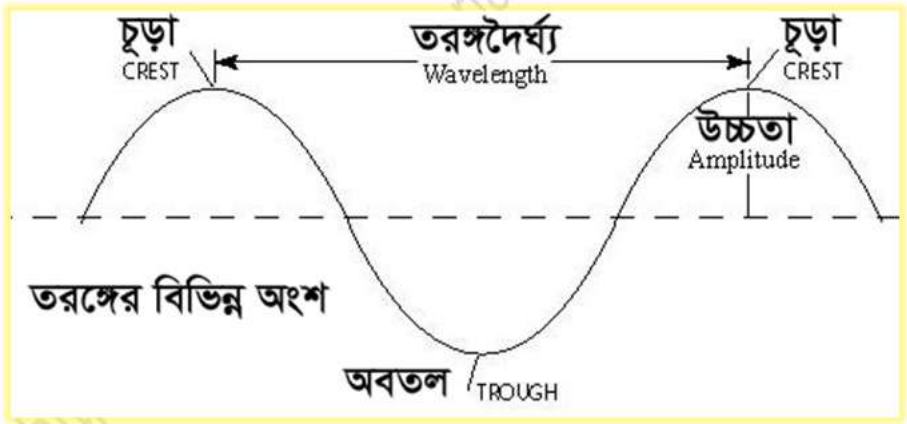
এবার ভেবে দেখা যাক, যদি দড়ির অপরপ্রান্তে পৌঁছে তরঙ্গগুলো ফিরে আসে- যেমনটি পানিতে সৃষ্ট তরঙ্গ পাত্রের দেওয়ালে লেগে ফিরে আসে, তাহলে বিপরীত দিকে চলন্ত দু'টি তরঙ্গ একটি বিশেষ পয়েন্টে একত্রিত হতে পারে একই সঙ্গে। এতে এই দু'টো তরঙ্গ ইন্টারফেয়ার [interfere] বা জড়িত হবে। যদি

উভয় তরঙ্গের মধ্যে চূড়া ও অবতল সামঞ্জস্যশীল অর্থাৎ উভয় লাইন-আপ হয় তাহলে এই ইন্টারফেয়ার হবে ইতিবাচক [positive]। উভয় তরঙ্গ মিলে বড় আরেকটি তরঙ্গে রূপান্তর হবে। কিন্তু যদি অর্ধ-তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাণ বেশকম থাকে [বা অফসেট হয়] তাহলে এই ইন্টারফেয়ার হবে নেতিবাচক [nagative]। অর্থাৎ উভয় তরঙ্গ একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাতিল বা ক্যান্সেল হবে ও ক্ষণকালের জন্য সম্পূর্ণ সরল দেখাবে। নিচের চিত্রটি দেখুন।
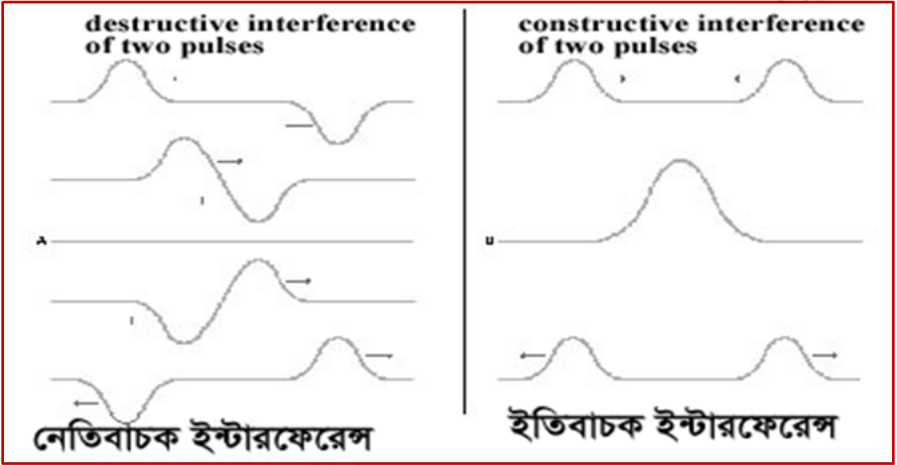
আলোকরশ্মি কণা ও তরঙ্গ

আগেই বলেছি ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্সে আলোকরশ্মিকে কণা বা পার্টিকল এবং তরঙ্গ এই উভয়টি মনে করা হয়। এবার দেখা যাক কিভাবে এটি উভয় বৈশিষ্ট্যসহ চলে। আলোক তরঙ্গ উপরোক্ত দড়িতে সৃষ্ট তরঙ্গের মতো নয়। বা¯তবে আলোকরশ্মির তরঙ্গ মেগনেটিক ও ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে কম্পনের প্রাবল্য থেকে সৃষ্ট। এই ফিল্ডদ্বয় যে কোনো ইলেকট্রিক্যালী চার্জকৃত বস্তুর চতুর্দিকে বিদ্যমান থাকে। এভাবে চলন্ত তরঙ্গকে বলে ‘ইলেকট্রমেগনেটিক ওয়েভ’ [electromagnetic wave]। নীচের (পরের পৃষ্ঠার) চিত্রে আমরা এই তরঙ্গকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।
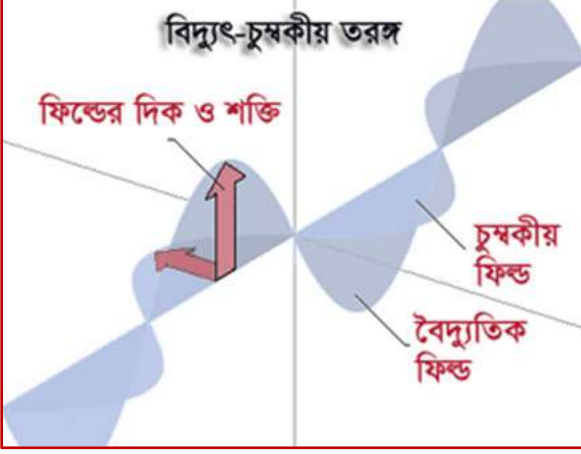
এই চিত্রে ইলেকট্রিক ও মেগনেটিক তরঙ্গের মধ্যে ৯০ ডিগ্রী পার্থক্য দেখাচ্ছে। এখন দৃশ্যমান আলোর ফ্রিকুয়েন্সি ও ওয়েভলেন্থ একটি বিশেষ রেঞ্জের মধ্যে বিদ্যমান। অন্যান্য তরঙ্গের ক্ষেত্রেও বিশেষ রেঞ্জ বিদ্যমান। আলোক তরঙ্গ উপরে বর্ণিত আমাদের দড়ির মধ্যে সৃষ্ট তরঙ্গের মতো এনার্জি নিয়ে যায়। এই এনার্জি নির্ভর করে ক'টি তরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে আলোক তরঙ্গে অতিক্রম করছে- অর্থাৎ তার তরঙ্গসংখ্যা। এই সংখ্যা যতো বেশী হবে এনার্জিও ততো বেশী হবে। ফ্রিকুয়েন্সির উপর আলোকরশ্মির রংও নির্ভর করে। লাল আলোর মধ্যে কম ফ্রিকুয়েন্সি ও নীলটায় বেশী হয়ে থাকে। সুতরাং নীল রংয়ের একটি আলোকরশ্মিতে লাল রংয়ের চেয়ে এনার্জি হবে বেশী।

এতো গেল আলোকরশ্মির তরঙ্গ হওয়ার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোনো কোন সময় আলো পরমাণু হিসাবেও এনার্জি নিয়ে চলে। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের নাম ফটোন। ফটোন মানে আলোর প্যাকেটস [light packets]। বিংশ শতকের শুরুর দিকে আলোর মধ্যে এরূপ কণার অস্তিত্ব পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন বিজ্ঞানীরা সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। তারা আবিষ্কার করলেন যে, আলো ও কণা ধাতুর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। এই পরস্পর ক্রিয়ার নামকরণ করা হলো 'ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট' [photoelectric effect]। ফটোন ও ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট সম্বন্ধে এখন আরো কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

ফটোন (photon)

আলোক এনার্জির কণা বা চলমান ইলেকট্রিক চার্জকে [electric charge] বলে ফটোন। আর চার্জ দ্বারা চলমান এনার্জিকে বলে ইলেকট্রমেগনেটিক

রেডিয়েশন [electromagnetic radiation]। দৃশ্যমান আলোও এই ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত। রেডিও, এক্স-রে, গামা-রে, ইনফ্রারেড ইত্যাদিও ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন। এসব যাবতীয় বিকিরণ কোনো কোন সময় তরঙ্গের মতো আবার কোনো সময় কণার মতো চরিত্র দেখায়। বিজ্ঞানীরা শেষোক্ত চরিত্রকে বলেন ফটোন। অধিকাংশ ফটোন আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। আমরা ঐসব ফটোন দেখি যেগুলো একটি বিশেষ এনার্জি ব্যাপ্তির ভেতর অবস্থান করে। এই দৃশ্যমান ফটোনকেই আমরা 'দৃশ্যমান আলো' [visible light] বলি। আর অদৃশ্য ফটোনের মধ্যে আছে টিভি সিগনাল, রেডিও, মাইক্রওয়েভ, এক্স-রে ইত্যাদি।

যে কণাকে ভেঙ্গে বিভক্ত করে আরো ছোট্ট কণায় পরিণত করা যায় না- তাকে বলে 'ইলেমেন্টারী পার্টিকল' [elementary particle] বা মৌলিক কণা। ফটোন মূলত এরূপ কোনো মৌলিক কণা দ্বারা সৃষ্ট। এটা কণা থেকে কণায় ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্সকে বহন করে। এই ফোর্সটি চার্জসম্পন্ন কণা অথবা মেগনেটিক ধাতু ও চার্জসম্পন্ন কণার মধ্যে সৃষ্টি হয়। অন্যকথায়, ইলেকট্রিকভাবে কণা চার্জ হলে তারা একে অন্যের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ শক্তি বজায় রাখে ফটোন বিনিময়ের মাধ্যমে।

স্বয়ং কণা-ফটোনের মধ্যে কোনো ভর বা ম্যাস নেই- নেই কোনো ইলেকট্রিক চার্জও। কিন্তু তাদের মধ্যে এনার্জি ও মমেন্টাম [momentum - সংঘর্ষের সময় এই শক্তির ফলে এক কণা অপর কণার মধ্যে ক্রিয়া করে] বিদ্যমান। ফটোনের আসল বৈশিষ্ট্য হলো এর গতি। এটা আলোকের গতিতে চলে যার মান হলো ৩ লক্ষ কিমি/সেকেন্ড [এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল প্রতি সেকেন্ড]। আর ভরশূন্য বা ম্যাসহীন বস্তু ছাড়া এই গতিতে কিছু চলতে পারে না।

পরের পৃষ্ঠার ছবিতে ফটোন বিকিরণের একটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একটি এটমের নিউক্লিয়াস থেকে উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন 'গামা-রে' [gamma-ray] বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। এই রেডিয়েশন তখনই সৃষ্টি হয় যখন এটমের নিউক্লিয়াস তেজস্ক্রিয়ভাবে ক্ষয় হয় [radioactive decay]। ফটোনে কি পরিমাণ এনার্জি

আছে তা নির্ভর করে এর ফ্রিকুয়েন্সির উপর। ফটোন এনার্জির সমীকরণ হলো: এনার্জি = ফ্রিকুয়েন্সি x প্লাংক কন্সটেন্ট। দ্বিতীয় ইউনিটটি একটি অপরিবর্তনশীল রাশি যার মান হলো: ৬.৬২৬ x ১০-৩৪। এই সংখ্যাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও অণু-পরমাণুর জগতে এটা কম নয়। দৃশ্যমান আলোর মধ্যস্থ ফটোনে আছে ১ ইলেকট্রন ভল্ট [eV] এনার্জি। আর ফ্রিকুয়েন্সি ১০৪ থেকে ১০১৫ হার্টজ [Hz]। এখানে উল্লেখ্য যে ফটোনের এনার্জি ইলেকট্রন ভল্ট দ্বারা মাপা হয় আর এই সংখ্যাটি হলো ১.৬০২০৭ x ১০-১৯ জুলস। সাধারণত ইলেকট্রন ভল্ট মিলিয়ন ইলেকট্রন ভল্ট [Mega] কিংবা বিলিয়ন [Giga] ইলেকট্রন ভল্ট [GeV] দ্বারা উল্লেখ করা হয়।
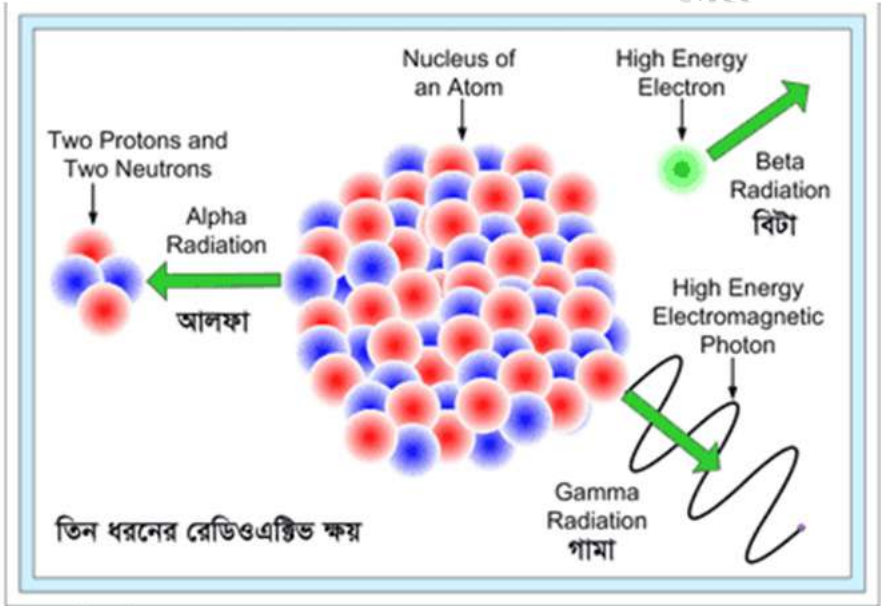
ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট

যখন বস্তুর উপর আলোকরশ্মি কিংবা অন্য কোনো ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন পতিত হয় তখন ঐ বস্তুর কিছু কণা ইলেকট্রিক্যালী চার্জ হয়ে চলন্ত হয়ে যায়। এই চার্জ ও মুক্ত হওয়া বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তবে এভাবে হওয়াকে বলে ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট [photoelectric effect]। বাইরের দিকে যে

ইফেক্ট হয় তা হলো, ধাতু নির্মিত কন্ডাকটার বস্তুর উপর আলো পতিত হয়ে ইলেকট্রন ধাতুর সারফেস চার্জ হয়ে মুক্ত হওয়া। এসময় ধাতু আলোকরশ্মির এনার্জি চুষে নেয়। এই ক্রিয়াই ফটোইলেকট্রিক সেলে [photoelectric cell] ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সোলার সেলের [solar cell] কথা বলা যেতে পারে যা সৌরবিদ্যুতে কাজে লাগানো হয়।

আধুনিক ফিজিক্স তথা ক্যুয়ান্টাম থিওরি প্রতিষ্ঠায় এই বহির্মুখী ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই ১৮৮৭ সালে পরীক্ষা করে এই ইফেক্ট আবিষ্কারের সময় কিছু ব্যাপার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো যার সঠিক ব্যাখ্যা ‘ক্লাসিক্যাল’ পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা সম্ভব ছিলো না। এ সময় আলোসহ সকল ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন শুধুমাত্র তরঙ্গের মাধ্যমে চলে বলে সবাই মনে করতেন। আগের থিওরি বলে, ধাতুর সারফেসের ইলেকট্রন আলোকরশ্মি চুষে বেশী থেকে বেশী মুক্ত হবে তরঙ্গের মধ্যে যতো বেশী এনার্জি থাকবে- অর্থাৎ আলোকের ঔজ্জ্বল্যতা যতো বেশী হবে চার্জ ইলেকট্রনের সংখ্যা ও এতে এনার্জির মাত্রা হবে তাতে বেশী। কিন্তু পরীক্ষা থেকে এরূপ ফলাফল মিলে নি। দেখা গেছে মুক্ত ইলেকট্রনে সর্বোচ্চ এনার্জি শুধুমাত্র নির্ভর করে পতিত আলোকরশ্মির ফ্রিকুয়েন্সি তথা সেকেন্ডে ক’টি তরঙ্গ পতিত হচ্ছে তার উপর। এটা পতিত আলোর প্রাবল্য থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

আইনস্টাইন সর্বপ্রথম বললেন যে, বাস্তবে আলোকরশ্মি সময় সময় কণার মতো চরিত্র দেখাতে পারে। তিনি আরও বললেন, প্রতিটি আলোক-কণা বা ফটোনের এনার্জি একমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যরে উপর নির্ভরশীল। ১৯০৫ সালে এই ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট থিওরির জন্য তাকে পরবর্তীতে নবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, একটি ফটোন ধাতুর সারফেসে ‘প্রজেকটাইলের’ [projectile - মিসাইল বা শেল নিক্ষেপকরণ] মতো আঘাত হানার পর ধাতুর একটি মুক্ত ইলেকট্রন ফটোনের এনার্জি চুষে নেয়। ফটোনের এনার্জি যদি যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে ঐ ইলেকট্রন তার ধাতু থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তার এই থিওরি এক্সটারনেল [বাইরের] ফটোইলেকট্রিক ইফেক্টের অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ধাতু থেকে মুক্ত ইলেকট্রন কোন্ কারণে পতিত আলোকরশ্মির

ঔজ্জ্বল্যতার প্রাবল্য থেকে স্বাধীন- তা-ও এই থিওরি থেকে জানা যায়। তার থিওরি অনুযায়ী, ধাতু থেকে মুক্ত একটি ইলেকট্রনের মধ্যে সর্বোচ্চ এনার্জি একমাত্র নির্ভর করে ফটোন কর্তৃক এই ইলেকট্রনকে আঘাত হানার এনার্জির উপর। আর ফটোনের এনার্জি আলোকরশ্মির ঔজ্জ্বল্যতার প্রাবল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। কারণ এটা শুধুমাত্র ক'টি ফটোন ধাতুর উপর প্রতি সেকেন্ডে পতিত হচ্ছে এটার উপর নির্ভরশীল- অর্থাৎ আলোকরশ্মির ফ্রিকুয়েন্সি। এই থিওরি পরবর্তীতে পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্যুয়ান্টাম থিওরি প্রতিষ্ঠায় এটা বিরাট ভূমিকা রাখে।

বস্তু কণা ও তরঙ্গ

ফরাসী পদার্থবিদ লুই ডি ব্রোগাইল [১৮৯২-১৯৮৭] ১৯২৩ সালে মতামত পেশ করলেন যে, আলোকরশ্মি ও ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন ছাড়াও বস্তু বা মেটার কণা এবং তরঙ্গ হওয়ার চরিত্র দেখাতে পারে। তিনি অঙ্ক কষে দেখালেন যে, প্রত্যেক কণা বা পার্টিকেলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিদ্যমান। একটি সমীকরণ দ্বারা এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যরে মাত্রা নির্ণয় করা যায়। লামদা [λ] = প্লাংক কন্সটেন্ট [h] / পার্টিকেলের মমেন্টাম [p]। ইলেকট্রন, এটম এবং অন্যান্য সকল আনবিক পরমাণুতে ডি ব্রোগাইল ওয়েভলেন্থ আছে। মমেন্টাম নির্ভর করে বস্তুর গতি ও ভরের উপর। সুতরাং বস্তু যতো বেশী গতিশীল ও ভরসম্পন্ন হবে তার মমেন্টাম [p] ততো বেশী হবে। কিন্তু প্লাংক কন্সটেন্ট [h] একটি ক্ষুদ্র সংখ্যা হওয়ায় দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে ডি ব্রোগাইল তরঙ্গদৈর্ঘ্য [h/p] খুব কম। বাস্তবে কোনো বস্তু যদি এটমের চেয়ে বড়ো আয়তনের হয় তাহলে ডি ব্রোগাইল ওয়েভলেন্থ ঐ বস্তুর একটি এটমের চেয়েও কম হবে! একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে।

একটি ক্রিকেট বল যদি ১৫০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে চলন্ত থাকে তাহলে এতে সৃষ্ট ডি ব্রোগাইল তরঙ্গদৈর্ঘ্য মাত্র ১.১ x ১০$^{-৩৪}$ মিটার হবে। এই সংখ্যাটি যে কতো ছোট্ট তা বুঝার জন্য হাইড্রোজেন এটমের কথা বলতে পারি [যা হলো সর্বাপেক্ষা ছোট্ট এটম]। এই এটমের ব্যাস হলো, ৫ x ১০$^{-১১}$ মিটার। এই সংখ্যা উপরোক্ত ক্রিকেট বলের ডি ব্রোগাইল সংখ্যা থেকে ১০০ বিলিয়ন ট্রিলিয়ন গুণ বেশী। এ কারণেই প্রাত্যহিক দৃশ্যমান বস্তুতে আমরা এই ওয়েভলেন্থ কিংবা এর

কোনো ইফেক্ট পর্যবেক্ষণ করি না। সাধারণ ক্ষেত্রে এটা নিরাপদে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু ক্যুয়ান্টাম বিশ্বে তা কিছুতেই উপেক্ষা করার উপায় নেই।

এটমিক স্কেলে ডি ব্রোগাইল ওয়েভলেন্থ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি ফেমাস পরীক্ষা দ্বারা এর প্রমাণ মেলে। এটাকে বলে 'ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট'। এই পরীক্ষায় ইলেকট্রন সূত্র ও ইলেকট্রন ডিটেক্টরের মধ্যে বাধা তৈরী করা হয়। এই বাধা মূলত দু'টি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র বা স্লিট। আসলেই এতোই ক্ষুদ্র যে এর মাপ একটি ইলেকট্রনের ডি ব্রোগাইল ওয়েভলেন্থের সমান। নীচের চিত্রে এই পরীক্ষাটি দেখানো হয়েছে।
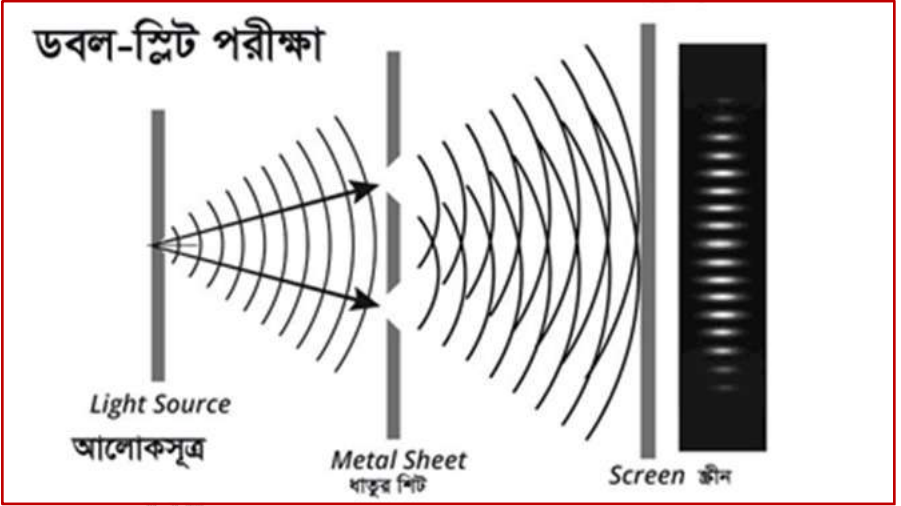
উপরের চিত্রে যে এপারেইটাস [apparatus] দেখানো হয়েছে তা দ্বারা পরীক্ষার পদ্ধতি যেটুকু সম্ভব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ইলেকট্রন তরঙ্গের মতো এবং কণার মতো চরিত্র দেখাতে পারে। আমরা যখন আলোকসূত্র অন করবো তখন উভয় সিøট দিয়ে অনুরূপ তরঙ্গ বের হয়ে আসবে। কিন্তু তরঙ্গ দু'টো একটা আরেকটার সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়াকালে, কোনো স্থানে উভয় তরঙ্গের যোগফল আর কোনো স্থানে উভয়

তরঙ্গ বাতিল বা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। প্রথম অবস্থাকে বলে কন্সট্রাকটিভ ইন্টারফেরেন্স আর দ্বিতীয়টিকে বলে ডিস্ট্রাক্টিভ ইন্টারফেরেন্স। সর্বাপেক্ষা বেশী ইতিবাচক ইন্টারফেরেন্স হয় উভয় স্লিটের ঠিক মাঝখানে। সত্যিকার তরঙ্গের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আলোকরশ্মি দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর আমরা এবার স্লিটের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রেরণ করে দেখতে পারি কি হয়? এই পরীক্ষা দ্বারা আমরা এটাই দেখতে চাই যে তরঙ্গের মতো ইলেকট্রনও অনুরূপ চরিত্র দেখায় কি না- অর্থাৎ ওয়েভের মতো ইতিবাচক ও নেতিবাচক ইন্টারফেরেন্স হয় কি না? তবে এর পূর্বে বিজ্ঞানীরা ইন্টারফেরেন্স হয় না এরূপ বস্তু যেমন মার্বেল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন। সত্যিই দেখা গেছে মার্বেল তরঙ্গের মতো ইন্টারফেরেন্স দেখায় না। এরপর যখন ইলেকট্রন দ্বারা একই পরীক্ষা করা হয় তখনো দেখা যায় ঠিক আলোক তরঙ্গের মতো ইতিবাচক ও নেতিবাচক ইন্টারফেরেন্স হচ্ছে। এ থেকে প্রমাণ হলো যে ইলেকট্রন যা মূলত একটি কণা তরঙ্গের মতো চরিত্র দেখাতে পারে।

অনিশ্চয়তাবাদ

ক্যুয়ান্টাম থিওরি আসার আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন সঠিক উপায় ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সঠিক মাপজোখ সম্ভব। কিন্তু ক্যুয়ান্টাম সমীকরণ দ্বারা এটা প্রমাণ হলো যে, বাস্তবে একটি পার্টিকেলের মমেন্টাম [অর্থাৎ গতি ও ভরের গুণফল] ও পজিশন [অবস্থান] উভয়টি একই সময় মাপা অসম্ভব। এই আইনকেই ওয়েরনার হেইজেনবার্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘অনিশ্চয়তাবাদ’ [uncertainty principle] বলে। এতে আরো বলা হয়েছে বিজ্ঞানীরা কোনো একটি পার্টিকেলের অবস্থান [পজিশন] যতো বেশী নির্ভুলভাবে মাপার চেষ্টা করবেন এর মমেন্টাম [চলন এনার্জি] ততো বেশী অনিশ্চিত হয়ে পড়বে; একই অবস্থা হবে বিপরীত ক্ষেত্রেও অর্থাৎ, মমেন্টাম যতো সঠিকভাবে মাপার চেষ্টা চলবে পার্টিকেলের অবস্থান ততো বেশী অনিশ্চিত হবে। হেইজেনবার্গ অবশ্য তার এই প্রিন্সিপালকে গণিত দ্বারা বুঝিয়েছেন। আমরা ওসব গাণিতিক গবেষণায় যাচ্ছি না। তবে এক উপায়ে আমরা এই অনিশ্চয়তাবাদকে বুঝতে পারি।

বস্তু ও আলোর মধ্যে দ্বৈত চরিত্র বিদ্যমান। এর একটি তরঙ্গ আর আরেকটি হলো পার্টিকল- যার উপর আমরা এতক্ষণ ব্যাখ্যা করেছি। কোনো এটমের পজিশন বা অবস্থান ও মমেন্টাম মাপার একটি উপায় হলো এটমটির উপরে আলোকরশ্মি পতিত করে প্রতিবিম্ব করা। এখন যদি আমরা আলোকরশ্মিকে 'তরঙ্গ' হিসাবে ধরে নিই তাহলে তরঙ্গের একটি গুণ আছে যাকে বলে ডিফ্রেকশন [diffraction] তা উপেক্ষা করা যাবে না। ডিফ্রেকশন মানে তরঙ্গে বক্রতা সৃষ্টি। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি পতিত বস্তুর আয়তন থেকে খুব বেশী কম হয় তাহলে এই বক্রতায় ফলাফলে তেমন পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। এটমের প্রায় সঠিক অবস্থান এ থেকে নির্ণয় করা যাবে। কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি বস্তুর আয়তনের সমপরিমাণ বা নিকটবর্তী হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা- কারণ, অধিকাংশ তরঙ্গ ডিফ্রেক্ট [diffract] হয়ে পড়বে। এতে বস্তুর বা এটমের পজিশন অস্পষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং বিজ্ঞানীদেরকে এটমের পজিশন সঠিকভাবে মাপতে যেয়ে এটমের আয়তন থেকে কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ ব্যবহার করেতে হবে। তবে পজিশন এভাবে মাপতে গেলে কিন্তু মমেন্টাম মাপা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

আলোকের মধ্যে এনার্জি ও মমেন্টাম বিদ্যমান। এসব থাকার কারণ হলো ইতোমধ্যে বিশ্লেষিত কণার মতো এর চরিত্র। ফটোন যখন উক্ত এটমকে হিট করবে তখন ঐ এটমের এনার্জি ও মমেন্টাম বদলে যাবে। সুতরাং যে বস্তু মাপা হবে তাকেও পরিবর্তন করা হয়- এই মাপার কারণে। এই বিষয়টি ক্যুয়ান্টাম থিওরির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাধারণ বস্তুর মধ্যে সৃষ্ট পরিবর্তন বা ইফেক্ট খুব একটা যায় আসে না- কিন্তু এটম ও পরমাণুর ক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়ায়। আলোকরশ্মির ওয়েভলেন্থ কমিয়ে বিজ্ঞানীরা এটমের মমেন্টাম সঠিকভাবে মাপতে পারবেন সত্যি কিন্তু এর ফলে এটমের অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অন্য কথায় একই সময় উভয় মাপ সঠিকভাবে করা অসম্ভব। এই অবস্থার নামই হলো অনিশ্চয়তাবাদ। এই বাদটি শুধুমাত্র এটমের অবস্থান ও মমেন্টাম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। সময় ও এনার্জি মাপার ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

ক্যুয়ান্টাম থিওরির অনিশ্চয়তা

পাঠকরা হয়তো ভাবছেন ক্যুয়ান্টাম থিওরি দ্বারা যাবতীয় ফিজিক্যাল অবস্থা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কথাটি আংশিক সত্য। অনেক ক্ষেত্রেই ক্যুয়ান্টাম থিওরি বিভিন্ন অবস্থার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয়। সকল থিওরির মতো এটাও ১০০ পার্সেন্ট নির্ভুল নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আমাদেরকে শুধুমাত্র সম্ভাব্যতা বলে দেয়। একে ইংরেজীতে বলে ‘probability’ [সম্ভাব্যতা]। প্রব্যাবিলিটিকে সাধারণত একটি গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পূর্বের পৃষ্ঠার গ্রাফটি দেখুন। এতে হাইড্রোজেন এটমের মধ্যে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের দূরত্ব বা অবস্থান বুঝানো হয়েছে।
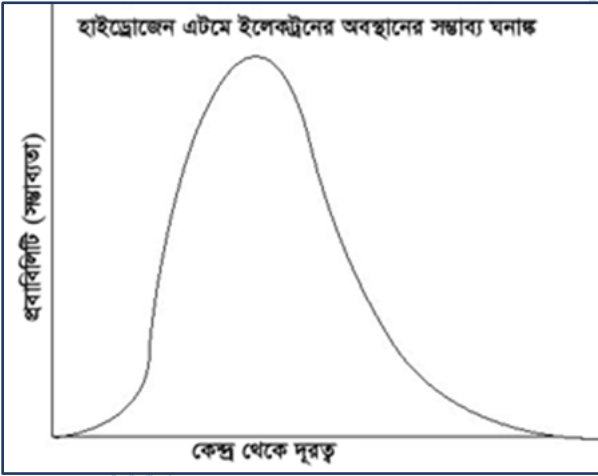
পাশের গ্রাফে এটমের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের অবস্থান আসলে বায়ের লাইনের নিকট। নিউক্লিয়াসের একেবারে নিকটে ইলেকট্রনকে পাওয়ার সম্ভাব্যতা খুব অল্প। গ্রাফ রেখার সর্বোচ্চ পয়েন্টে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাব্যতাও সর্বাধিক। অবস্থান ও গতি বা অনুরূপ সময় ও স্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত পার্টিকেলের চরিত্র ব্যক্ত করতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা ‘ওয়েভ ফাংশন’ [wave function] নামক একটি গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করেন। তবে এই ফাংশন থেকে শুধুমাত্র সম্ভাব্য ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। তরঙ্গ ফাংশন নাম হলেও এটার সঙ্গে পার্টিকল তরঙ্গ কিংবা কণার মতো চরিত্র দেখানোর কোনো সম্পর্ক নেই। ওয়েভ ফাংশন একটি গাণিতিক সমীকরণ মাত্র যদ্দারা অঙ্কের মাধ্যমে আমরা পার্টিকেলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

সম্পর্কিত কিছু রাশি বের করতে পারি। উপরের গ্রাফে দেখানো হাইড্রোজেন এটমের ওয়েভ ফাংশন হলো:

$$\psi = \frac{}{\sqrt{\mu a^3}} e^{\frac{-y}{a}}$$

উপরের সমীকরণে পাই [μ] ও ই [e] গাণিতিক অপরিবর্তনীয় রাশি। অক্ষর এ [a] আরেকটি অপরিবর্তনীয় রাশি যাকে 'হাইড্রোজেন এটমের বহ্র ব্যাস' বলে। বায়ের সংকেতটি গ্রীক অক্ষর স্পাই (ψ)। এই ওয়েভ ফাংশন সময়ের উপর নির্ভরশীল নয়। একক আলাদা একটি হাইড্রোজেন এটম কালে পরিবর্তন হয় না তাই সময় ফেক্টরকে উপেক্ষা সম্ভব। কিন্তু যেসব কণা কালে পরিবর্তিত হয় সেসব কণার ওয়েভ ফাংশন সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করে গড়ে তুলতে হবে। একটি ওয়েভ ফাংশনের স্কোয়ার [এটার গুণফল] = কণার সম্ভাব্য ঘনাঙ্ক যা ওয়েভ ফাংশন বুঝায়। আমরা এ প্রসঙ্গে গাণিতিক গভীরতায় যেতে ইচ্ছে করি না। এখানে উপরোক্ত সমীকরণ প্রকাশ করে এটাই পাঠকদেরকে বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ক্যুয়ান্টাম থিওরিতে গণিতের সাহায্য কতো জরুরী।

ক্যুয়ান্টাম এটম

ক্যুয়ান্টাম থিওরির সর্বপ্রথম অবদান ছিলো পরমাণু কিভাবে কাজ করে তা সঠিকভাবে বুঝানো। এর পূর্ব পর্যন্ত পদার্থ বিজ্ঞানীরা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দ্বারা পরমাণুকে বুঝাতে যেয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। তারা দেখলেন আসলে পুরাতন পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে কোনো কাজ হবে না- বাস্তবে পরমাণুকে বুঝানো প্রায় অসম্ভব ছিলো। একটি এটমে আছে ঋণাত্মক [নেগিটিভ] চার্জসম্পন্ন ইলেকট্রন যা ধনাত্মক [পজিটিভ] চার্জসম্পন্ন একটি কেন্দ্রের [নিউক্লিয়াসের] সঙ্গে জড়িত। নিউক্লিয়াসে আছে ধনাত্মক চার্জসম্পন্ন কণা যাকে বলে 'প্রটন' এবং সেখানে 'নিউট্রন' নামক চার্জহীন নিউট্রেল কণাও থাকতে পারে। প্রটন ও নিউট্রনের আয়তন প্রায় একই- কিন্তু ইলেকট্রনের তুলনায় অনেক বড় ও ভারী।

এটমের বিভিন্ন মডেল: পরীক্ষানির্ভর তথ্য আধুনিক যুগে এটমের বিভিন্ন মডেল সৃষ্টি ও গ্রহণযোগ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পাশের ছবিতে তিনটি এরূপ মডেল দেখানো হয়েছে। রাদারফোর্ড মডেলটি সর্বাপেক্ষা সাধারণ ও সহজবোধ্য। এই মডেলে ইলেকট্রন খুব শক্তভাবে জড়োত পজিটিভ চার্জসম্পন্ন নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘূর্ণমান আছে। এই মডেল দ্বারা কিছু পরীক্ষার ফলাফল সফলভাবে
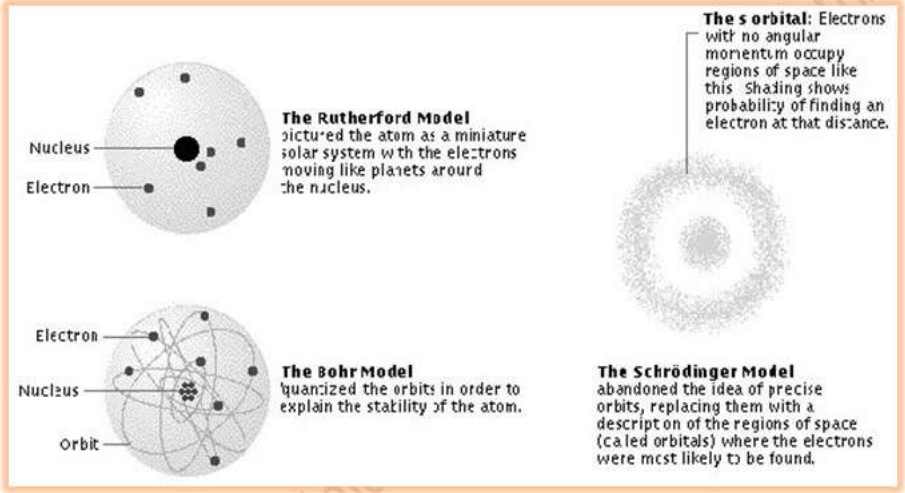
বুঝানো যায়। কিন্তু এর দ্বারা এটম থেকে কেনো শুধুমাত্র বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন আলোকরশ্মি বিকিরণ হয় তা বুঝানো যায় না। পদার্থবিদ নীল্স বহ্র প্রথমে রাদারফোর্ডের এই মডেল দ্বারাই গবেষণা শুরু করেন। এরপর বলেন, ইলেকট্রন শুধুমাত্র বিশেষ 'ক্যুয়ান্টাইজ' [প্যাকেট অবস্থায়] প্রদক্ষিণ পথে চলতে পারে। এই মডেল দ্বারা হাইড্রোজেন এটমের কিছু বিশেষ চরিত্র সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলেও অন্য ক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হয়। এরপর এলো স্রোডিংগার মডেল। এটা আরো একধাপ এগিয়ে ইলেকট্রনের অবস্থা বুঝিয়ে দিল যে, ইলেকট্রন আসলে বিশেষ পথে ভ্রমণ করে না- বরং কিছু বিশেষ অবস্থানে এদের পাওয়া যায় যা একমাত্র সম্ভাবনা থেকে নির্ণিত হতে পারে। এই মডেলও কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক নয়- কারণ এর দ্বারা সকল পদার্থ থেকে বিকিরণ-স্পেকট্রামের উপর কিছুটা সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়- বা এটা বুঝাতে সক্ষম কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। সুতরাং এই গ্রন্থ লেখা

পর্যন্ত এটমের নতুন মডেল তৈরীর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে যদ্বারা যাবতীয় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত এটমিক চরিত্র বুঝানো যায়।

ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা এটমকে অনেকটা সৌরজগতের গতিবিধির মতো বুঝানো হয়েছে। অথবা বলা যায় হাইড্রোজেন এটমের ক্ষেত্রে পৃথিবী-চন্দ্র সিস্টেমের মতো। বলা হতো, পৃথিবী এটমের নিউক্লিয়াস যাকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন চন্দ্রের মতো প্রদক্ষিণ করে। আগের দিনের নিউটনিয়ান ফিজিক্স বলে, ইলেকট্রনে আছে ইনারশা নামক একটি গতি যার মাধ্যমে সে সর্বদাই সোজা লাইনে চলে যেতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু কেন্দ্রে স্থাপিত পজিটিভ চার্জসম্পন্ন প্রটনের ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স ইলেকট্রনের ইনারশার [বা সোজা চলার শক্তির] উপর বিজয়ী হয়ে তার চলার পথকে বৃত্তাকার প্রদক্ষিণে রূপান্তর করে। আগের ফিজিক্স এটাও বলতো যে, ইলেকট্রন থেকে এনার্জি ইলেকট্রমেগনেটিক বিকিরণ হিসাবে বেরিয়ে আসার কারণ হলো তাদের চলার রাস্তায় বক্রতা সৃষ্টি। কিন্তু এই এনার্জি বিকিরণ থিওরি যদি মানা হয় তাহলে ইলেকট্রনের জীবন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের হতে বাধ্য। কারণ বক্রতার মধ্যে সে সর্বদাই যদি চলে তাহলে অচিরেই তার যাবতীয় এনার্জি বিকিরণ করে সে নির্জীব হয়ে গতি হারিয়ে নিউক্লিয়াসে পতিত হয়ে যাবে। বাস্তবে তো তা হয় না। এটম শত শত বছর এমনকি কোনো কোন ক্ষেত্রে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর পর্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে। সুতরাং এটমে যে স্থিতিশীলতা আছে তা বুঝানোর দরকার; ক্যুয়ান্টাম থিওরি তা-ই করে।

আগের পৃষ্ঠার ছবিতে আমরা এটমের বিভিন্ন মডেল দেখেছি। এসব ভিন্ন মডেল কেনো উপস্থাপন করা হয় তার উপর কিছু ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। ক্যুয়ান্টাম থিওরিতেও এটমকে একটি নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ইলেকট্রনদের প্রদক্ষিণরত মনে করা হয়। কিন্তু পার্থক্য হলো ইলেকট্রন কোনো বিশেষ প্রদক্ষিণ পথে না চলে অনিশ্চিত রাস্তায় চলে- আর কোনো বিশেষ ক্ষণে এদের অবস্থান ও মমেন্টাম [ফোর্স] এর সম্ভাব্যতা মাত্র জানা আমাদের নিকট সম্ভব। এই অনিশ্চয়তা হেতু আমাদেরকে হতাশ হওয়ার কিছু নেই- কারণ, আমরা যদি ইলেকট্রনকে ‘তরঙ্গ’ মনে করি তাহলে ইতোমধ্যে বর্ণিত ‘ডি ব্রোগাইল ওয়েভলেন্থ্’ দ্বারা সঠিকভাবে ইলেকট্রনের চরিত্রকে উপস্থাপন করতে পারি।

সদাচলন্ত তরঙ্গ হিসাবে ইলেকট্রনকে দেখতে হবে। তখন এর গতিকে একটি 'স্টেন্ডিং ওয়েভ' হিসাবে বুঝানো যাবে। স্টেন্ডিং তরঙ্গ ওসব তরঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয় যখন সদাচলন্ত তরঙ্গ একটি বিশেষ দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই দূরত্ব হেতু তরঙ্গ তার নিজের মধ্যে ইন্টারফেয়ার করে এবং মনে হয় এটা স্বস্থানে অনড় আছে। ব্যাপারটি আরো বুঝতে হলে তারের বাদ্যযন্ত্রের কথা ভেবে দেখা যায়। যখন কোনো তারের মধ্যে শিল্পী সুর সৃষ্টি করতে মৃদু আঘাত হানেন তখন তারে সৃষ্টি হয় 'স্টেন্ডিং তরঙ্গ'। এর ফলে বেশ কিছুক্ষণ সুরটি স্থায়ী থাকে। তারের দৈর্ঘ্য অথবা যেটুকু দূরত্ব তরঙ্গ দ্বারা তারের মধ্যে বিস্তৃত আছে তার পুরো তরঙ্গদৈর্ঘ্য কিংবা অর্ধেক তরঙ্গদৈর্ঘ্যরে সমান হবে। এসব দূরত্বের ভেতর সৃষ্ট তরঙ্গটি উভয়প্রান্তে এসে লাফ মেরে ফিরে এসে ইতিবাচকভাবে নিজে নিজেই ইন্টারফেয়ার করে। এর ফলে তরঙ্গটি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। একইভাবে ইলেকট্রন তরঙ্গ নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে একটি দূরত্ব দখল করে রাখে যার ফলে এটি একটি পুরো কিংবা অর্ধেক তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত ভ্রমণ শেষে নিজে নিজেই আবার ফিরে আসে। একে বলে লুপিং। এরফলে ইলেকট্রন তরঙ্গে নিজে নিজে কন্সট্রাকটিভ ইন্টারফেরেন্স সৃষ্টি হয় এবং তা স্থিতিশীলতা অর্জন করে। পাশে অঙ্কিত খসড়া চিত্রটি দেখুন।
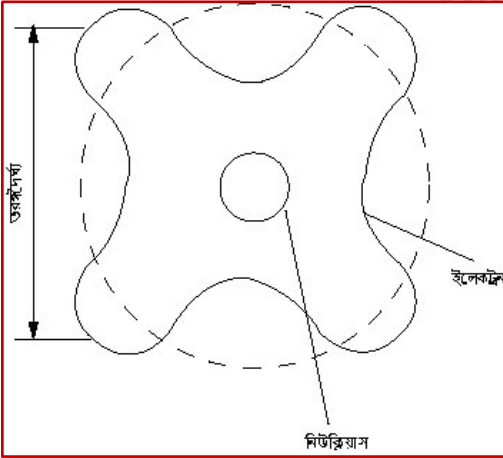
কিন্তু কোনো ইলেকট্রন তরঙ্গ, তরঙ্গদৈর্ঘ্যরে সমান কিংবা অর্ধ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যরে সমান দূরত্ব ছাড়া অন্য কোনো দূরত্বে থাকলে খুব জটিল ইন্টারফেরেন্সের মুখোমুখি হয়ে অস্থিতিশীল হবে। সুতরাং স্থিতিশীল এটমের নিউক্লিয়াস থেকে একটি ইলেকট্রন নিজের ইন্টারফেরেন্স হেতু তরঙ্গের মতো চলে এবং তার মধ্যে থাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ এনার্জি। যে অনুমতিপ্রাপ্ত পথে ইলেকট্রন

তরঙ্গ সংঘটিত হয় তাকে বলে পরিধিরেখা। এই পরিধিরেখার মধ্যে ক'টি তরঙ্গ আছে তার উপর নির্ভর করে এনার্জির মাত্রা। আর এটাকেই বলে 'ইলেকট্রনের এনার্জি লেভেল'। এই এনার্জি লেভেলের অপর নাম অরবিট্যাল [orbital]। নিচের চিত্র ও এর ক্যাপশন পড়ুন।
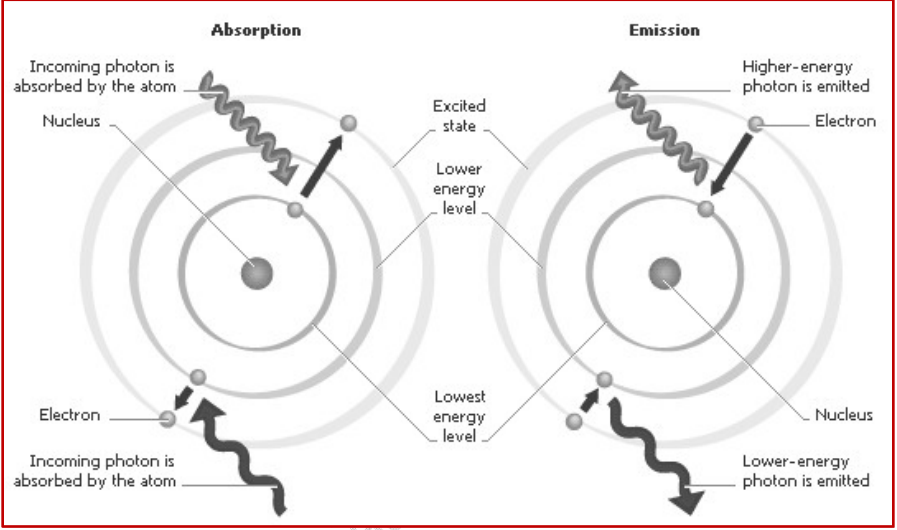
আলোকরশ্মি চুষা ও বিকিরণ হওয়া: *যখন আলোকরশ্মির এনার্জির একটি প্যাকেট বা ফটোন এটম দ্বারা চুষা হয় তখন এটম ফটোনের এনার্জি গ্রহণ করে। এর ফলে এটমের একটি ইলেকট্রন উচ্চ এনার্জি লেভেলে লাফ মেরে উঠতে পারে। এই অবস্থায় এটমটি 'অস্থির' অবস্থা ধারণ করে। অপরদিকে যখন কোন অস্থির এটমের একটি ইলেকট্রন নিম্ন এনার্জি লেভেলে পড়ে যায় তখন এটম ইলেকট্রনের অতিরিক্ত এনার্জি ফটোন হিসাবে ছেড়ে দিতে পারে। এই চিত্রে অরবিট্যাল বা এনার্জি লেভেল অত্যন্ত সহজভাবে দেখানো হয়েছে।*

একমাত্র বিশেষ পরিধিরেখা এবং এরফলে এনার্জি লেভেল গ্রহণযোগ্য হতে পারে তাই বিজ্ঞানীরা বলেন, এনার্জি লেভেলগুলো 'ক্যুয়ান্টাইজড্'। এর অর্থ লেভেলের এনার্জি একমাত্র নির্দিষ্ট কিছু মান নিতে পারে। যেসব এলাকায় ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা বেশী সেসব অঞ্চলকে বলে অরবিট্যাল। নিচের চিত্রে আমরা

হাইড্রোজেন এটমের স্পেকট্রেল রেখা সৃষ্টির কারণ দেখিয়েছি। ক্যাপশনটি পাঠ করুন- এতে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হতে সহায়ক হবে।
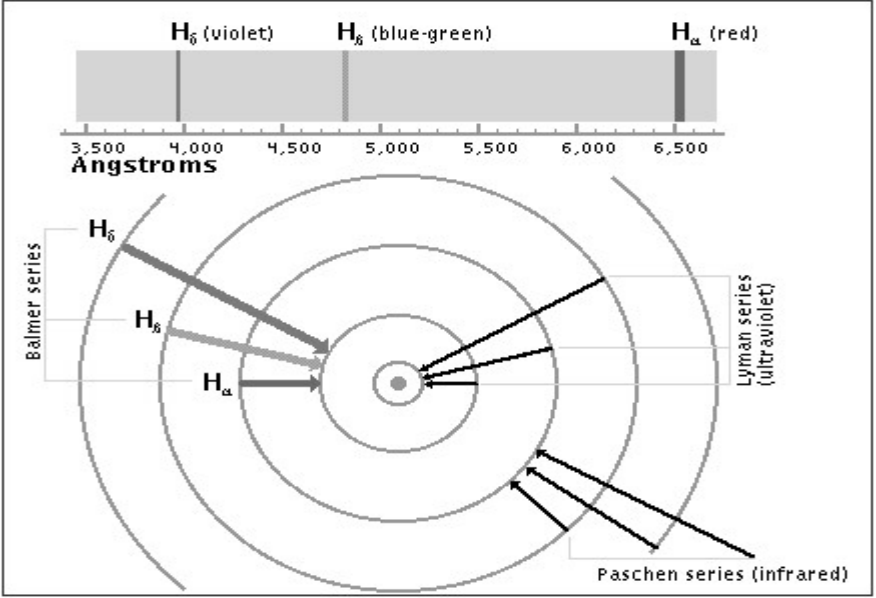
হাইড্রোজেন এটমের স্পেকট্রেল রেখা সৃষ্টির কারণ: *যখন হাইড্রোজেন এটমের ইলেকট্রন এক এনার্জি স্তর থেকে অপরটিতে লাফ মারে তখন ইলেকট্রন থেকে বেরিয়ে আসে একটি ফটোন। এই ফটোনের মধ্যে থাকে নির্দিষ্ট কিছু এনার্জি। এই ফটোনকে স্পেকট্রোস্কোপের মধ্যে বিকিরণ বা এমিশন রেখা হিসাবে দেখা যায়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এসব এনার্জি স্তরের আবিষ্কার করেছিলেন। তাই তাদের নামানুসারে বিভিন্ন সিরিজের নামকরণ হয়েছে। যেমন উপরের চিত্রে দেখানো পারশেন, লেইম্যান ও বালটিমার সিরিজ। পারশেন সিরিজে ইলেকট্রন চতুর্থ বা এর উর্ধ্বের স্থর থেকে তৃতীয় স্তরে নেমে আসে। এতে এটম থেকে বিকিরণ হয় অদৃশ্য ইনফ্রারেড তরঙ্গ। লেইম্যান সিরিজের ইলেকট্রন চতুর্থ, তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে লাফ মারে- এই স্তরকে বলে গ্রাউন্ড স্টেজ। এই ট্রানজিশন থেকে বিকিরণ হয় অদৃশ্য আলট্রাভাইলোট তরঙ্গ। বালটিমার সিরিজের ইলেকট্রন দ্বিতীয় স্তরে ট্রানজিট করে ফলে দৃশ্যমান আলোকরশ্মির ফটোন বিকিরণ হয়। রশ্মির রংও কোন স্তর থেকে লাফ মারা হয়েছে তার উপর নির্ভরশীল।*

ক্যুয়ান্টাম থিওরি দ্বারা ব্যাখ্যায়িত এটম থেকে আমরা মৌলিক পদার্থের পিরিওডিক টেবিলকে আরো গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া আধুনিক যুগে এসে বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তারা ক্যুয়ান্টাম থিওরির উপরই ভরসা করে সমাধান খুঁজছেন। কারণ এ পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞান আমাদেরকে ক্যুয়ান্টাম থিওরি থেকেও আরো কোনো উন্নতমানের ও যথার্থ থিওরি উপহার দেয়নি।

প্রাকৃতিক চার শক্তি

পদার্থবিজ্ঞানীরা এখন নিশ্চিত হয়েছেন যে পুরো মহাবিশ্ব মোট চারটি মৌলিক প্রাকৃতিক শক্তি বা ফোর্সের ক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ। এই চারটি 'ফান্ডামেন্টাল' [fundamental] শক্তিই সবকিছুকে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই ফোর্স চতুষ্ঠয় নিয়ে তাই আধুনিক যুগে গভীর গবেষণা চলছে। গ্রন্থের এই শেষ অধ্যায়ে মহাবিশ্বের পরিচলন-ক্রিয়ার পেছনের এসব মৌলিক শক্তির স্বরূপ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রাখি। জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার এই অপূর্ব পদ্ধতি সত্যিই ঈমানদারের হৃদয়কে আরো বেশী আনুগত্যশীল করে তুলবে। পাঠকরা এই অধ্যায় পাঠের শেষে হয়তো বলবেন, বস্তুজগতকে পরিচালনার কী অপূর্ব কৌশল! বস্তুর মধ্যস্থ এসব ফিজিক্যাল শক্তি কে এঁটে দিলো এবং এগুলো সর্বদা সেখানে ক্রিয়াশীল রাখলো? বিজ্ঞানী ও অবিজ্ঞানী সবাই একবাক্যে বলতে বাধ্য: এ সব কিছুই মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের রব্বুবিয়াত বা পালনকারিতার আওতাভুক্ত।

যে চারটি ফোর্সের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সবকিছু অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে এগুলো হলো: ১. মহাকর্ষ [gravitation], ২. বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি [electromagnetic force], ৩. দুর্বল আনবিক শক্তি [weak nuclear force] এবং ৪. প্রবল আনবিক শক্তি [strong nuclear force]। এখন আমরা একে একে এগুলোর উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

উপরোক্ত চার শক্তির উপর বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে বস্তু সম্পর্কে মৌলিক কিছু ব্যাপার আরো বেশী অবগত হতে হবে। এই চার শক্তি ওসব

'ইলেমেন্টারী পার্টিকল' [elementary particle] এর উপর ক্রিয়া করে। সুতরাং এটম, ইলেকট্রন, নিউট্রন ও প্রটনের আসল চরিত্র ও স্বরূপ না জানলে আমরা ঐ শক্তি চতুষ্টয়ের পরিচয় সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবো না।
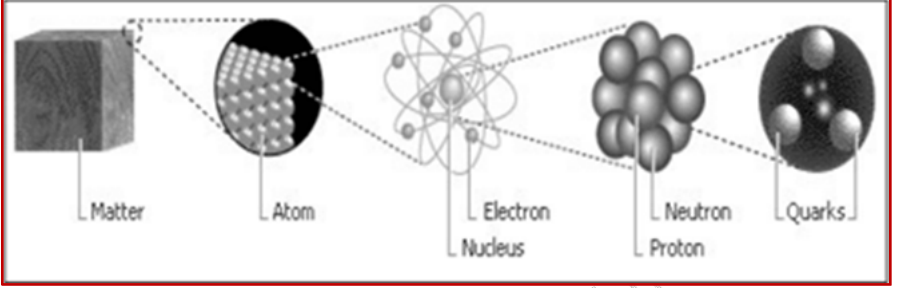
বস্তুর কাঠামো : *সাধারণ বস্তুর মধ্যস্থ গভীরতম স্তরে ক্রমান্বয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে বস্তু মূলত 'কুয়ার্ক' নামক ক্ষুদ্রতম কণার দ্বারা সৃষ্ট। একাধিক কুয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত হয় নিউক্লিয়াস, এটা পরমাণুর মাঝখানে অবস্থান করে যার মধ্যে ইলেকট্রন ক্লাউড সর্বদা ঘুর্ণমান আছে। একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে ঘটিত হয় একেকটি ইউনিট যাকে 'মলিকিউল' বা অণু বলে। আর অনেক মলিকিউল নিয়ে বস্তু গঠিত।*

মৌলিক কণা

যখন কোনো কণাকে ভেঙ্গে আর কোনো ক্ষুদ্র কণায় রূপান্তর সম্ভব হয় না তখন একে আমরা মৌলিক কণা বা ইলেমেন্টারী পার্টিকল বলতে পারি। তবে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় মৌলিক কণা বলা হয়, এমন কিছু কণাও আছে, যেগুলোকে আসলে ভাঙ্গা যায়- ঠিক ভাঙ্গা নয় বলতে হয়, এগুলো একাধিক আরো ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে সৃষ্ট। এ কারণেই সত্যিকার অর্থে যেসব কণাকে আর ক্ষুদ্র করা সম্ভব হয় না ওগুলোর ক্ষেত্রে 'ইলেমেন্টারী' [প্রাথমিক] শব্দের বদলে 'ফান্ডামেন্টাল' [মৌলিক] শব্দ ব্যবহার আরো যথার্থ। যা হোক এসব মৌলিক কণার দ্বারাই যাবতীয় বস্তুজগৎ সৃষ্ট।

বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ কুয়ার্ক বলে আমরা মনে করি সত্য কিন্তু ভবিষ্যতে আরও ক্ষুদ্র কোনো বস্তু মিলে যেতে পরে- সেটা অসম্ভব নয়। এক সময় আমরা পরমাণু বা এটমকেই বস্তুর সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ ভাবতাম। এই দু'শ বছর পূর্বে ডালটন নামক এক বৃটিশ স্কুল মাস্টার খুব জোরালোভাবে বললেন, স্বভাবের সকল বস্তু ক্ষুদ্র অংশ 'এটম' দ্বারা সৃষ্ট। এরপর আরো একশত বছর পরে আবিষ্কার হলো ইলেকট্রন এবং সবাই বললেন- কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস ও একে ঘূর্ণনরত ইলেকট্রন নিয়েই এটম গঠিত। ১৯৩০ সালের দিকে এসে এই ধারণাও পাল্টে গেল। পরীক্ষা ও গবেষণা করে দেখা গেল কেন্দ্রও একাধিক ক্ষুদ্র অংশের সমন্বয়ে সৃষ্ট- এসব অংশের নামকরণ করা হলো প্রটন ও নিউট্রন। এখানেই কিন্তু শেষ নয়- আজকের বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রটন ও নিউট্রনও মূলত আরো ক্ষুদ্রতম কিছু কণা দ্বারা গঠিত- এসব কণার নাম কুয়ার্ক [quark]। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, কুয়ার্ক ও এসাথে তিনটি ভিন্ন কণা সত্যিকার অর্থে মৌলিক বলা চলে। অতিরিক্ত তিনটি হলো 'লেপটন' [lepton], 'বোসন' [boson] এবং 'হিগ্স বোসন' [higgs boson]। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে এসব কণার উপর আরোও বিস্তারিত বলার আশা রাখি।

ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম কণার উপর গবেষণা চালিয়ে এখন বিজ্ঞানীরা এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন যে, তারা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু মূলত দু'টি কাঠামোর যে কোনো একটির উপর নির্ভরশীল: ১. ফারমিওন্জ [fermions] এবং ২. বোসোন্জ [bosons]। যে কোনো এটম কিংবা ছোট-বড় বস্তু যেমন আপনার বাড়ি বা গাড়ির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী নির্ভর করে এই দু'টির উপর; এটা ফারমিওন না বোসন। তবে হ্যাঁ, এই পার্থক্য সাধারণভাবে বড়ো বস্তুর ক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য নয়। আমরা যখন এটম ও মৌলিক কণা-পরমাণু নিয়ে চিন্তা-গবেষণা চালাবো তখন এই পার্থক্য সত্যিই খুব গুরুত্ববহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। সুতরাং সকল মৌলিক কণা ফারমিওন্জ ও বোসন্জ এই দু'টি ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করতে হবে। প্রথমটি থেকে সৃষ্ট এটম ও অন্যান্য বিরল কিছু কণা এবং দ্বিতীয়টি কণার মধ্যে বিভিন্ন ফোর্স 'ক্যারী' [পরিচলন] করে ও তাদের ভর বা ম্যাস প্রদান করে। আমরা এখন এ দু'টোর উপর আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ফারমিওন্স

ইতালিয়ান-আমেরিকান পদার্থবিদ এনরিকো ফার্মি -এর নামানুসারে এই ক্লাসের সকল মৌলিক কণাকে 'ফারমিওন্স' বলা হয়। এটমের যাবতীয় কণা যেমন ইলেকট্রন, প্রটন এবং নিউট্রন সবই ফারমিওন্স। গত শতকের দ্বিতীয় দশকে ফার্মি কিছু গাণিতিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করেন যদ্বারা ফারমিওনের বিভিন্ন গুণাবলী ও চরিত্র বুঝিয়ে দেওয়া যায়। ফারমিওন্স দু' ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমটি হলো মৌলিক ও দ্বিতীয়টি কম্পোজিট বা যুক্ত ফারমিওন্স। প্রথমটিকে আর বিভক্ত করা যায় না এবং দ্বিতীয়টি একাধিক আরও ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত। যুক্ত ফারমিওনের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো ক্ষুদ্র কণার সংখ্যা সর্বদাই বে-জোড় হয়ে থাকে। মৌলিক ফারমিওন আবার দু' ধরনের: লেপটন [lepton] ও কুয়ার্ক। লেপটনের অন্তর্ভুক্ত নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে চলন্ত ঋণাত্মক [নেগিটিভ] চার্জসম্পন্ন ইলেকট্রন। কুয়ার্কসমূহ দ্বারা কেন্দ্রের চার্জহীন নিউট্রন ও ধনাত্মক [পজিটিভ] চার্জসম্পন্ন প্রটন সৃষ্ট।

লেপটনও মৌলিকভাবে দু' ধরনের। একটি চার্জসম্পন্ন আর অপরটি নিউট্রিনো [neutrino]। বিজ্ঞানীরা এই দু'ধরনের লেপটনকে তিনটি দলে বা গ্রুপে বিভক্ত করেছেন। এদেরকে জেনারেশনও বলে। প্রত্যেক জেনারেশনে একটি চার্জসম্পন্ন লেপটন ও একটি নিউট্রিনো থাকবেই। প্রাত্যহিক অকৃত্রিম বস্তু শুধুমাত্র এই প্রথম জেনারেশনের হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জেনারেশনের লেপটন উচ্চ এনার্জিসম্পন্ন কণা-সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়। আমাদের বায়ুমণ্ডল বা বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে এসব সংঘর্ষ বাঁধতে পারে। বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রে বাইর মহাকাশ থেকে আগত 'কজমিক রে' নামক কণা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় সেখানকার [অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের] কণার সঙ্গে। বিজ্ঞানীরা পার্টিকল এক্সেলেরেটর দ্বারা টার্গেটে নিয়ে কণাকে অপর কণার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে থাকেন। অনুরূপ সংঘর্ষ মহাকাশের দূর-দূরান্তে তারাদের বিস্ফোরণকালে কিংবা অন্য কোনো বড়ো কজমিক বিস্ফোরণের সময়ও হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জেনারেশনের লেপটনের আয়ুষ্কাল এক সেকেন্ডেরও কম সময় স্থায়ী থাকে- এরপর এরা অন্য স্থিতিশীল কণায় রূপান্তর হয়।

প্রথম জেনারেশনের লেপটন হলো ইলেকট্রন [W¯] এবং ইলেকট্রন নিউট্রিনো [v-e]। একটি ইলেকট্রনের মধ্যে মোট চার্জ হলো: -১ x মৌলিক চার্জ। মৌলিক চার্জ হলো একটি সংখ্যা যা কুলম্ব ইউনিটে মাপা হয়ে থাকে। এই সংখ্যা = ১.৬০২ x $১০^{-১৯}$ কুলম্ব [C]। একটি ইলেকট্রনের ভর = ৫১১ keV/c^2। keV/c^2 মানে- কিলো ইলেকট্রন ভল্ট / আলোকের গতি x আলোকের গতি। ইলেকট্রনের ভর বা ম্যাস এতো ক্ষুদ্র যে কিলোগ্রাম, গ্রাম ইত্যাদি দ্বারা মাপা আদৌ সম্ভব নয় তাই বিজ্ঞানীরা উপরোক্ত উপায়ে এগুলো মেপে থাকেন। ইলেকট্রন নিউট্রিনোর মধ্যে কোনো চার্জ নাই। এর ওজন হয়তো শূন্য হবে আর তা না হলে এটা এতোই ক্ষুদ্র ভরসম্পন্ন যে, বিজ্ঞানীরা এখনও মাপার কোনো উপায় খুঁজে পান নি।

দ্বিতীয় জেনারেশনের লেপটন হলো মিউওন [μ] এবং মিউওন নিউট্রিনো [muon neutrino] [v_μ]। মিউওনের মধ্যে চার্জের পরিমাণ হলো: -১ x $১০^৬$ MeV/c^2 । MeV/c^2 এর অর্থ হলো মিলিয়ন ইলেকট্রন ভল্ট / আলোকের গতি x আলোকের গতি। বুঝাই যাচ্ছে এসব লেপটন ইলেকট্রন থেকে অনেক ভারী। সকল নিউট্রিনোর মতো মিউওন নিউট্রিনোয় কোনো চার্জ নেই। এদের ওজনও নেই বললেই চলে। যদি থেকে থাকে তাহলে এখনও তা নির্ণিতকরণ সম্ভব হয় নি।

তৃতীয় জেনারেশনের লেপটনকে বলে τ [টাও] লেপটন τ এবং τ নিউট্রিনো [vτ]। লেপটনের চার্জ: -১ x ১.৭৭ GeV/c^2 । এখানে GeV/c^2 অর্থ হলো গাইগা বা ১ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভল্ট / আলোকের গতি x আলোকের গতি। τ লেপটনের ওজন যে অনেক ভারী তা বুঝাই যাচ্ছে- বাস্তবে তা নিউট্রিনোর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। অন্যান্য নিউট্রিনোর মতো টাও নিউট্রিনোর মধ্যেও কোনো চার্জ নেই এবং এর ভর শূন্য কিংবা এর এতো কাছাকাছি যে তা মাপা যায় নি।

কুয়ার্ক হলো অন্য ধরনের ফার্মিওন। এদের ইলেকট্রিক চার্জ খুব অল্প এবং তারা কোনো সময়ই একা নয়। তারা সর্বদাই জোড়া কিংবা তিনটি একই সাথে

থাকে। তবে লেপটনের মতো এদের মধ্যে মূল দু'টি ধরন এবং তিনটি জেনারেশন আছে। সাধারণ বস্তুতে আছে প্রথম জেনারেশনের দু'টি মাত্র কুয়ার্ক। লেপটনের মতো কণার সংঘর্ষের মাধ্যমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জেনারেশনের কুয়ার্ক সৃষ্টি করা হয়। মূল দু' ধরনের কুয়ার্ক হলো 'আপ-টাইপ' [up-type] ও 'ডাউন-টাইপ' [down-type]। এগুলো প্রথম জেনারেশনের দু'টি কুয়ার্কের নাম। আপ-টাইপ কুয়ার্কে আছে +২/৩ ইলেকট্রিক চার্জ। আর ডাউন-টাইপ কুয়ার্কের ইলেকট্রিক চার্জ হলো -১/৩। লক্ষ করুন সাধারণত ইলেকট্রিক চার্জ হলো +১ কিংবা -১। এখানে উভয়টি একের কম। নামগুলো দ্বারা শুধুমাত্র চার্জের পার্থক্য নির্ণয় করা উদ্দেশ্য আর কিছু নয়।

ইলেকট্রিক চার্জ ছাড়াও কুয়ার্কের মধ্যে 'রঙ্গিন চার্জ' [ঈড়ষড়ৎ ঈযধৎমব] বিদ্যমান। রঙ্গিন চার্জ ইলেকট্রিক চার্জের মতোই তবে এগুলো মৌলিক চার শক্তির একটি- 'ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির' বদলে, অপরটি- 'শক্তিশালী আনবিক শক্তির' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটু পরই এই শক্তির উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবো। এখানে এটাই বলে রাখি, এই শক্তিটি এটমের কেন্দ্রে ক্রিয়া করে কেন্দ্রকে ধরে রেখেছে। এখানে রঙ্গিন চার্জ দৃশ্যমান কোনো রং বুঝাচ্ছে না, বরং এ ক্ষেত্রেও অন্যান্য কুয়ার্কের মতো এটির আলাদা বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র বুঝাতে যেয়ে রঙ্গিন চার্জ নামকরণ করা হয়েছে মাত্র। তিনটি মাত্র সম্ভাব্য মান যে কোনো কালার-কুয়ার্কে হতে পারে: লাল, নীল এবং সবুজ। যে কোনো কুয়ার্ক যে কোনো রঙের হতে পারে। কুয়ার্কের কালার-চার্জ সর্বদাই পরিবর্তন হয়।

প্রথম জেনারেশনের দু'টি কুয়ার্কের নাম আপ-কুয়ার্ক ও ডাউন-কুয়ার্ক। এই জোড়া একত্রিত হয়ে এটমের নিউক্লিয়াসের কণাদ্বয় প্রটন ও নিউট্রন তৈরী হয়। আপ-কুয়ার্কের ইলেকট্রিক চার্জ +২/৩ আগেই বলেছি। এর ম্যাস ১.৫ এবং ৫ MeV/c^2 এর ভেতর। অপরদিকে একটি ডাউন-কুয়ার্কের ইলেকট্রিক চার্জ - ১/৩ এবং ম্যাস ৩ থেকে ৯ MeV/c^2 এর মধ্যে।

এবার আসুন দ্বিতীয় জেনারেশনের দু'টি কুয়ার্কের কথায়। এদের একটির নাম 'চার্ম' [charm] আর অপরটিকে বলে 'স্ট্রেঞ্জ' [strange]। প্রথমটি আপ-টাইপ

ও এর চার্জ +২/৩ এবং দ্বিতীয়টি ডাউন-টাইপ এবং তার চার্জ -১/৩। চার্মের ম্যাস ১.১ থেকে ১.৪ MeV/c² এর মধ্যে। স্ট্রেঞ্জের ম্যাস ৬০ থেকে ১৭০ MeV/c² এর মধ্যে। এখন বাকী রইলে তৃতীয় জেনারেশনের কুয়ার্ক। এদের নাম 'টপ' [top] ও 'বটম' [bottom]। টপ কুয়ার্ক আপ-টাইপ কুয়ার্ক এবং তার চার্জ +২/৩ ও ভর ১৭০ MeV/c² । বটম ডাউন-টাইপ কুয়ার্ক যার চার্জ -১/৩। বটমের ভর ৪.১ থেকে ৪.৪ MeV/c² এর মধ্যে।

যুক্ত বা কম্পোজিট ফারমিওন্জ

মৌলিক ফারমিওন্জ যুক্ত হয়ে অপর আরো ফারমিওন্জ তৈরী হয়। যদি কোনো কণার মধ্যে বে-জোড় সংখ্যক ফারমিওন্জ থাকে তাহলে এরা সকল মৌলিক ফারমিওনজের মতো চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। একের অধিক বে-জোড় মৌলিক ফারমিওন্জসম্পন্ন কণাকে বলে কম্পোজিট বা যুক্ত ফারমিওন্জ। আর জোড় সংখ্যক ফারমিওন্জসম্পন্ন কণা আর ফারমিওন্জ থাকে না- এটাকে বলে বোসন। আমরা একটু পরই এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো।

অতি সাধারণ যুক্ত ফারমিওন্জ হলো তিনটি কুয়ার্কের তৈরী ফারমিওন। আর এই তিনটি দ্বারা সৃষ্ট কণাটির নাম 'ব্যারিওন' [barion]। এই ক্লাসের কণার মধ্যে আছে এটমের নিউক্লিয়াসের নিউট্রন ও প্রটন। যুক্ত ফারমিওনের আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। কোনো পাথর, তারা বা এমনকি মানবদেহে যদি বে-জোড় সংখ্যক মৌলিক ফারমিওন্জ থাকে তাহলে এটাকে কম্পোজিট ফারমিওন্জ হিসাবে ক্লাসিফাই করা হবে।

প্রটন ও নিউট্রন আপ-কুয়ার্ক ও ডাউন-কুয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট। এগুলোকে ধরে রাখতে এক ধরনের বোসন কাজ করে যাচ্ছে যাকে বলা হয় 'গ্লুওন' [gluon]। এই গ্লুওন এক কুয়ার্ক থেকে আরেকটিকে কালার রদবদল করার কাজে আছে। সর্বদা গ্লুওন এক্সেঞ্জ ও কালার পরিবর্তনের মাধ্যমেই পুরো পার্টিকল বা কণাটি জড়োত হয়ে থাকে। একটি প্রটন তৈরী হয়েছে দু'টি আপ-কুয়ার্ক ও একটি ডাউন-কুয়ার্ক দ্বারা। সুতরাং এ তিনটি কুয়ার্কের ইলেকট্রিক চার্জের ফলাফল = +২/৩+২/৩-১/৩ = +১। প্রটনের মধ্যে তাই চার্জ হলো +১। এর ম্যাস = ৯৩৮

MeV/c^2 । অপরদিকে এটমের কেন্দ্রস্থ নিউট্রন একটি আপ-কুয়ার্ক ও দু'টি ডাউন-কুয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং এসব কুয়ার্কের চার্জের যোগফল = +২/৩-১/৩-১/৩ = ০/৩ = ০। এ কারণেই নিউট্রনে কোনো চার্জ নাই। তবে এর ম্যাস হলো ৯৪০ MeV/c^2 ।

আরো অনেক ধরনের বেরিওন্জ আছে। তবে অধিকাংশই অস্থির ও খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে থাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জেনারেশনের কুয়ার্ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'লামদা' ও 'সিগমা' বেরিওন্জ গ্রুপের কথা বলা যেতে পারে। এসব কণায় আছে স্ট্রেঞ্জ, চার্ম ও বটম কুয়ার্ক।

বোসন্জ

ইলেমেন্টারী পার্টিকলের মধ্যে যে দু'টি মৌলিক ভাগ আছে তার একটি তথা ফারমিওন্জ সম্পর্কে আমার ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় মৌলিক অংশের নাম বোসন্জ। এগুলোর অধিকাংশ মূলত ফান্ডামেন্টাল পার্টিকল- অর্থাৎ মৌলিক কণা যাদেরকে আর ভাগ করা যায় না। বস্তুর কণার মধ্যে এনার্জি যাতায়াতের কাজ ও বড়ো আয়তনের কাঠামোকে একত্রে জড়িত রাখার কাজে নিয়োজিত আছে এই মৌলিক কণা। মেসন [mason] নামক আরেক কণা আছে যারা মূলত বোসনের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু একাধিক কণার সমন্বয়ে সৃষ্ট। ভারতের প্রখ্যাত পদার্থবিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে বোসন নামকরণ হয়েছে। তিনিই সর্বপ্রথম আইনস্টাইনের সাথে মিলে বোসনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেন।

ইতোমধ্যে বর্ণিত ফার্মিওন্জ ও বোসনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পলি এক্সক্লোশন প্রিন্সিপাল [polly exclusion principle] নামক পদার্থবিজ্ঞানের একটি আইন আছে। ফার্মিওন্জ এই আইন মানে আর বোসন্জ মানে না। এই আইনে বলা হয়েছে, একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের একাধিক ফারমিওন্জ একই স্থানে অবস্থান করতে পারবে না। এই একই আইন বোসনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সুতরাং দু'টি একই চরিত্রসম্পন্ন বোসন্জ একই স্থানে অবস্থান করতে পারে। এছাড়া আরো একদিক থেকে বোসন ও ফারমিওনজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান- এটির নাম

হলো 'স্পিন' বা মোড়। মোড় মূলত কোনো কণার ঘূর্ণনের মাপ। স্থায়ী অপরিবর্তনশীল সংখ্যা h/2µ -এর গুণফল হলো মোড়। এখানে h হলো প্লাংক কন্সটেন্ট = ৬.৬২৬ x ১০^{-৩৪}। ভিন্ন কণার মধ্যে ভিন্ন ঘূর্ণন মান আছে- তবে সবই উপরোক্ত ফিক্স সংখ্যার গুণফল। বোসনের স্পিন নাম্বার সবই আস্ত সংখ্যা যথা: ০, ১, ২ ইত্যাদি। অপরদিকে ফারমিওনজের স্পিন নাম্বার সবই ১/২ এর বে-জোড় গুণ যেমন: ০.৫, ১.৫, ২.৫ ইত্যাদি।

বোসনের ধরন

দু'টি প্রধান গ্রুপে বোসন বিভক্ত। প্রথম গ্রুপ হলো মৌলিক বা ইলেমেন্টারী- এগুলো একক। ফারমিওন্জ দ্বারা সৃষ্ট বস্তু বা মেটারে এনার্জি ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এসব মৌলিক বোসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অপর গ্রুপকে বলে মেসন্জ। এগুলো যুক্ত বা কম্পোজিট কণা। মেসন্জ এটমের মধ্যস্থ সকল কণাকে একত্রে জড়িত রাখে।

ইলেমেন্টারী বোসন্জ

এগুলোকে মধ্যস্থতাকারীও বলে। কারণ এসব বোসন্জই স্বভাবের মৌলিক চার শক্তিকে ক্যারী করে থাকে। আমরা ইতোমধ্যে এই চারটি শক্তির কথা উল্লেখ করেছি: ইলেকট্রমেগনেটিক, সবল আনবিক, দুর্বল আনবিক ও মহাকর্ষ- এই হচ্ছে চার শক্তি। এই শক্তিগুলোর উপর আরো বিস্তারিত একটু পরই তুলে ধরা হবে। যেসব কণার মধ্যে ইলেকট্রিক চার্জ বিদ্যমান এগুলোর মধ্যস্থ ইন্টারেকশন বা মিথস্ক্রিয়া ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। যে বোসনে ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তি ক্যারী করে তার নাম হলো ফটোন। দ্বিতীয়ত সবল আনবিক শক্তির মাধ্যমে কুয়ার্ক নামক কণা একত্রিত থাকে। আর কুয়ার্ক দ্বারাই এটমের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউট্রন ও প্রটন সৃষ্টি। কুয়ার্ক দ্বারা আরোও বেশ কিছু কণা তৈরী হয়েছে। যে বোসনে সবল শক্তিকে ক্যারী করে তার নাম গ্লুওন। দুর্বল আনবিক শক্তি বস্তুর ক্ষয়কে এবং রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনটি বোসন দুর্বল শক্তিকে ক্যারী করে- এগুলোকে D+ D- এবং Z বোসন বলে। মহাকর্ষ হলো দু'টি ভরসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ শক্তি। আনবিক স্কেলে অবশ্য এই শক্তিটি চারটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। যে বোসন এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম গ্র্যাভিটন [graviton]। মিডিয়েটিং বা

মধ্যস্থতাকারী বোসন দ্বারা বিভিন্ন কণা একটা আরেকটার সাথে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত আছে। এ পর্যন্ত জানা যাবতীয় ইলেমেন্টারী বোসন এরূপ মধ্যস্থতাকারী হিসাবেই পাওয়া গেছে। আর ইলেমেন্টারী বোসনের সংখ্যা আরো বাড়তেও পারে বলে অনেকে ধারণা করেন।
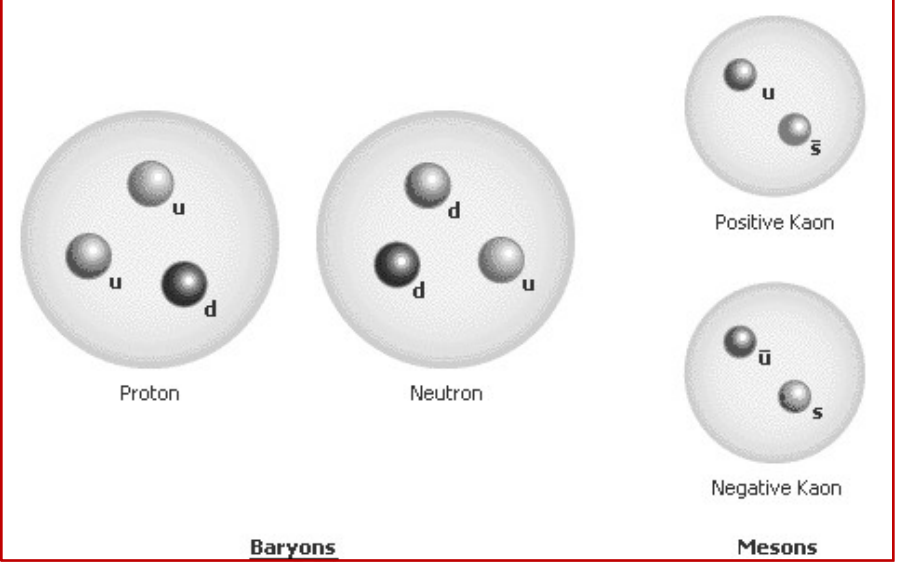
এটমের অভ্যন্তর: *এটমের ভেতরে যেয়ে আমরা যা পাই তার একাধিক চিত্র এখানে দেখানো হয়েছে। বায়ের চিত্রে আছে এটমের কেন্দ্রে অবস্থিত প্রটন ও এর মধ্যস্থ তিনটি কুয়ার্ক। কুয়ার্ক মোট ৬ ধরনের: ১. আপ কুয়ার্ক (u), ২. ডাউন কুয়ার্ক (d), ৩. চার্ম কুয়ার্ক (c), ৪. স্ট্রেঞ্জ কুয়ার্ক (s), ৫. টপ কুয়ার্ক (t) এবং ৬. বটম কুয়ার্ক (h)। কুয়ার্কের বিপরীত আরেক কুয়ার্ক আছে এটাকে এ্যন্টিকুয়ার্ক বলে। বর্ণিত কুয়ার্কগুলোর সঙ্গে যেসব অক্ষর জড়িত আছে ওগুলোর উপরে একটি টান থাকলে বুঝতে হবে এই কুয়ার্কটি এ্যন্টিকুয়ার্ক। একাধিক কুয়ার্ক যুক্ত হয়ে কণার সৃষ্টি করে যাদেরকে সাধারণত বেরিওন্জ বলা হয়। চিত্রে দেখানো প্রটন ও নিউট্রন উভয়ই বেরিওন। কুয়ার্ক ও এ্যন্টিকুয়ার্কের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় মেসন্জ। অপরদিকে অস্থিতিশীল মৌলিক কণা +কেওন ও -কেওন উভয়ই মূলত মেসন। বেরিওন্জ সাধারণ প্রাত্যহিক বস্তুর এটমে বিদ্যমান আর মেসন উচ্চ গতিশীল সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়।*

ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির মধ্যস্থতাকারী ফোটন কণায় আছে ঘূর্ণন বা স্পিন মাত্রা ১। এর নেই কোনো ভর বা ইলেকট্রিক চার্জ। তবে সে-ই একই বিপরীত চার্জসম্পন্ন কণার মধ্যে আকর্ষণ ও সম-চার্জসম্পন্ন কণার মধ্যে বিকর্ষণ শক্তি যোগান দেয়। এই ফোটনই ঋণাত্মক দু'টি ফারমিওন্জ যেমন ইলেকট্রনকে একটা আরেকটা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে শক্তি যোগায়। আর এর কারণ হলো ফোটন মমেন্টাম নামক শক্তি ক্যারী করে। ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী মমেন্টাম = ভর x গতি। কিন্তু ফোটনের ভর নেই - আছে শুধু উচ্চতর গতি, তথা আলোকের গতি। সুতরাং ভর না থাকলেও তার গতি থেকে যথেষ্ট মমেন্টাম শক্তির সৃষ্টি হয় যা একটি ইলেকট্রনের উপর ক্রিয়া করতে পারে। যখন দু'টি ইলেকট্রন একটা আরেকটাকে দূরে ঠেলে দেয় তখন একটি ইলেকট্রন থেকে ফোটন রিলিজ হয় এবং তা আরেকটি চুষে নেয়। আর এই রদবদলের মধ্যে উভয় ইলেকট্রন একটি শক্তির কবলে পড়ে একে অন্যকে দূরে ঠেলে দেয়। এই অবস্থা বুঝা যাবে যদি দু'ব্যক্তি পিচ্ছিল কোনো মেঝের উপর দাঁড়িয়ে খুব ভারী একটি বস্তুতে একে অন্যের নিকট ছুড়োছুড়ি করে। বস্তুটি লওয়ার সময় এতে সৃষ্ট মমেন্টাম ব্যক্তির দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে ঐ ব্যক্তি কিছুটা পেছনের দিকে এমনিতেই চলে যাবে।

গ্লুওন নামক বোসনে আছে স্পিন মাত্রা ১। এটিরও ভর কিংবা ইলেকট্রিক চার্জ নেই। এটি ফোটনের মতো নিউট্রেল। কিন্তু গ্লুওনের মধ্যে একটি অতিরিক্ত গুণ আছে যা অন্যদের মধ্যে নেই। এই গুণটিকে বলে 'কালার চার্জ' বা রঙ পরিবর্তন। এই চার্জ ইলেকট্রিক চার্জের অনুরূপ কিন্তু একই জিনিস নয়। এই চার্জ সবল আনবিক শক্তির জন্য জরুরী। এতে আছে তিনটি কালার ও তিনটি এ্যন্টিকালার। এ কথাগুলো শোনতে দুর্বোধ্য মনে হয়। একটু পরই পরিষ্কার হবে- চিন্তার কারণ নেই। তিন ধরনের সম্ভাব্য কালার আছে গ্লুওনে- লাল, নীল ও সবুজ। আর তিন ধরনের সম্ভাব্য এ্যন্টিকালারও আছে- এগুলোকে সায়ান, হলুদ ও মেজেন্টা [কোন কোনো সময় এ্যন্টিলাল, এ্যন্টিনীল ও এ্যন্টিসবুজ] বলে। এখন এসব ব্যাপার আরো স্পষ্ট করার সময়। বাস্তবে প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যেসব রঙ দেখি ওগুলোর সঙ্গে গ্লুওনের নামে সামঞ্জস্য হেতু এটা ভাবা ঠিক নয় যে, ওগুলো রঙ। পদার্থবিদরা এই নামকরণ তাহলে কেনো করলেন? আসলে রঙ্গের মিশ্রণের ফলাফলের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য আছে! যেমন আমরা যখন তিনটি প্রাইমারী রঙ

তথা লাল, নীল ও সবুজ আলোকরশ্মি একত্রিত করি তখন তা সাদায় রূপান্তরিত হয়। একইভাবে তিনটি কালার চার্জের ইন্টারেকশন দ্বারা একটি কণা তৈরী হয় যার মধ্যে কোনো কালার চার্জ থাকে না। আর কালার ও এ্যান্টিকালার একত্রিত করলে ফলাফল দাঁড়ায় রঙহীনতা।

গ্লুওনে মোট আটটি কালার-চার্জ কম্বিনেশন বা সংযুক্তি সম্ভব। এর ৬টি এক রং ও এসাথে ভিন্ন এ্যান্টিকালার। দৃষ্টান্ত: লাল ও এ্যান্টিনীল, সবুজ ও এ্যান্টিলাল। বাকী দু'টো সংযুক্তি জটিল। গ্লুওনের কাজ হলো কুয়ার্কের মধ্যে সবল শক্তি ক্যারী করা। গ্লুওনের মাধ্যমে একত্রিত একাধিক কুয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট কণার নাম হেড্রন [hedron]। হেড্রন দু'টি পরিবারভুক্ত: মেসন্জ ও বেরিওন্জ। মেসনে আছে একটি কুয়ার্ক ও একটি এ্যান্টিকুয়ার্ক। এ্যান্টিকুয়ার্ক ওসব কণাকে বলে যাদের ইলেকট্রিক ও কালার চার্জ কুয়ার্কের বিপরীত। বেরিওনে আছে তিনটি কুয়ার্ক ও তিনটি এ্যান্টিকুয়ার্ক। এটমের কেন্দ্রস্থ প্রটন ও নিউট্রন মূলত বেরিওন। প্রথমটি ইলেকট্রিক্যালী চার্জসম্পন্ন ভারী কণা ও দ্বিতীয়টি চার্জশূন্য কণা। গ্লুওন কুয়ার্কদেরকে একত্রে রাখে তাদের মধ্যে [অর্থাৎ কুয়ার্কদের মধ্যে] সর্বদা কালার-চার্জ রদবদলের মাধ্যমে। এর ফলে কুয়ার্কের কালার সর্বদা পরিবর্তন হতে থাকে।

ডব্লিউ ও জেড বোসন দুর্বল আনবিক শক্তিকে ক্যারী করে। এ দু'টোই একমাত্র মৌলিক বোসন যাদের মধ্যে ভর [ম্যাস] আছে। উভয়ের মধ্যে স্পিনের মান হলো ১, এবং কোনো কালার-পরিবর্তন নেই। ডব্লিউ+ এবং ডব্লিউ- বোসনের ম্যাস ৮০ গিগা ইলেকট্রন ভল্ট/আলোকের গতি x আলোকের গতি [৮০ GeV/c^2]। আর জেড বোসনের ভর ৯১ গিগা ইলেকট্রন ভল্ট / আলোকের গতি x আলোকের গতি [৯১ GeV/c^2]। ডব্লিউ+ ও ডব্লিউ- বোসনে যথাক্রমে +১ ও -১ ইলেকট্রিক চার্জ বিদ্যমান। জেড বোসন নিউট্রেল অর্থাৎ চার্জশূন্য।

দুর্বল আনবিক শক্তির ইন্টারেকশনের সময় কিংবা যে কোনো ক্রিয়ার সাথে যদি দুর্বল শক্তি জড়িত থাকে তাহলে, ক্ষয়কৃত একটি কণা তার চরিত্র বদলে দেয়। এসময় এই কণা থেকে নির্গত হয় দুর্বল শক্তি মধ্যস্থতাকারী একটি বোসন। এই দুর্বল বোসন ক্ষয় হয়ে অন্য কণায় রূপান্তর হয়। সচরাচর ঘটে যাওয়া একটি

মিথস্ক্রিয়ার নাম 'বিটা ক্ষয়'। এই ক্ষয়ের মাধ্যমে প্রটন নিউট্রনে রূপান্তর হয়। এই ক্রিয়ার শুরু হয় যখন প্রটনের একটি কুয়ার্ক অন্য ধরনের কুয়ার্কে রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরকালে কুয়ার্ক থেকে একটি ডব্লিউ+ বোসন নির্গত হয়। ফলে প্রটন নিউট্রনের রূপ ও চরিত্র ধারণ করে। এদিকে সাথে সাথেই ডব্লিউ+ বোসন ক্ষয় হয়ে একটি পজিট্রন ও একটি ইলেকট্রন নিউট্রিনো-তে রূপান্তর হয়। পজিট্রন হলো ক্ষুদ্র কণা যার মধ্যে +১ চার্জ বিদ্যমান। ইলেকট্রন নিউট্রিনো হলো পাতলা ক্ষুদ্র কণা যার মধ্যে কোনো চার্জ থাকে না। এটা ইলেকট্রিক্যালী নিউট্রেল তাই তার নাম হয়েছে নিউট্রিনো।

ও গ্রন্থ প্রকাশের সময় পর্যন্ত গ্র্যাভিটন নামক বোসনের সন্ধান মিলে নি। ধারণা করা হয় মহাকর্ষ শক্তির মধ্যে এই বোসনটি মধ্যস্থতাকারী। এই কণাটির অনুসন্ধান জোরেসুরে চলছে। মৌলিক কণাবিজ্ঞানীদের সকল থিওরি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গ্র্যাভিটন নামক একটি কণার অস্তিত্ব বিদ্যমান। গণিত বলে দিচ্ছে এই কণায় স্পিন হলো ২- এতে না আছে ভর কিংবা চার্জ। ভর ও চার্জশূন্য হওয়ায় একে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ পদার্থবিদদের মতামত হলো গ্রাভিটনই বিভিন্ন কণার মধ্যে মহাকর্ষ শক্তিকে ট্রান্সফার করার জন্য দায়ী, ঠিক যেভাবে ফোটন ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তিকে ট্রান্সফার করে।

উপরে বর্ণিত ইলেমেন্টারী বোসনগুলোর মধ্যে গ্রাভিটন ছাড়া বাকী সবগুলোর সন্ধান মিলেছে। ধারণা করা হয় আরো কিছু মৌলিক বোসন আছে যা অন্তত থিওরির মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায়। এসব থিওরিটিক্যাল ইলেমেন্টারী বোসনের মধ্যে একটি হলো তথাকথিত 'হিগ্স বোসন'। পার্টিকল ফিজিক্সে যেসব থিওরি দ্বারা মৌলিক কণা ও তাদের মধ্যস্থ মিথস্ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তাকে বলে 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল অব পার্টিকল ফিজিক্স' [standard model of particle physics]। তবে এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের মাধ্যমে কণা সম্পর্কিত সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝানো যায় না। যেমন, স্ট্যান্ডার্ড মডেল দ্বারা জানা যায় না, কেনো কোনো কোন কণায় ভর বা ম্যাস আছে আর কোনটিতে নাই কিংবা কিভাবে কণার মধ্যে ভর সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা সমাধানে 'হিগ্স বোসন' সহায়ক হবে যদি এগুলোর অস্তিত্ব থেকে থাকে। কারণ কিছু কিছু পদার্থবিদ মনে করেন এই বোসনই কণার মধ্যে ভর ক্যারী করে।

অর্থাৎ কণায় ভর বা ম্যাস সৃষ্টি হয় এই বোসনের ফলে। আর স্বয়ং হিগ্স বোসনের ভর অন্যান্য কণার তুলনায় বেশী হওয়ারও কথা। এই কল্পিত বোসন এখনও আবিষ্কার হয় নি কিন্তু। অনুসন্ধান চলছে।

ইলেমেন্টারী পার্টিকেলের দু'টি গ্রুপ তথা ফারমিওন্জ ও বোসনের উপর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষ এখানেই। আরো একটি কথা বাকী আছে তাহলো মেসন্জ নামক বোসন ও অন্যান্য যুক্ত বোসন্জ। কুয়ার্ক ও এ্যন্টিকুয়ার্ক দ্বারা মেসন্জ সৃষ্ট। এই কুয়ার্ক ও এ্যন্টিকুয়ার্ক নিজেরা ফারমিওনজের অন্তর্ভুক্ত হলেও মেসন্জ মূলত বোসনের দলভুক্ত। যুক্ত কণার মধ্যে কোনটিকে বলা হবে ফারমিওন আর কোনটি হবে বোসন এ ব্যাপারে একটি বিশেষ নীতি অবলম্বন করতে হয়। যদি কোনো যুক্ত কণায় বে-জোড় সংখ্যক কণা বিদ্যমান থাকে যারা নিজেরা সকলেই ফারমিওন্জ তাহলে পুরো যুক্ত কণাটিও ফারমিওন। অপরদিকে যদি এতে জোড় সংখ্যক ফারমিওন্জ থাকে তাহলে এটা আর ফারমিওন নয়- বোসন। মেসন্জ নামক যুক্ত কণায় আছে একটি কুয়ার্ক [ফারমিওন] আর আরেকটি এ্যন্টিকুয়ার্ক [ফারমিওন]- সুতরাং এটি একটি বোসন [জোড় ফারমিওন্জ থাকায়]। এই নীতি বড় বড় যুক্ত কণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন, মৌলিক পদার্থ পাতলা হিলিয়ামের কেন্দ্রে অবস্থান করে দু'টি প্রটন ও একটি নিউট্রন। এই উভয় কণা ফারমিওনের অন্তর্ভুক্ত কারণ, উভয়ের মধ্যে নিহিত আছে বে-জোড় সংখ্যক কুয়ার্ক। এই কারণে স্বয়ং পাতলা হিলিয়াম একটি ফারমিওন। অপরদিকে সাধারণ হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে আছে দু'টি নিউট্রন ও দু'টি প্রটন। সুতরাং একে আর ফারমিওনের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না- এটা বোসন। হিসাব করে দেখা গেছে মোট ৩৬টি মেসন্জ থাকার সম্ভাবনা আছে। কারণ কুয়ার্কের ও এ্যন্টিকুয়ার্কের সংখ্যা প্রত্যেকে ৬টি করে বিদ্যমান। প্রথম যে মেসনটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তার নাম পাইওন [μ]। এটি এটমের কেন্দ্রকে একত্রে জড়িত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা নিউট্রন ও প্রটনের মধ্যে সবল আনবিক শক্তিকে ক্যারী করে। ঠিক যেভাবে উপরে বর্ণিত গ্লুওন বিভিন্ন কুয়ার্কের মধ্যে সবল শক্তিকে ক্যারী করে।

মহাকর্ষ

প্রাকৃতিক চার ফোর্সের একটি হলো মহাকর্ষ। ইতোমধ্যে এই শক্তির সঙ্গে জড়িত আজো অনাবিষ্কৃত বোসন 'গ্র্যাভিটন' সম্পর্কে পাঠকদেরকে অবগত করেছি। তবে এখন মহাকর্ষের পরিচিতিমূলক কিছু তথ্যাদি তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। এই শক্তিটি সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী অবগত- কারণ এর ফলেই আমরা পৃথিবীর মাটিতে বিচরণ করি। মহাকর্ষের কারণেই লাফ মারলে আবার মাটিতে পড়ে যাই- আকাশ থেকে বৃষ্টি পতিত হয়, পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে, সৌরজগৎ থেকে তারাজগৎ, গ্যালাক্সি ও পুরো মহাবিশ্ব ঘূর্ণমান আছে। মহাকর্ষ এমন এক শক্তি যার কবল থেকে মুক্ত থাকা কোনো সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সম্ভব নয়। এই শক্তি পরমাণু-কণা থেকে কোটি কোটি আলোক বছর দূরত্বে অবস্থিত গ্যালাক্সিদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে। সুতরাং জগতের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ এই শক্তিটির উপর বিজ্ঞান কি বলে এবার একটু তলিয়ে দেখা যাক।

ইংরেজী শব্দদ্বয় 'গ্র্যাভিটি' [gravity] ও 'গ্র্যাভিটেশন' [gravitation] এর মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য তেমন বুঝা যায় না। কিন্তু বাস্তবে এর মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটি দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বুঝানো হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়টি হলো মহাকর্ষ বা এই শক্তি। আমরা এখানে বাংলায় প্রথমটি বুঝাতে 'মধ্যাকর্ষণ' ও দ্বিতীয়টি বুঝাতে 'মহাকর্ষ' শব্দ ব্যবহার করবো। মহাকর্ষ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। তবে অণু-পরমাণু থেকে মানুষ, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি ছোট্ট পরিসরে এই শক্তির মাত্রা এতোই ক্ষুদ্র যে, তা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু বড় বড় বস্তু যেমন আমাদের এই পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য, তারা, তারাপুঞ্জ, গ্যালাক্সি ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই শক্তির ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্ববহ।

পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ

আমরা আগের একটি অধ্যায়ে জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি সম্পর্কে আলোচনা কালে মহাকর্ষ কি তা বুঝিয়ে বলেছি। এ প্রসঙ্গে এই শক্তির প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে ক্রিয়াশীল আছে সেটাই বর্ণনা উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রথমেই এই শক্তির ক্রিয়া কিভাবে আমাদের গ্রহের মধ্যে বিদ্যমান আছে তার কিছু ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

মহাকর্ষের ধর্ম হলো বস্তুর কেন্দ্রের দিকে টান সৃষ্টি করা। আমাদের সবাইকে এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত টান-শক্তি ধরে রেখেছে। আমরা এই শক্তির কারণে নিজেদের মধ্যে ওজন অনুভব করি। এই মধ্যাকর্ষণ হেতু গর্ত খুড়ে লাফ মারলে পড়ে যাই আবার গাছ থেকে লাফ মারলে মাটিতে পতিত হই। মূলত পুরো পৃথিবীর উপর অসংখ্য ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কারণ এই মধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর মহাসাগরে যে দৈনিক জোয়ার ভাটা বা ঊর্মির সৃষ্টি হয় তা মূলত মহাকর্ষের কারণেই হয়। চন্দ্রের মহাকর্ষ তরল সাগর জলকে টেনে উপরের দিকে তুলে আবার সরে যাওয়ার পর তা পৃথিবীর মহাকর্ষের টানে নেমে আসে, এতে সৃষ্টি হয় বিশাল তরঙ্গমালা। মোটকথা এই শক্তিটির ফলেই সবকিছু যেভাবে পৃথিবীর উপর অস্তিত্ব বজায় রাখছে সেভাবে রাখছে। এই শক্তি যদি না থাকতো তাহলে আমাদের পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণনের ফলে সবাই মহাশূন্যে ছিটকে পড়তাম। শুধু তাই নয় পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণু-কণার সমন্বয়ে সৃষ্ট মহাকর্ষের মোট শক্তি হেতু পুরো পৃথিবীটা জড়িত হয়ে আছে।

সব বস্তুর সমষ্টিগত শক্তি সব বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় সদা-বিদ্যমান। কিন্তু বিপরীতমুখী শক্তিও আছে যাকে বলে বাইরের দিকে ধাবিত প্রেসার বা চাপ। উভয় শক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি ব্যালান্স- সুতরাং কেউ কারো উপর চূড়ান্ত বিজয়ী না হওয়ার ফলে সবকিছু সুরক্ষিত আছে। বস্তুর অস্তিত্ব বজায় রাখার কী অপূর্ব কৌশল! একইভাবে সূর্যসহ সকল তারা, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদিও অস্তিত্বশীল আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভেতরের দিকে টানকে যদি বাইরের দিকে ধাবিত চাপ দ্বারা আটকে রাখা না হতো তাহলে বস্তু ক্রমান্বয়ে আয়তনে ছোট্ট হতে থাকতো। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু। তারাদের কেন্দ্রে যখন ফিউশন প্রতিক্রিয়া স্তিমিত হয়ে যায় তখন বাইরের দিকে সৃষ্ট চাপশক্তি কমে আসে। মহাকর্ষ ও এই চাপের মধ্যে আর ব্যালান্স অবশিষ্ট থাকে না- ফলে পুরো তারাটাই তার নিজের উপর কলাপ্স হয়ে আয়তনে ছোট্ট হতে থাকে। এই উপায়েই গ্যালাক্সির কেন্দ্রে 'ব্ল্যাক হোল' নামক বস্তুর সৃষ্টি হয়।

ওজন

ওজন আসে কোত্থেকে? কেউ ৬০ কেজি আর কেউ ১০০ কেজি হওয়ার আসল কারণ হলো মহাকর্ষ। বাস্তবে যে কোনো বস্তু যখন পৃথিবীর উপর পতিত হয় তখন মহাকর্ষ এর গতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ত্বরণ বা এক্সেলেরেশন সৃষ্টি করে। এই ত্বরণকে বলে, মহাকর্ষের কারণে ত্বরণ। ওজন = বস্তুর ভর [কতটুকু বস্তু আছে তার একটি মাপ] x মহাকর্ষের কারণে ত্বরণ। মহাকর্ষের ত্বরণ হলো ৯.৮১ মিটার/সেকেন্ড x সেকেন্ড- অর্থাৎ পতিত বস্তুর গতি প্রতি সেকেন্ডে ৯.৮১ মিটার করে বৃদ্ধি পাবে। এই ত্বরণ সকল বস্তুর ক্ষেত্রে সমান- বস্তুর ভর যেটাই থাকুক না কেন। সুতরাং একটি পাখির পালক ও একটি লোহার বলকে যদি একই সঙ্গে একই উচ্চতা থেকে মাটির দিকে ছাড়া হয় তাহলে তারা উভয়ে একই সঙ্গে পতিত হবে- তবে হ্যাঁ বাতাসের কারণে পালকের মধ্যে বিপরীত শক্তি তথা ফ্রিকশন হবে বেশী ক্রিয়াশীল- ফলে পালকটি পড়তে সময় নিবে বেশী। কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিকশন শক্তিহীন অবস্থায় যেমন বাতাসশূন্য একটি টিউবের মধ্যে পালক ও বল উভয়ই একই গতিতে পৃথিবীর উপর পতিত হবে।

বস্তুর ওজন বদলাতে পারে কিন্তু তার মধ্যস্থ ভর বিনা কারণে বদলাবে না। বস্তু পৃথিবী থেকে যতো ঊর্ধ্বে উঠবে তার মধ্যে ত্বরণ গতিও ততো কমে আসবে। এর কারণ হলো পৃথিবীর মহাকর্ষ সব স্থানে একই নয়। আর যেহেতু ওজন অর্থ এই ত্বরণ তাই ওজনও ভিন্ন হবে। মনে করুন কোনো ১৬ কেজি ওজনের একটি বস্তুকে যদি ৪ হাজার মাইল উপরে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এই বস্তুর ওজন কমে মাত্র ৪ কেজিতে নেমে আসবে। মহাকর্ষের ফলেই ওজন; যেখানে তা বেশী ওজনও বেশী আর যেখানে কম ওজনও কম- বস্তুর ভর বা ম্যাস পরিবর্তন জরুরী নয়। চন্দ্রের উপর আপনি যদি অবতরণ করেন তাহলে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অনুভব করবেন। সেখানে নিজের ওজন কমে মাত্র ৬ ভাগের এক ভাগে নেমে আসবে। সুতরাং পৃথিবীতে ৭২ কেজি ওজন নিয়ে আপনাকে থাকতে হয়েছিল, চন্দ্রে গিয়ে থাকতে হবে ৭২/৬= ১২ কেজি ওজন নিয়ে! অবশ্য কিছুদিন প্র্যাকটিস শেষে আপনি বেশ অনন্দ-ফুর্তিও করবেন নিঃসন্দেহে। সেখানে লাফ মেরে দশ-পনর মিটার পর্যন্ত অতিক্রম করা আপনার জন্য মোটেই কোনো ব্যাপার নয়!

পৃথিবী থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে বস্তুর মধ্যে কোনো ওজন থাকে না। এই পয়েন্টটি মূলত পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে মহাকর্ষের কেন্দ্র বা সেন্টার পয়েন্ট। এই স্থানটি পৃথিবী থেকে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার কিমি এবং চন্দ্র থেকে ৩৮ হাজার কিমি দূরে অবস্থিত। এখানে কোনো বস্তু থাকলে তার উপর উভয় দিক থেকে সমপরিমাণ ত্বরণ বিদ্যমান থাকবে। ফলে বস্তুটি ওজনশূন্য হয়ে পড়বে।

মহাকর্ষের আধুনিক থিওরি

আমরা ক্লাসিক্যাল নিউটনিয়ান থিওরির বর্ণনা এ প্রসঙ্গে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি না। এর মূল কারণ হলো আধুনিক যুগে পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত যে থিওরিটি সবাই মোটামুটি গ্রহণ করে নিয়েছেন তার নাম 'জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি'; এটা নিউটনের থিওরি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এছাড়া অত্যাধুনিক কুয়ান্টাম থিওরি দ্বারা কণার মধ্যস্থ মহাকর্ষ কিভাবে মিথস্ক্রিয়া করে তা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা ইতোমধ্যে 'গ্রাভিটন' নামক বোসনের কথা উল্লেখ করেছি। এই বোসন আবিষ্কার এখনও হয় নি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এর সন্ধান মিলবে। কুয়ান্টাম থিওরি এই কণার অস্তিত্বের সম্ভাবনার দিকে শক্তিশালী ইঙ্গিত দেয়। এটার সন্ধান মিললে মহাকর্ষের আসল কারণ আমাদের অনেকটা জানা হয়ে যাবে। তবে আমাদেরকে এটা নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে হবে যে, সৃষ্টি ও এর অস্তিত্ব বজায় থাকতে অপর তিনটি মৌলিক ফোর্সের মতো মহাকর্ষও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

উপরে উল্লেখিত আইনস্টাইনের থিওরির মধ্যে কুয়ান্টাম থিওরি জড়িত নয়। গ্রাভিটনকে সঙ্গে নিয়ে আইনস্টাইনের থিওরির সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি নতুন মহাকর্ষের থিওরি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুরো বিংশ শতাব্দিব্যাপী হয়েছে- তবে কোনো সফলতা ছাড়াই। এরপরও বিজ্ঞানীরা থেমে নেই। বৃটিশ পদার্থবিদ স্টিফেন হোকিং গেল শতকের সত্তুর দশকে গণিত ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ব্ল্যাক হোলের একটু বাইরে শক্তিশালী মহাকর্ষ শক্তির টানের মধ্যেও এই কুয়ান্টাম মেকানিক্যাল ক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হতে পারে এক ধরনের কণা ও 'কুয়ান্টা' যা ব্ল্যাক হোলের প্রভাব

থেকে মুক্ত হতে সক্ষম। এ উপায়ে ব্ল্যাক হোলের এনার্জি 'ডাকাতি' হওয়ার পদ্ধতি খুলে যেতে পারে!

বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি

শত শত বছর যাবৎ বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রিক ও চুম্বকের মধ্যস্থ শক্তিকে আলাদা শক্তি হিসাবেই বিবেচনা করে আসছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধে এসে এ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলেন গবেষকরা। কারণ এসময় থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছিল যে উভয় শক্তির মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। এরপর ক্রমে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকশক্তি মূলত একই ফোর্সের দু'টি দিক মাত্র। সুতরাং উভয় ফোর্সকে শেষ পর্যন্ত এক হিসাবে সাব্যস্ত করে নামকরণ করা হয়, ইলেকট্রমেগনেটিজম [electromagnetism]। কণার মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ক্রিয়ার কারণ এই ফোর্স। এছাড়া বেশ আগে থেকেই এটা জনা হয়ে গিয়েছিল যে, আলোকরশ্মি মূলত ভ্রমণকারী এই ইলেকট্রমেগনেটিক এনার্জি ছাড়া আর কিছু নয়। এরপর কুয়ান্টাম মেকানিক্সের জনকরা আরো একধাপ এগিয়ে বললেন, বস্তু ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্সের মাধ্যমে আলোক এনার্জির 'প্যাকেটস্' [পরবর্তীতে ফটোন নামে পরিচিত] নির্গত করে ও চুষে নেয় যখন চার্জকৃত কণার মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি ক্রিয়া করে।

এখন এটা জানা হয়ে গেছে, যে কোনো কণার মধ্যে ইলেকট্রিক চার্জ থাকলেই তা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি 'অনুভব' করে। অপরদিকে বৈদ্যুতিকভাবে নিউট্রেল বা চার্জশূন্য কোনো কণা যেমন নিউট্রিনো এই শক্তি অনুভব করে না। ফটোন এই ফোর্সের বাহক। কিন্তু বাহক হলেও তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো চার্জ কিংবা ভর [ম্যাস] নাই। সুতরাং চার্জ না থাকায় যে ফোর্স তারা বহন করে তার প্রভাব থেকে মুক্ত। নিউট্রিনো ও অন্যান্য চার্জশূন্য কণার এ্যন্টিকণাও আছে। কিন্তু ফোটনের তা-ও নেই। বাস্তবে ফোটন নিজেই তার এ্যন্টিকণা। ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্সের একটি দৃষ্টান্ত হলো এই: দু'টি ইলেকট্রন একে অন্যকে দূরে ঠেলে দেয় এ কারণে যে, উভয়ের মধ্যে নেগিটিভ বা ঋণাত্মক চার্জ বিদ্যমান। এই দূরে ঠেলে দেওয়ার কারণ হলো দু'টির মধ্যে একটি ইলেকট্রন একটি ফোটন ছাড়ে বা রিলিজ করে আর

অপরটি তা চুষে বা গ্রহণ করে নেয়। আর ফোটনে সৃষ্ট মমেন্টাম তথা গতি থেকে সৃষ্ট এনার্জির ফলে ঠেলাঠেলির জন্ম হয়।

আমরা ইতোমধ্যে ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশনের মাধ্যমে কিভাবে আলোকরশ্মি, রেডিও, ইনফ্রারেড, এক্স-রে, গামা-রে, বিটা-রে, আলট্রাভাইলোট রেডিয়েশন ইত্যাদি তরঙ্গ বিকিরণ হয় তা জেনেছি। স্বভাবের চার শক্তির অন্যতম এই শক্তিটির ফলেই এসব তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে আলোকের গতিতে দূর-দূরান্তে যেয়ে পৌছে। আধুনিক যুগে এই রেডিয়েশনকে যোগাযোগ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হচ্ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে। শব্দ ও ছবি এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রেরণ করা হচ্ছে। এই শক্তির ফলেই দূরবর্তী তারা থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। আমাদের সূর্য থেকেও মাত্র আট মিনিটের মধ্যে এই শক্তি আলোকরশ্মি ও সেসাথে তাপশক্তি নিয়ে পৃথিবীর মাটিতে এসে পৌঁছে যায়। এরূপ উচ্চগতিতে এনার্জি স্থানান্তরের কৌশল মানবসৃষ্ট কিছু নয়- বরং স্বভাবের একটি মৌলিক শক্তির কারসাজি। আর কী অপূর্ব এই কারসাজি!

দুর্বল আনবিক শক্তি

এই মৌলিক শক্তির ফলে এটমের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে ক্ষয় হতে পারে। এই ক্ষয় হওয়ার অর্থ মূলত পরিবর্তন- ধ্বংস নয়। এক ধরনের এটম পরিবর্তিত হয়ে অপরটিতে রূপান্তর হয় মাত্র। এই শক্তিকে দুর্বল বলার কারণ হলো সবল ও ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির তুলনায় এটি অনেক দুর্বল। তিনটি কণা এই শক্তিকে বহন করে। এগুলোকে বলে ভেক্টার বোসন্জ। দুর্বলতার কারণে কুয়ার্কের মধ্যে যখন ইলেকট্রমেগনেটিক কিংবা সবল আনবিক শক্তির ক্রিয়া শুরু হয় তখন এই শক্তিটি প্রভাবহীন থাকে। কিন্তু এই উভয় শক্তির অবর্তমানে দুর্বল শক্তির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিউট্রিনো নামক নিউট্রেল কণার কথা বলা যেতে পারে। এতে না আছে ইলেকট্রিক চার্জ কিংবা কালার চার্জ। সুতরাং নিউট্রিনো সম্পর্কিত কোনো ক্রিয়া- হয় দুর্বল শক্তি না হয়, মহাকর্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। কিন্তু মহাকর্ষও এরূপ ক্ষুদ্র স্কেলে প্রায় সম্পূর্ণ প্রভাবহীন বিশেষ করে দুর্বল শক্তির তুলনায় এটা স্পষ্ট। সুতরাং নিউট্রিনো ইন্টারেকশনে প্রভাবশীল শক্তি হলো দুর্বল আনবিক শক্তি।

আমরা এই শক্তির ক্রিয়া বুঝাতে যেয়ে নিউট্রন ডিকে বা ক্ষয়ের কথা বলতে পারি। একটি নিউট্রন যখন ক্ষয় হয় তখন তা প্রটনে রূপান্তর করে। এই রূপান্তরকালে একটি ইলেকট্রন ও একটি ইলেকট্রন এ্যন্টিনিউট্রিনো নিউট্রন থেকে রিলিজ হয়ে আসে। এখন এই প্রতিক্রিয়ার জন্য ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তি কিংবা সবল আনবিক শক্তি দায়ী হতে পারে না। এর কারণ হলো, নিউট্রন ও এ্যন্টিনিউট্রিনো উভয়ই চার্জশূন্য- এতে ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স জড়িত থাকার সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে দিল; এবং এ্যন্টিনিউট্রিনো ও ইলেকট্রনে কোনো কালার চার্জও নেই- এতে বুঝা গেল সবল শক্তিও ক্রিয়া করছে না। সুতরাং বিটা ডিকে নামক এই তেজস্ক্রিয়ার জন্য দায়ী একমাত্র দুর্বল শক্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আগের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন ও ক্যাপশন পাঠ করুন।

তিনটি ভেক্টর বোসন দুর্বল শক্তিকে ক্যারী করে। এগুলোর পরিচয় আমরা উপরে পেয়েছি এরপরও আবার এখানে উল্লেখ করছি। ডব্লিউ+ [W^+], ডব্লিউ- [W^-] এবং জেড০ [Z^0] নামে এগুলো পরিচিত। ডব্লিউ বোসন ইলেকট্রিক্যাল চার্জ ক্যারী করে [+১ কিংবা -১] সুতরাং এগুলো ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তিকে ‘অনুভব’ করে। এ দু'টো একটি আরেকটির বিপরীত কণা বা এ্যন্টিপার্টিকল। কিন্তু চার্জশূন্য জেড কণা তার নিজেরই এ্যন্টিপার্টিকল। তিনটি বোসনই রঙশূন্য। সকল ভেক্টর বোসনের মধ্যে ভর বা ম্যাস বিদ্যমান। একমাত্র দুর্বল শক্তির বহনকারী কণায় ভর থাকে। অপর তিনটি দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত ক্রিয়াশীল শক্তির ক্যারিয়ার কণায় কোনো ভর নেই- আর এর ফলেই ওগুলো দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাবশীল- কিন্তু দুর্বল শক্তির ক্যারিয়ার কণায় ভর তুলনামূলকভাবে বেশী থাকায় এই শক্তির প্রভাব খুব অল্প দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ইতোমধ্যে আলোচিত মহাকর্ষের সঙ্গে জড়িত ক্যারিয়ার ‘গ্রাভিটন’, ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির ক্যারিয়ার ‘ফোটন’ এবং একটু পরই বর্ণিত স্ট্রং আনবিক শক্তির সঙ্গে জড়িত ক্যারিয়ার কণা ‘গ্লুওন’ এই তিনটিই মূলত ভরশূন্য কণা।

দুর্বল ফোর্স যখন কোনো কণায় ক্রিয়া করে তখন এই কণা থেকে উপরোক্ত তিনটি ভেক্টর বোসনের একটি নির্গত করে। এর ফলে কণাটি অন্য ধরনের কণায়

রূপান্তর হয়। এদিকে দুর্বল ভেক্টর বোসন নিজে ক্ষয় হয়ে অপর কণায় পরিবর্তিত হয়। যদি এই মিথস্ক্রিয়ার মূলে W^+ কিংবা W^- বোসন জড়িত থাকে তাহলে কণাটি ভিন্ন ইলেকট্রিক চার্জসম্পন্ন হয়ে বদলে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বিটা ডিকের কথা বলতে পারি। এই প্রতিক্রিয়ার সময় নিউট্রনের একটি ডাউন-কুয়ার্ক বদলে একটি আপ-কুয়ার্কে রূপান্তর হয় এবং নিউট্রন রিলিজ করে একটি ডব্লিউ বোসন। এই কুয়ার্কের ধরনের মধ্যে রদবদলের ফলে নিউট্রনটি বদলে প্রটনে পরিণত হয়ে যায়। কারণ এই ক্রিয়ার মাধ্যমে দু'টি ডাউন ও একটি আপ কুয়ার্ক দ্বারা সৃষ্ট নিউট্রনে অবশিষ্ট থাকে একটি ডাউন ও দু'টি আপ কুয়ার্ক - যার দ্বারা একটি প্রটন সৃষ্ট। নিউট্রন থেকে রিলিজকৃত ডব্লিউ বোসনও ক্রিয়া করে। এটা ক্ষয় হয়ে ইলেকট্রন ও এ্যান্টিইলেকট্রনে রূপান্তর হয়। Z° বোসনের মিথস্ক্রিয়ার ফলে কণা বদলে অপর একই চার্জসম্পন্ন কণাতে রূপান্তর হবে।
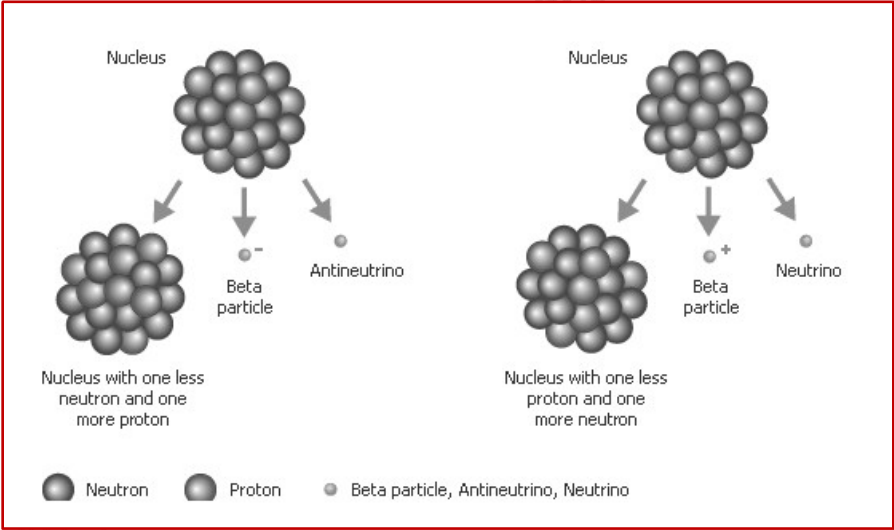
বিটা ডিকে: *দুই পদ্ধতিতে বিটা ডিকে সংঘটিত হতে পারে। চিত্রের বায়ে প্রথমটি দেখানো হয়েছে। দুর্বল শক্তির কবলে পড়ে একটি এ্যান্টিনিউট্রিনো ও একটি নেগিটিভ চার্জকৃত বিটা কণা নিউট্রন তার কেন্দ্র থেকে ছেড়ে দেয় ফলে এতে অবশিষ্ট থাকে একটি কম নিউট্রন ও একটি অতিরিক্ত প্রটন। অর্থাৎ নিউট্রন প্রটনে রূপান্তর হলো। অনুরূপ ডানে চিত্রিত উপায়েও একটি প্রটন নিউট্রনে রূপান্তর হয়।*

এ ক্ষেত্রে নিউট্রন থেকে নির্গত হয় একটি নিউট্রিনো ও পজিটিভ চার্জসম্পন্ন বিটা কণা। এই ডিকে বা ক্ষয়ের মাধ্যমে একটি এটম তার চরিত্র বদলে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থের এটমে রূপান্তর হয়।

একটি কুয়ার্ক বা লেপটন অপর কোনো কুয়ার্ক বা লেপটনে একমাত্র দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তর হতে পারে। সুতরাং সকল স্থিতিশীল বস্তুতে প্রথম জেনারেশনের কুয়ার্ক ও লেপটন থাকার একটি বিশেষ কারণ হলো দুর্বল আনবিক শক্তি। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় জেনারেশনের লেপটন ও কুয়ার্ক প্রথম জেনারেশনের লেপটন ও কুয়ার্কের তুলনায় ভারী থাকায় তারা খুব তাড়াতাড়ি প্রথম জেনারেশনের সদস্যে রূপান্তর হয়ে যায়। অন্যথায় স্থিতিশীলতা সম্ভব নয়। তারা এই ক্রিয়াকালে ডব্লিউ ও জেড বোসন রদবদল করে। মোটকথা রেডিওএক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত শক্তির নাম দুর্বল আনবিক শক্তি। এটা অস্থিতিশীল বস্তুতে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে এবং মৌলিক কণাকে রদবদলের মাধ্যমে এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে রূপান্তর করে। মৌলিক পদার্থ রদবদলের কী অপূর্ব কৌশল!

সবল আনবিক শক্তি

স্বভাবের চার শক্তির উপর আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রায় শেষ। এখন আমরা সবল আনবিক শক্তির উপর কিছু তথ্যাদি তুলে ধরছি। এই শক্তিটির ফলে আনবিক স্কেলে এটমের নিউক্লিয়াস স্থিতিশীলতা অর্জন করে। অর্থাৎ সবল নিউক্লিয়ার ফোর্সই এটমকে শক্তিশালী বন্ডের মাধ্যমে একত্রে রেখেছে। যে বোসন এই শক্তির ক্যারিয়ার কণা হিসাবে ক্রিয়া করে তার নাম স্বভাবতই ‘গ্লুওন’ রাখা হয়েছে। কারণ, এটা একাধিক কণাকে গ্লু করে বা এঁটে রাখে। নীচের (পরের পৃষ্ঠার) চিত্রটি দেখুন।

এই চিত্রে গ্লুওন নামক বোসনের ক্রিয়া দেখানো হয়েছে। সবল নিউক্লিয়ার ফোর্সের ক্যারিয়ার এসব গ্লুওন প্রটন ও নিউট্রনের কণা কুয়ার্ক ও এ্যন্টিকুয়ার্ককে একত্রিত রাখে। কুয়ার্ক ও এ্যন্টিকুয়ার্কের সমন্বয়ে যে কণার সৃষ্টি হয় তাকে সাধারণত হেড্রন বলে। সুতরাং নিউট্রন, প্রটন এবং কেওন [অস্থিতিশীল নিউক্লিয়াস] ইত্যাদি সবই হেড্রনের অন্তর্ভুক্ত। গ্লুওন কুয়ার্কের একটি গুণকে কাজে লাগিয়ে তার
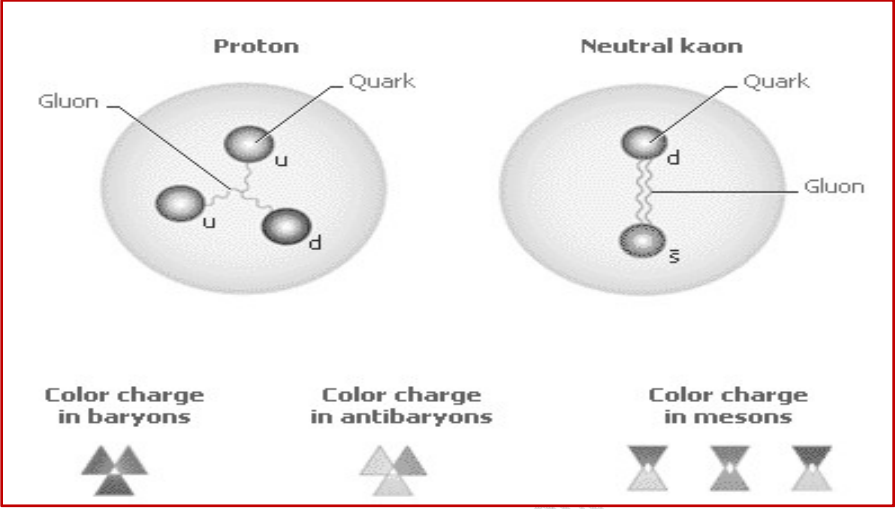
ডিউটি পালন করে। কুয়ার্কের এই গুণটির নাম কালার চার্জ। কালার চার্জ ও সবল শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা অনেকটা ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির মধ্যে সম্পর্কের অনুরূপ।

এই সবল শক্তির অস্তিত্বের একটি প্রমাণ হলো, কুয়ার্কে কুয়ার্কে যদি শুধুমাত্র ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স থাকতো তাহলে প্রটনের দু'টি আপ-কুয়ার্ক একে অন্যকে ঠেলে দূরে সরে দিত, কারণ উভয়ের মধ্যে আছে +১ চার্জ। কিন্তু স্ট্রং ফোর্স থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না- কারণ এটা ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তির তুলনায় অনেক বেশী হওয়ায় প্রটনের ভেতরে কুয়ার্কগুলো এঁটে থাকতে বাধ্য হয়। কালার চার্জ নামক একটি গুণ থেকে নির্দিষ্ট হয় কিভাবে সবল শক্তি ক্রিয়া করে। এ সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে।

নীচের (পরের পৃষ্ঠার) নক্সায় স্ট্রং শক্তি থেকে কণা-সৃষ্টির ক্রিয়া চিত্রিত হয়েছে। চিত্র [a]-তে একটি প্রটন দেখা যাচ্ছে। এতে আছে তিনটি পার্টিকল- যাদেরকে কুয়ার্ক বলে।

সবল আনবিক শক্তি এই কুয়ার্কগুলোকে ধরে রেখেছে। এনার্জিসম্পন্ন কণা গ্লুওন কালার-চার্জ রদবদলের মাধ্যমে কুয়ার্কগুলোকে আটকে রাখে। এই গ্লুওন
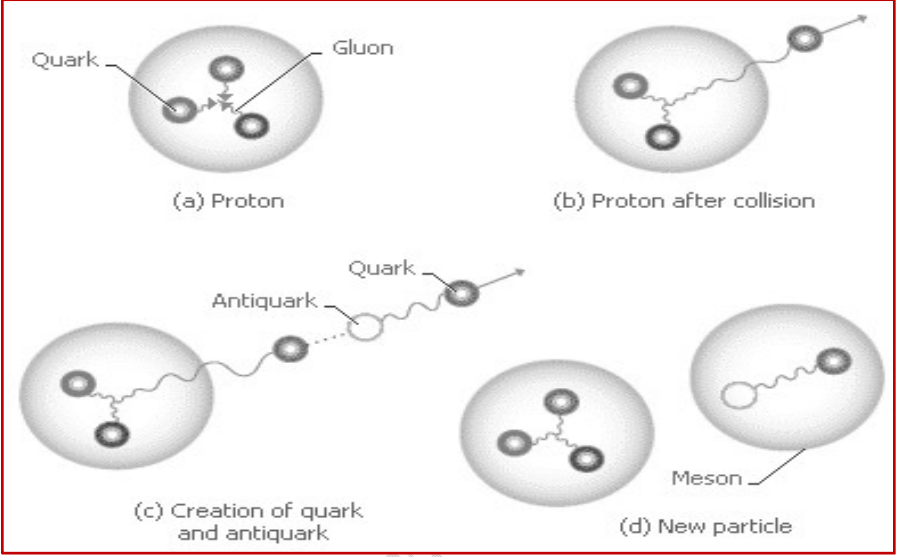
মূলত স্প্রিংয়ের মতো কাজ করে। একদিকে গ্লুওন কুয়ার্ক দ্বারা অনবরত রদবদল হয় আর অপরদিকে গ্লুওন তিনটি কুয়ার্কের মধ্যে কিছুটা দূরত্বও বজায় রাখে। স্প্রিং যেভাবে চাপ ও টানের বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে ঠিক এভাবে গ্লুওনও কুয়ার্কগুলোকে বেশী কাছে অথবা বেশী দূরে যেতে বাধা দেয়। চিত্র [b]-এ কণা দ্বারা কোনো সংঘর্ষের পরবর্তী প্রটনের অবস্থা দেখানো হয়েছে। কোনো কণা প্রটনে গিয়ে পতিত হয়ে তার কুয়ার্কের মধ্য থেকে একটিকে অপরগুলো হতে দূরে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু গ্লুওন এসময় দীর্ঘায়িত স্পিংয়ের মতো ঐ দূরে সরে যাওয়া কুয়ার্ককে ধরে রাখার চেষ্টা চায়াল। চিত্র [c]-তে কুয়ার্ক ও এ্যন্টিকুয়ার্ক সৃষ্টির ক্রিয়া দেখানো হয়েছে। সাধারণ সংঘর্ষকে গ্লুওন রদবদলের মাধ্যমে প্রটন অনায়াসেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু শক্ত সংঘর্ষ হলে- যা কৃত্রিম উপায়ে পার্টিকল এক্সেলেরেটরে পদার্থবিদরা ঘটিয়ে থাকেন, গ্লুওনের এনার্জি থেকে কিছু কণা সৃষ্টি হয়। গ্লুওন ঠেলে দেওয়া কুয়ার্ককে বিচ্ছিন্ন না করে একটি নতুন জোড়া পার্টিকল তৈরী করে: এর একটি হলো কুয়ার্ক আর অপরটি এ্যন্টিকুয়ার্ক। চিত্র [d]-এ এই

নতুন কণাকে দেখানো হয়েছে। কুয়ার্ক ও এ্যন্টিকুয়ার্ক একটি নতুন কণা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে- এটির নাম হলো মেসন। এই মেসনই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হয়ে থাকে যখন বাইর মহাকাশ থেকে আগত দ্রুতগামী 'কজমিক পার্টিকল' এসে কণার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

আমরা বস্তুজগতের ক্ষুদ্রতম বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ কণার উপর আলোচনা করেছি। এগুলোর সারমর্ম জানার জন্য নিচের দুটি টেবিলে এদের নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে।

ফেমিলি	নাম	সংকেত	মৌলিক চার্জ	ভর (ম্যাস MeV/c2)	গড় জীবনকাল (সেকেন্ড)
লেপটন্স	ইলেকট্রন	e^-	-1	0.511	স্থিতিশীল
” ”	মিউওন	m	-1	106	$2.2* 10^{-6}$
” ”	টাও	t	-1	1,777	$3 * 10^{-13}$
” ”	ইলেকট্রন নিউট্রিনো	he	0	0?	স্থিতিশীল
” ”	মিউওন নিউট্রিনো	hm	0	0?	স্থিতিশীল

ফেমিলি	নাম	সংকেত	মৌলিক চার্জ	ভর (ম্যাস MeV/c2)	গড় জীবনকাল (সেকেন্ড)
কুয়ার্কস	আপ	u	+2/3	1.5 থেকে 5	প্রযোজ্য নয়
” ”	ডাউন	d	-1/3	3 ধেকে 9	প্রযোজ্য নয়
” ”	স্ট্রেঞ্জ	s	-1/3	1100 থেকে 1400	প্রযোজ্য নয়
” ”	চার্ম	c	+2/3	60 থেকে 170	প্রযোজ্য নয়
” ”	টপ	s	+2/3	প্রায় 1,70,000	প্রযোজ্য নয়
” ”	বটম	b	-1/3	4,100 থেকে 4,400	প্রযোজ্য নয়
বেরিওন্জ	ফটোন	g	0?	0?	প্রযোজ্য নয়
” ”	গ্লুওন	g	0	0?	প্রযোজ্য নয়

” ”	W^+	W^+	+1	80,000	প্রযোজ্য নয়
” ”	W^-	W^-	-1	80,000	প্রযোজ্য নয়
” ”	Z	Z	0	91,000	প্রযোজ্য নয়
বেরিওন্জ	প্রটন	p+	+1	938	স্থিতিশীল
” ”	নিউট্রন	n	0	940	887
” ”	পজিটিভ সিগমা	S^+	+1	1189	$8 * 10^{-10}$
” ”	নিউট্রেল পায়ন	S^0	-1	1193	$7 * 10^{-20}$
” ”	নেগিটিভ পায়ন	l^0	0	1116	$3 * 10^{-10}$
মেসন্জ	পজিটিভ পায়ন	p^+	+1	140	$2.6 * 10^{-8}$
” ”	নিউট্রেল পায়ন	p^0	0	135	$8.4 * 10^{-17}$
” ”	পজিটিভ কেওন	p^-	-1	110	$2.6 * 10^{-8}$
” ”	নেগেটিভ পায়ন	k^+	+1	494	$1.2 * 10^{-8}$
” ”	পজিটিভ কেওন	k^-	-1	494	$1.2 * 10^{-8}$
” ”	D প্লাস	D^+	+1	1869	$1.1 * 10^{-12}$
” ”	D মাইনাস	D^-	-1	1869	$1.1 * 10^{-12}$

থিওরি অব এভরিথিং?

হ্যাঁ, পদার্থবিদরা সবকিছুর একটি থিওরি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বেশ আগে থেকেই রত আছেন। মূলত উপরে বর্ণিত চার শক্তিকে ‘ইউনিফাই’ [টহরভু] বা একত্রিকরণের মাধ্যমে এই থিওরি গড়ে উঠতে পারে বলে অনেকে আশা করছেন। যে চারটি শক্তির কথা এখানে উদ্দেশ্য তা আবার বলে দিচ্ছি: মহাকর্ষ [gravitation], বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি [electromagnetism], সবল আনবিক শক্তি [strong nuclear force] ও দুর্বল আনবিক শক্তি [weak nuclear force ঋড়ৎপব]। সংক্ষেপে টিঅই [TOE] বলে পরিচিত কথিত এই থিওরি এখনও আসলে কোনো থিওরি হয় নি। মূলত মৌলিক এই চার শক্তিকে একত্রে বুঝানো ছাড়াও বিজ্ঞানীরা আশা করেন এরূপ কোনো থিওরি দ্বারা ‘ফিজিক্স কেনো যেভাবে কাজ করে- সেভাবে করে?’ এটাও হয়তো বুঝানো সম্ভব হবে। তবে আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য হলো এরূপ কোনো থিওরি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও এটা ফিজিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে মোটেও ফাইন্যাল কোনো থিওরি হবে না। বিজ্ঞান

'কিভাবে' বস্তুজগৎ কাজ করে সেটা আবিষ্কার করতে পারে- তা করে যাচ্ছেও কিন্তু 'কেনো' এই পদ্ধতিতে ফিজিক্যাল শক্তিসমূহ ক্রিয়া করে তা কখনো জানতে পারবে না। এটা জানার উপায় হলো 'যে অদেখা মহাশক্তি' এই গ্রান্ড ডিজাইন করতে যেয়ে এভাবে ফিজিক্যাল শক্তি ও তাদের মধ্যে গুণাবলী প্রদান করেছেন তাকে আগে জানা। আর এই 'জানার' কোনো পদ্ধতি বিজ্ঞানের জানা নেই।

এই জানার একমাত্র পথ হলো 'ঈমান বিল গায়িব' অর্থাৎ সেই অদৃশ্য মহাশক্তিধর প্রভুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। এ জন্যই সূফিরা বলে থাকেন, 'আমাদের দরকার নেই এ্যারিস্টটলের কিংবা নিউটনের অথবা আইনস্টাইনের- কারণ আমরা যে মহাসত্য আবিষ্কার করেছি তা বাস্তব অনুভূতির মাধ্যমে অর্জন করেছি।' তবে সুফিরা একথাও বলেন, 'ঈমান বিল গায়িবের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান যা বলে তা জানা মহাসত্যকে জানার ক্ষেত্রে আরো সহায়ক হবে'। যা হোক TOE নিয়ে চিন্তাধারা থেকে এ পর্যন্ত কতটুকু কি সফলতা অর্জিত হয়েছে তা একটু তলিয়ে দেখা যাক।

ইলেকট্রউইক থিওরি

চারটি শক্তিকে একত্রিকরণ বা ইউনিফাই করা এখন সম্ভব না হলেও গেল শতকের ষাটের দশকের শেষে পাকিস্তানি পদার্থবিদ মরহুম প্রফেসর আব্দুস সালাম [১৯২৬-১৮৯৬] ও স্টিভেন ওয়াইনবার্গ [জ.১৯৩৩] স্বাধীনভাবে ইলেকট্রমেগনেটিক ও দুর্বল ফোর্সকে একত্রিকরণে সফল হোন। এই থিওরির নাম ইলেকট্রউইক থিওরি [electro-weak theory]। আব্দুস সালামের থিওরি পরীক্ষাগারে সফলভাবে টেস্ট করার পর ১৯৭৯ সালে ফিজিক্সের জন্য তিনি নবেল পুরস্কারে ভূষিত হোন। তার এই থিওরি প্রতিষ্ঠার মূলে গ্রুপ থিওরি নামক গাণিতিক একটি প্রতিপাদ্য কাজে লাগানো হয়। সুতরাং গাণিতিক উপায়ে ওয়াইনবার্গ, শেলডন গ্লাশো [জ. ১৯৩২] ও আব্দুস সালাম ইলেকট্রমেগনেটিক ও দুর্বল শক্তিকে কিভাবে একত্রে বুঝানো সম্ভব তা তুলে ধরেন। এর দ্বারা এটাই পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, অল্প এনার্জির ক্ষেত্রে ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স দুর্বল ফোর্স থেকে অনেক বেশী বলে দেখা গেলেও উচ্চ এনার্জির বেলা তা মূলত একই ফোর্সে রূপান্তর হয়।

উপরে বর্ণিত ইলেকট্রউইক থিওরির মডেল অনুসরণে গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিওরি [grand unification theory -GUT] নামক একটি থিওরি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু হয়। এই থিওরির উদ্দেশ্য হলো ইলেকট্রউইক থিওরির সঙ্গে সবল আনবিক শক্তিকে যুক্ত করা। কিন্তু এ পর্যন্ত অনেক গাণিতিক সমাধান বের হয়েছে বলে প্রচার চললেও এখনও পরীক্ষাগারে এই থিওরি প্রমাণিত হয় নি।

সুতরাং GUT গবেষণা এখন কোন্ দিকে যাচ্ছে? আমার জানা মতে সুপারস্ট্রিং [superstring] নামক একটি নতুন থিওরি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে এবং অনেক পদার্থবিদ আশা করছেন এটাই হয়তো শেষ পর্যন্ত এঞ্ডঊ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এই থিওরি অনেক দক্ষ বিজ্ঞানীও বুঝতে হিমশিম খান- তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলার চেষ্টা না করাই ভালো। এরপরও বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, এই থিওরির মূলে চার-বিস্তৃতিসম্পন্ন স্থান-কাল ছাড়াও আরো বেশ ক'টি বিস্তৃতির অস্তিত্ব থাকাও জরুরী হিসাবে কাজ করে। বলা হয়, জগতের সবকিছু, বস্তু ও শক্তি এবং স্থান-কালও খুব ক্ষুদ্র অথচ বিরাট টেনশনের মধ্যে নিমজ্জিত 'string' বা সূতার দ্বারা সৃষ্ট। এই সূতা কম্পন ও ঘূর্ণনরত অবস্থায় বহু-বিস্তৃতিসম্পন্ন সুপারস্পেইসে [super-space] আছে। গাণিতিকভাবে চার বিস্তৃতি ছাড়াও অতিরিক্ত বিস্তৃতি থাকা এই থিওরি অনুযায়ী জরুরী- অন্যথায় tachion [ঠাকিওন] নামক আলোকের গতি থেকে দ্রুত গতিশীল একটি কণা এবং ghost [ভুত] নামক নেগিটিভ সম্ভাব্যতাসম্পন্ন অপর একটি কণা থাকার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। এসব অতিরিক্ত বিস্তৃতি বা ডাইমেনশন থিওরি অনুযায়ী বলা হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। এর কারণেই এসব বিস্তৃতি পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এটাই সুপারস্ট্রিং থিওরি। পাঠকরা কতটুকু বুঝতে পেরেছেন তা জানি না- কিন্তু আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছি অত্যল্প! যা হোক, দুর্ভাগ্যবশত সুপারস্ট্রিং থিওরির পেছনে সর্বাপেক্ষা কঠিন গণিত ও যুক্তি থাকায় এটাকে সহজে পরীক্ষাগারে টেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই থিওরির সঙ্গে জড়িত এনার্জেটিক পদার্থবিদরা মোটেই থেমে নেই। তারা এটা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর, সুতরাং গবেষণা জোরেসুরেই চলছে।

সবশেষে বিংশ শতক তথা সম্ভবত গত ২০০০ শতাব্দির সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন এবং উক্ত ফোর্স একত্রিকরণ সম্পর্কে দৃ'চারটে কথা উল্লেখ করে এই গ্রন্থের উপসংহারের দিকে মনোনিবেশ করছি।

রিলেটিভিটি থিওরির প্রতিষ্ঠাতা আইনস্টাইনই সর্বপ্রথম 'ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরি' এর ধারণা বিজ্ঞানমহলে জন্ম দিয়েছিলেন। বিরাট মেধাসম্পন্ন এই বিজ্ঞানী একাধারে জীবনের শেষ ত্রিশটি বছর কাটিয়েছেন এই থিওরি প্রতিষ্ঠার পেছনে। কিন্তু সফল হোন নি। ১৯৫৫ সালে তার মৃত্যুর ১৩ বছর পর প্রফেসর সালাম, ওয়াইনবার্গ ও গ্লাশো আংশিকভাবে এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন করেন ইলেকট্রউইক থিওরি প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, সম্ভবত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বড়ো বিজ্ঞানীও যে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা বাস্তবে রূপদান হয়তো সম্ভব না-ও হতে পারে। অন্তত অদূর ভবিষ্যতে কোনো 'সবকিছুর থিওরি' প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

উপসংহার

আমরা এই অধ্যায়ের শেষে এসে পৌঁছে গেছি- এবং এসাথে গ্রন্থেরও সমাপ্তিতে। দু'চারটে কথা ব্যক্ত করেই ইতি টানছি। আমি এ গ্রন্থটি রচনার শুরুতে ভাবি নি, আলোচনা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের এতো গভীরে চলে যাবে। কিন্তু এ থেকে আশারাখি পাঠকরা কিছুটা উপকৃত হবেন। অন্তত আশা করা যায় সবার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে অত্র রচনাটি সাহায্য করবে যে, বস্তুজগৎ খুব সুকৌশলে সৃষ্টির পর তা অস্তিত্বশীল রাখা হয়েছে আরোও অনেক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে। মৌলিক চার শক্তি ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কোনো 'মহাপরিকল্পক' ছাড়া কীভাবে এমনিতেই স্বভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে? কখনও নয়। আশ্চর্য, কিছু বিজ্ঞানীও এ ব্যাপারটি সম্পর্কে সন্দেহপোষণ করতে পারেন!

যা হোক এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে কেউ বড়ো বিজ্ঞানী হবেন তা অবশ্য আশা করি নি। তবে বিজ্ঞান ও বিশেষকরে বিজ্ঞানের দু'টি মৌলিক প্রধান শাখা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ফিজিক্সে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরাও এই গ্রন্থ থেকে কিছুটা অন্তত উপকার পাবেন- এটা আশা করা যায়। আর আসল কথা হলো পাঠকদের যারা ঈমানী নূরের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হয়েছেন তাদের অন্তরে প্রভু-আনুতগ্যতার আগ্রহ

এই গ্রন্থ অধ্যয়ন শেষে কিছুটাও যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই গ্রন্থে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জানার পর কোনো অবিশ্বাসীর হৃদয়ে ঈমানের জ্যোতি জ্বলে ওঠবে বলে মনে করি না- কারণ ঈমান মূলত প্রভু-প্রদত্ব একটি নূর। তবে সৌভাগ্যবশত যদি কারো অন্তরে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হওয়ার কারণ এই গ্রন্থ হয়ে যায়, তাহলে তো আমার জন্য তা নাযাতের ওয়াসিলা হয়ে যেতে পারে- আমি অবশ্য এই আশাও ছাড়বো না। সাধারণত যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, গবেষণা কিংবা বিজ্ঞান থেকে ঈমানের জ্যোতি পাওয়া যায় না। যদি যেতো তাহলে আজকের পশ্চিমা বিশ্বের বড়ো বড়ো সকল দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা একবাক্যে মহাসত্যের ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যেতেন। হ্যাঁ, প্রথমে ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্যসহ যদি উপরোক্ত জ্ঞানান্বেষায় কেউ লিপ্ত হয় তাহলে তার ঈমানী শক্তি অবশ্যই বাড়বে। কারণ আল্লাহর সৃষ্ট এ জগত পরিচালনার কারসাজি লক্ষ্য করে এই জ্ঞানান্বেষী সত্যিই একথা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, "এক মহাপরিকল্পক অসীম শক্তিধর প্রভু ছাড়া এসব ব্যাপার এমনিতেই আত্মপ্রকাশ করে নি। যে বিজ্ঞান দ্বারা এসব উন্মোচন হচ্ছে সেই বিজ্ঞানই বলে সবকিছুর মূলে কোনো এক অজানা শক্তি কাজ করছে; তা কি হয়? বিজ্ঞান জানে না। একমাত্র প্রভুবিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা ছাড়া অন্যরা তাই বিজ্ঞানের উপর গভীর জ্ঞানী হয়েও ঈমানের অভাবে এখনও অপরিপূর্ণতার অন্ধকারে পড়ে ঘোরপাক খাচ্ছেন।"

আমি এই গ্রন্থে 'ঈমান-আক্বীদার' উপর কিছুই বলি নি এবং এখানেও বলতে যাবো না। এরূপ আলোচনা উদ্দেশ্যও নয়। শুধুমাত্র শিরোনাম দ্বারা ইঙ্গিত করেছি যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উপর এই তথ্যসম্মৃদ্ধ বইটি পাঠের সময় যেনো ঈমানী জ্যোতি জাগ্রত থাকে। এতে পাঠকের মনে এক অপূর্ব তৃপ্তি অনুভূত হবে যা অন্য কোনভাবে অনুভব করা যায় না।

আলহামদুলিল্লাহ! এই গ্রন্থ লিখতে যেয়ে অনেকদিনের চেষ্টা-সাধনা, গভীর রাতে জাগরণ এবং অনেক বই-পুস্তক অধ্যয়নসহ একাধিক ইনসাইক্লোপিডিয়ায় তথ্যানুসন্ধান এবং ইন্টারনেটে অক্লান্তভাবে বিচরণ করতে হয়েছে; পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হয়েছে- মোটকথা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও চেষ্টা-সাধনার ফসল এই লেখাটুকু, তথাপি আজ মনের মধ্যে তৃপ্তি অনুভব করছি ও প্রভুর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি এ জন্যে যে, শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের

গভীর জলে নিমজ্জিত হয়ে সবার জন্য কিছু জ্ঞান-প্রজ্ঞার মণিমুক্তা উত্তোলন করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি এবং পাঠকসমাজে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পেরেছি।

শেষ কথা হলো- আমার ধারণা, সেদিন খুব বেশী দূরে নয় যেদিন বিজ্ঞান ও সত্য-ধর্মবিশ্বাসের তথা দ্বীনের মধ্যে দূরত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। মানুষ অবশেষে বুঝতে সক্ষম হবে 'ঈমান বিল গায়িব' মহাসত্য অনুধাবনের মূল চাবিকাঠি। ঈমানী নূরে বিজ্ঞানকে চেনা ঈমানের জন্য বিরাট নিয়ামত। এটা কখনো বিশ্বাস রাখা ঠিক নয় যে, বিজ্ঞান দ্বারা উন্মোচিত বস্তুজগতের রহস্যাবলী জানা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে! কারণ, সত্য কোনো কালেই ঈমানকে দুর্বল করতে পারে না- বরং সবল করবে এটা নিশ্চিত এবং স্বাভাবিকও বটে। আর বৈজ্ঞানিক সত্য জানার সাথে জড়িত আছে জাগতিক অনেক ফায়দা। জীবনের মানোন্নয়নে আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের নির্যাস তথা প্রযুক্তির উপর জ্ঞানার্জন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ কথাটি আশাকরি পাঠকদেরকে বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না। এই ব্যাপারটি অনুভব করেই আমি **'সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'** নামকরণে একটি বই রচনা করেছি। বইটি ঢাকাস্থ 'হলি মিডিয়া প্রকাশনী' থেকে ইতোমধ্যে প্রকাশিতও হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর মৌলিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বইটি পাঠ করার আহ্বান জানাই সকলকে।

আধুনিক এ যুগ হলো বিজ্ঞানপাগল যুগ। মানুষ সবকিছু বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করতে ভালোবাসে। দর্শন ও নীতি-নৈতিকতার গুরুত্ব যারা বেশী উপলব্ধি করেন তাদের কাছে এই 'বিজ্ঞানের প্রতি অতিনির্ভরশীলতা' নিশ্চয়ই উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকবে। আমাদের কাছেও তা-ই। তবে ব্যাপারটি আসলে এতো বেশী হতাশপূর্ণ নয়। বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে, এমনকি এর মানদণ্ডে বেশ কিছু ব্যাপার যাচাই-বাছাই করেও আমাদেরকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে থাকার উপায় নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সকল বিষয়ের মতো পাঠের সময় সতর্কতাবলম্বন থাকাটা জরুরী। বাস্তবে সঠিক মানসিক ও খোলা মনোভাব নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা আমাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। **'ঈমানী নূরে বিজ্ঞানভাবনার'** মাধ্যমে আখিরাতের ফায়দা আর বৈষয়িক দিক থেকে উন্নয়ন এই উভয়বিদ সুফল অর্জন আদৌ অসম্ভব নয়।

——— সমাপ্ত ———

বিষয় নির্ঘন্ট